'তাজাল্লিয়াতে নুবুওয়াত' গ্রন্থের অনুবাদ
রাসূলে আরাবি
বিশুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতে প্রিয় নবির সংক্ষিপ্ত জীবনী
সফিউর রহমান মুবারকপুরি
সমর্পণ

‘তাজাল্লিয়াতে নবুওয়াত’ গ্রন্থের অনুবাদ

রাসূলে আরাবি ﷺ

লেখক

সফিউর রহমান মুবারকপুরি رحمه الله

অনুবাদ

আশিক আরমান নিলয়

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়:
নুবুওয়াত-প্রাপ্তি, আল্লাহর প্রতি আহ্বান ও আপতিত নিপীড়ন-নির্যাতন

তৃতীয় অধ্যায়: মদীনায় হিজরত

পঞ্চম অধ্যায়:

ফরজ হাজ্জের বিধান (৯ম হিজরি) বিদায় হাজ্জ (১০ম হিজরি)

ষষ্ঠ অধ্যায়: সুউচ্চ বন্ধুর পানে নবি ﷺ-এর যাত্রা

সপ্তম অধ্যায়: নবিজির পরিবার, গুণ ও আখলাকের বিবরণ

লেখকের কথা

নবিজি ﷺ-এর জীবনী অত্যন্ত মহান ও মর্যাদাপূর্ণ একটি বিষয়। নবি ও রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন এবং ইসলামের উত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় এই সীরাত থেকে। চরম কষ্টের পর আল্লাহ কীভাবে সাফল্য দেন, তা উপলব্ধি করা যায় নবি ও সাহাবিদের জীবনচরিত থেকে।

অন্য যে কারও জীবনীর চেয়ে নবিজীবন অধ্যয়নে শিক্ষা লাভ করা যায় অনেক অনেক বেশি। আল্লাহ তাআলা কীভাবে তাঁর নবিকে প্রস্তুত করলেন, মানুষের অন্তরে কীভাবে প্রোথিত করলেন তাঁর কিতাবের শিক্ষা, অনেক শক্তিশালী ও বিশাল বিশাল শত্রুদলের বিরুদ্ধে ছোট্ট একটি দলকে কেমন করে বিজয় দান করলেন, চারদিকে মিথ্যে আর পাপ-পঙ্কিলতার সয়লাবের মাঝে ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্যকে কীভাবে সমুন্নত করলেন—এসবের মাঝে নিহিত রয়েছে বহু প্রজ্ঞা।

নবি ﷺ-এর জীবনী পড়ে মুসলিমরা তাদের দ্বীনকে গভীরভাবে বুঝতে শেখে। তাই নবিজির জীবদ্দশা থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আলিমগণ নবিজীবন-সংক্রান্ত তথ্যের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে খুবই সাবধানী। কিন্তু অনেকেই নবিজীবন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এতে মনগড়া, অবান্তর ও অবিশুদ্ধ জিনিস প্রবেশ করিয়েছে। ফলে দিনশেষে দেখা যায়, ইসলামের নবির জীবনীতে অনেক তথ্য স্বয়ং ইসলামের শিক্ষারই বিপরীত।

এসব সমস্যার আলোকে অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেন বিশুদ্ধ উৎসের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি জীবনী লিখতে। এই সুকঠিন কাজটি করতে আমি যেসব উৎসের সাহায্য নিয়েছি, সেগুলো হলো—কুরআন, বিশুদ্ধ তাফসীর, বিশুদ্ধ হাদীস এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ সীরাহ-গ্রন্থ।

আল্লাহ যেন এই গ্রন্থ থেকে মুসলিমদের উপকৃত করেন এবং উভয় জাহানে নাজাতের মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন। আমীন!

সফিউর রহমান মুবারাকপূরি
১২ শাওয়াল, ১৪১৫ হিজরি।

প্রথম অধ্যায়

মুহাম্মাদ ﷺ-এর বেড়ে ওঠা, বংশ-পরিচয় ও নুবুওয়াত লাভের পূর্বের ঘটনাগুলো
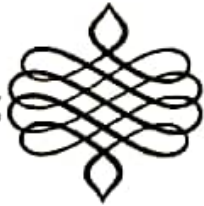
মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদিপুরুষগণ

আরব সমাজে বংশধারাকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং খুব যত্ন করে তা সংরক্ষণ করা হয়। ফলে আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশধারা-সংক্রান্ত তথ্যও খুব ভালোভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর পরিবার সরাসরি ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) ও ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর।

নবিজির বংশধর:

আদনানের ছেলে মাআদ, তাঁর ছেলে নিযার, তাঁর ছেলে মুদার, তাঁর ছেলে ইলইয়াস, তাঁর ছেলে মুদরিকা, তাঁর ছেলে খুযাইমা, তাঁর ছেলে কিনানা, তাঁর ছেলে নাদর, তাঁর ছেলে মালিক, তাঁর ছেলে ফিহর, তাঁর ছেলে গালিব, তাঁর ছেলে লুওয়াই, তাঁর ছেলে কা'ব, তাঁর ছেলে মুররাহ, তাঁর ছেলে কিলাব, তাঁর ছেলে কুসাই, তাঁর ছেলে আবদু মানাফ, তাঁর ছেলে হাশিম, তাঁর ছেলে আবদুল মুত্তালিব, তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ, তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ ﷺ।

আদনান যে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ একমত। কিন্তু এই দু'জনের মধ্যকার প্রজন্মের সংখ্যা এবং তাঁদের নাম নিয়ে বেশ মতপার্থক্য আছে।

নবিজি ﷺ-এর মা আমিনা। তিনি ওয়াহাব ইবনু আবদি মানাফ ইবনি যুহরা ইবনি কিলাবের মেয়ে। নবি ﷺ-এর পূর্বপুরুষ হিসেবেও কিলাবের নাম পাওয়া যায়। বলা হয় যে, তাঁর আসল নাম ছিল উরওয়া কিংবা হাকীম। জাহিলি যুগে পোষা কুকুর সাথে নিয়ে তিনি প্রায়ই শিকারে বেরোতেন। আরবিতে কুকুরকে বলে 'কিলাব'। উরওয়ার এই শখের কারণে তাঁর এই নামকরণ করা হয়।

নবিজি ﷺ-এর গোত্র

আরবের সবচেয়ে সম্মানিত গোত্র কুরাইশ। নবি ﷺ এ গোত্রেরই সন্তান। 'কুরাইশ' মূলত ফিহর ইবনু মালিক অথবা নাদর ইবনু কিনানার ডাকনাম ছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁর বংশধরগণও এ নামেই পরিচিত হন।

আরব উপদ্বীপে কুরাইশ গোত্রের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। এ মর্যাদা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন গোত্রটির এক সদস্য কুসাই ইবনু কিলাব। তাঁর আসল নাম ছিল যাইদ।

বাবার মৃত্যুর পর তাঁর মা তাঁকে নিয়ে চলে যান সিরিয়ার নিকটবর্তী আযরা গোত্রে। সে গোত্রেই কুসাইয়ের বেড়ে ওঠা। শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলো সেখানে অতিবাহিত করে তিনি যৌবনে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। অসাধারণ যোগ্যতার কারণে আসার কিছুদিন পরেই তাঁর হাতে অর্পিত হয় কা'বার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব। কুরাইশ গোত্রের তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি কা'বার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পান। এই মর্যাদাপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তির হাতেই কা'বার চাবি থাকত, তিনি যাকে অনুমতি দিতেন, কেবল সে-ই কা'বায় প্রবেশ করতে পারত এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত কা'বার দরজা খোলা হতো না। তাঁরই হাতে হাজ্জযাত্রীদের আতিথেয়তা করার প্রথা আরম্ভ হয়। তিনি হাজিদের জন্য মধু, খেজুর ও কিশমিশ দিয়ে বিপুল পরিমাণ মিষ্টি শরবত তৈরি করে তাদের সামনে পেশ করতেন।

কা'বার উত্তর দিকে একটি ঘরও তৈরি করেন কুসাই। তিনি এর নাম রাখেন দারুন নাদওয়া। বৈঠকভবন। গোত্রীয় বিচার-সালিশ, বিয়ে-শাদি ইত্যাদির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সভা-সমাবেশগুলো দারুন নাদওয়ার প্রাঙ্গণেই আয়োজন করা হতো।

কুরাইশের পতাকা ও ধনুক বহনের দায়িত্বও ছিল কুসাইয়ের কাঁধে। তিনি ছাড়া যুদ্ধের পতাকা উড়ানোর সামর্থ্য কারও ছিল না। দরদি ও জ্ঞানী এই নেতাকে নির্দ্বিধায় মেনে চলত কুরাইশ গোত্র। তাঁরই নেতৃত্বাধীনে মক্কায় স্থায়ী হয় গোত্রটি। ছড়ানো-ছিটানো দল থেকে তারা পরিণত হয় স্থিতিশীল শক্তিশালী এক সমাজে।

বংশধারা

রাসূল ﷺ-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের পিতা হাশিমের নামানুসারে এ বংশকে বলা হয় হাশিমি। কুসাইয়ের দায়িত্বসমূহ থেকে হাজীগণের আতিথেয়তার দায়িত্ব পান হাশিম। এরপর তাঁর কাছ থেকে হস্তান্তরিত হয় তাঁর ভাই মুত্তালিবের কাছে। মুত্তালিবের মৃত্যুর পর হাশিমের বংশধররা পুনরায় এই মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব হাতে পান। ইসলামের অভ্যুদয় পর্যন্ত তাঁরা এ পদে আসীন থাকেন।

হাশিমকে ওইসময়ের সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি বলে গণ্য করা হতো। তিনি 'ওয়াদিয়ে বাতহা'র সর্দার ছিলেন। হাশিম শব্দের অর্থ চূর্ণকারী, টুকরোকারী। তিনি রুটি টুকরো টুকরো করে গোশত আর ঝোলের সাথে মিশিয়ে একধরনের খাবার তৈরি করে মানুষের মাঝে বিতরণ করতেন। এ কারণেই তাঁর নাম হাশিম বলে পরিচিতি পায়। তাঁর মূল নাম ছিল আমর।

কুরাইশ গোত্র পেশায় ব্যবসায়ী। কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার জন্য শীতকালে ইয়েমেনে আর গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় যাওয়ার ব্যবস্থা করেন হাশিম। তিনি এই দুই অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কুরাইশ কাফেলার নিরাপদ যাতায়াতের অনুমতিপত্র নিয়ে দেন।[১] সূরা কুরাইশে আল্লাহ্ তাআলা কুরাইশ গোত্রকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই নিরাপদ ভ্রমণের জন্য তারা আল্লাহর কাছে ঋণী। এটি আল্লাহর অনেক বড় রহমত ও নিয়ামাত।

হাশিম একবার সিরিয়া অভিমুখে ভ্রমণকালে ইয়াসরিবে[২] যাত্রা-বিরতি করেন। সে সময় তিনি সেখানকার বানূ আদি ইবনি নাজ্জার গোত্রের মেয়ে সালামা বিনতু আমরকে বিয়ে করেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি আবার সিরিয়া অভিমুখে রওনা হন। অতঃপর ফিলিস্তিনের বিখ্যাত নগরী গাযায় আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। সেসময় তাঁর স্ত্রী সালমা গর্ভবতী ছিলেন। তিনি এক ছেলের জন্ম দেন, যার চুলে সাদাটে ভাব ছিল। ফলে তার নাম রাখা হয় শাইবা, যার অর্থ শুভ্রকেশী। সে মদীনায় লালিত-পালিত হতে থাকে। মক্কায় হাশিমের আত্মীয়দের কেউ তখনো শাইবার জন্মের কথা জানত না। আট বছর পর মুত্তালিব জানতে পারেন তাঁর প্রয়াত ভাইয়ের ছেলের ব্যাপারে। সিদ্ধান্ত নেন তাকে মক্কায় ফিরিয়ে আনার। পরে যখন তিনি তাকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন তখন লোকজন ভাবে তাঁর সাথে থাকা ছেলেটা বুঝি তাঁর দাস। ফলে ছেলেটিকে তারা 'আবদুল মুত্তালিব' (মুত্তালিবের দাস) বলে সম্বোধন করতে শুরু করে। আর এভাবেই শাইবা পরিচিত হয়ে যান আবদুল মুত্তালিব নামে।[৩]

সুদর্শন যুবক হয়ে বেড়ে ওঠা আবদুল মুত্তালিব একসময় কুরাইশ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। ওইসময়ে তাঁর সমমর্যাদার কেউ ছিল না। তিনি কুরাইশদের গোত্রপতি ছিলেন এবং তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর তদারকি করতেন। দানশীলতার কারণে তাঁর খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশি। অধিক পরিমাণে দান করার কারণে তাকে فَيَّاض 'ফায়্যাদ' (অত্যধিক উদার) বলে অভিহিত করা হতো। অভাবী মানুষ, এমনকি পশুপাখিকেও তিনি খাবার-দাবার দিতেন। তাঁকে বলা হতো 'পাহাড়চূড়ার পশু-পাখিদের এবং ভূপৃষ্ঠের মানুষদের আপ্যায়নকারী'।

পবিত্র যামযাম কূপ পুনরাবিষ্কারের কৃতিত্বও আবদুল মুত্তালিবের। অনেক অনেক বছর

---

[১] ভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের এই অনুমোদন অনেকটা বর্তমান যুগের ভিসার মতো। তাই এটি আদায় করতে পারা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। (অনুবাদক)

[২] পরে এ অঞ্চলের নাম হয় মদীনা মুনাওওয়ারা।

[৩] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৩৭-১৩৮; তাবারী, আত-তারীখ, ২/২৪৭।

আগে এখানে নির্জন মরুতে একাকী হন্যে হয়ে পানি খুঁজছিলেন মা হাজার (আলাইহাস সাল্লাম)। আল্লাহর কুদরতে তাঁর শিশুপুত্র ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর পায়ের আঘাতে সে-সময় প্রবাহিত হয় এই কূপ। জুরহুম গোত্র মক্কা থেকে নির্বাসিত হওয়ার সময় এই কূপের স্থানটি ঢেকে দিয়ে যায়। তখন থেকেই তা সবার দৃষ্টির আড়ালে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছিল। একরাতে আবদুল মুত্তালিবকে স্বপ্নে সে স্থানটি দেখানো হয় এবং তা খনন করতে আদেশ দেওয়া হয়। পরদিন তিনি নির্ধারিত স্থানে গিয়ে খনন করতেই পুরোনো সেই যামযামের ধারা আবারও বেরিয়ে আসে।[৪]

আবদুল মুত্তালিবের জীবদ্দশাতেই আবিসিনিয়ান শাসক আবরাহার হস্তিবাহিনী কা'বা আক্রমণ করে। এই বাহিনীকে কুরআনে বলা হয়েছে—"আসহাবিল ফীল" (হাতিওয়ালা)। আবরাহা ষাট হাজার যোদ্ধার এক বিশাল সৈন্যদল নিয়ে রওনা হয়েছিল কা'বা ধ্বংস করার নোংরা মানসিকতা নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল হাজ্জযাত্রীদের ইয়েমেনের নবনির্মিত গির্জা অভিমুখে তীর্থযাত্রায় বাধ্য করা।

মুযদালিফা ও মিনার মাঝে রয়েছে মুহাসসির উপত্যকা। সেখানে এসে জড়ো হয় আবরাহার সেনাদল। যে হাতির পিঠে আবরাহা সওয়ার হয়েছিল, তা সকল মক্কাবাসীকে ভয়ে প্রকম্পিত করে ফেলেছিল। অথচ সেই ভয়ানক জন্তুই কিনা এবার আর অগ্রসর হতে সম্মতি দেয় না। পবিত্র এই গৃহের প্রতিরক্ষায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রেরণ করেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। ষাট হাজার হানাদার সেনাকে পাখিগুলো ছোট ছোট পাথর দিয়ে আক্রমণ করে। এরই আঘাতে বিশাল এই বাহিনী চর্বিত ঘাসের মতো (كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ) নেতিয়ে পড়ে।[৫]

এই ঘটনা ঘটেছিল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পৃথিবীতে আগমনের ৫০ বা ৫৫ দিন পূর্বে।

নবি ﷺ-এর পিতা আবদুল্লাহ। আবদুল মুত্তালিবের সবচেয়ে সুদর্শন, পুণ্যবান ও আদরের সন্তান। তাকে 'যাবীহ'ও বলা হয়। অর্থ—যাকে যবাই বা কুরবানি করা হয়েছে। যামযাম কূপ খননের সময় যখন কূপের নিশান দেখা গেল তখন কুরাইশও আবদুল মুত্তালিবের সাথে এই মর্যাদায় ভাগ বসাতে উদ্যত হলো। এ নিয়ে তাদের মাঝে তুমুল ঝগড়া ও বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পরে অতি কষ্টে এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলার একটা মীমাংসা হয়। তবে তাদের বাহাদুরি দেখে আবদুল মুত্তালিব মান্নত করেন যে, আল্লাহ তাআলা যদি তাকে দশটি ছেলে দান করেন এবং প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষের

---

[৪] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৪২-১৭৪।

[৫] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮/৪৫৮-৪৬৬; ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৪৩-৬৫।

সাথে লড়াই করার উপযুক্ত হয়, তাহলে তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে আল্লাহর রাস্তায় যবাই করবেন। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করেন। তাঁর দশটি পুত্রসন্তানের সবাই এখন শক্তিশালী লড়াকু সৈনিক। ফলে আবদুল মুত্তালিব মান্নত পুরা করার উদ্দেশ্যে তার সব ছেলের নাম দিয়ে লটারির আয়োজন করেন। লটারিতে আবদুল্লাহর নাম আসে। তাই আবদুল্লাহকে যবাই করার জন্য কা'বা চত্বরে নিয়ে যান। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের লোকেরা, বিশেষত আবদুল্লাহর ভাই ও মামারা প্রচণ্ডভাবে এ কাজের বিরোধিতা করেন। অবশেষে ঠিক হয় যে, আবদুল্লাহর বদলে এক শ উট যবাই করা হবে। এই সিদ্ধান্তানুসারে তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহর পরিবর্তে এক শ উট যবাই করেন।

আর এ ঘটনার ফলে আবদুল্লাহর এক নাম হয় 'যাবীহ'।[৬]

এ জন্যই নবিজি মুহাম্মাদ ﷺ-কে 'দুই যাবীহের সন্তান' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এক যাবীহ হলেন ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) আর একজন নবিজির সম্মানিত পিতা আবদুল্লাহ।

এমনিভাবে নবি ﷺ-কে আরও বলা হয় 'মুক্তিপ্রাপ্ত দুই নেকব্যক্তির সন্তান'। কারণ, ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) ও আবদুল্লাহ দু'জনের কুরবানিই কিছু মুক্তিপণের মাধ্যমে রহিত করা হয়। ইসমাঈলের পরিবর্তে কুরবানি হয় একটি দুম্বা এবং আবদুল্লাহর পরিবর্তে এক শ উট।

পিতার মতো আবদুল্লাহও ছিলেন সুন্দর ও সুপুরুষ। বানূ যাহরা গোত্রের নেতা ওয়াহাবের মেয়ে আমিনার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। আমিনা সেই সময়ের সবচেয়ে পবিত্র ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিল। তাদের বংশও ছিল উঁচু। বিয়ের কিছুকাল পরে আমিনা অন্তঃসত্ত্বা হন। কিন্তু সন্তান জন্মের আগেই আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহকে ব্যবসায়িক কাজে মদীনা বা সিরিয়ায় পাঠান। ফিরতি পথে মদীনায় তাঁর মৃত্যুর বেদনাবিধুর ঘটনা ঘটে। 'নাবিগা যুবইয়ানি' নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। তখনো নবি ﷺ-এর জন্ম হয়নি।[৭]

---

[৬] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৫১-১৫৫; তাবারি, তারীখ, ২/২৩৯-২৪৩।

[৭] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৫৬-১৫৭; তাবারি, আত-তারীখ, ২/২৪৬; আবুল কাসিম সুহাইলি, আর-রওদুল উনুফ, ১/১৮৪।

জন্ম হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর

আবরাহার ব্যর্থ অভিযানের পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন দিন পরের ঘটনা। সময়টা ছিল বসন্তকাল। ৯ রবীউল আউয়াল[৮] সোমবার ভোরবেলায় মক্কা নগরীতে বানূ হাশিম পরিবারে জন্ম হয় মুহাম্মাদ ﷺ-এর। সে বছরই আবরাহা মক্কায় আক্রমণ করেছিল। আরবিতে হাতিকে বলে ফীল। হস্তিবাহিনীর আক্রমণের ঘটনার কারণে বছরটি পরিচিত হয় আমুল ফীল (عَامُ الْفِيْلِ) বা হস্তিবছর নামে। গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নবিজি ﷺ-এর জন্ম-তারিখ পড়ে ২২ এপ্রিল, ৫৭১ সন।

নবি ﷺ-এর জন্মের সময় ধাত্রীর কাজ আঞ্জাম দেন আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মা শিফা বিনতু আমর।

সন্তান জন্মদানের পর রাসূল ﷺ-এর মা আমিনা স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর শরীর থেকে একটি আলো বেরিয়ে সিরিয়ার প্রাসাদগুলো আলোকিত করে ফেলছে।[৯]

নাতি জন্মের খবর পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হন আবদুল মুত্তালিব। নবজাতককে কা'বায় নিয়ে আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। আবদুল মুত্তালিবের ধারণা—তাঁর নাতি একদিন অনেক বড় হবে, খুবই প্রশংসিত হবে। তাই তিনি তার নাম রাখেন মুহাম্মাদ, অর্থ "প্রশংসিত"। আরবের সংস্কৃতি অনুযায়ী সপ্তম দিনে তিনি শিশু মুহাম্মাদের আকীকা করেন, চুল মুণ্ডন করেন এবং খতনা করেন। এরপর মক্কাবাসীদের নিমন্ত্রণ করে বেশ জমজমাট এক ভোজের আয়োজন করেন।[১০]

মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁর বাবার দাসী উম্মু আইমান দেখা-শোনা করতেন। তিনি আবিসিনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তার আসল নাম ছিল বারাকাহ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অনেক নিয়ামাত ও অনুগ্রহ দান করেছেন। উম্মু আইমান (রদিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নুবুওয়াতের যুগ পেয়েছিলেন এবং মদীনায় হিজরতও করেছিলেন।

---

[৮] ৯ রবিউল আউয়ালই যে নবি ﷺ-এর জন্মতারিখ তা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ তাহ্কীক করেছেন মাহমূদ পাশা ফালাকি। দেখুন, নাতাইজুল আফহাম ফী তাকবীমিল আরব কবলাল ইসলাম, ২৮-৩৫। তবে ১২ রবিউল আউয়াল-এর কথাও কেউ কেউ বলেন।

[৯] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/১২৭, ১২৮; ইবনু সা'দ, তবাকাতুল কুবরা, ১/১০২।

[১০] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৫৯-১৬০; তাবারি, আত-তারীখ, ২/১৫৬-১৫৭।
বলা হয়, নবি ﷺ খতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন। -ইবনুল জাওযি, তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসার, ৪।
কিন্তু ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এ ব্যাপারে কোনো হাদীস প্রমাণিত নেই।'-যাদুল মাআদ, ১/১৮।

নবিজি ﷺ-এর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর তিনিও মদীনাতে ইন্তিকাল করেন।[১১]

মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুধপান

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মা আমিনার দুধ পান করানোর সাথে সাথে চাচা আবূ লাহাবের দাসী সুওয়াইবাও তাঁকে দুধ পান করান। সে সময় রাসূল ﷺ-এর সাথে তার সন্তান মাসরূহও দুধ পান করছিল। এর আগে হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব এবং আবূ সালামাকেও সুওয়াইবা দুধ পান করিয়েছিলেন। ফলে তারা তিন জন মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুধভাই হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।[১২]

হালীমা সা'দিয়ার কোলে নবিজি

আরবদের একটি প্রথা ছিল শহরের খারাবি থেকে বাঁচানোর জন্য শিশুসন্তানকে দুধ পান করাতে বেদুইন নারীদের তত্ত্বাবধানে রাখা। তারা সন্তানকে শক্তিশালী ও সুঠাম করে গড়ে তোলার জন্য মরুভূমির প্রাকৃতিক ও রুক্ষ পরিবেশে পাঠিয়ে দিত। তা ছাড়া সারা আরবে বেদুইনদের ভাষাটাই ছিল আরবির বিশুদ্ধতম রূপ। ফলে তাদের সাথে বেড়ে উঠলে শিশুরা সহজেই প্রমিত আরবি ভাষা শিখতে পারত। আর শহরে বিভিন্ন মানুষের বসবাসের কারণে ভাষাও মিশ্র হয়ে যায়, তাই বিশুদ্ধ রূপ আর থাকে না।

আবদুল মুত্তালিব তাই নাতির জন্য এ রকম কোনও বেদুইন ধাত্রীর সন্ধানে ছিলেন। বানূ সা'দ ইবনু বকর ইবনি হাওয়াযিন গোত্রের নারীদের একটি দল সে-সময় মক্কায় আসে শিশুর খোঁজে। আবদুল মুত্তালিব তাদের প্রত্যেককেই শিশু মুহাম্মাদকে নিতে বলেন। কিন্তু তাঁর পিতা নেই শুনে কেউ নিতে চায় না। বাপমরা শিশুর পরিবারের কাছ থেকে সাধারণত ভালো পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না—এই ভাবনায় সবাই প্রত্যাখ্যান করতে থাকে।

ওদিকে পিছিয়ে পড়া হালীমা বিনতু আবী যুওয়াইব যখন শহরে এসে পৌঁছলেন, ততক্ষণে অন্য নারীরা কোনো-না-কোনো শিশুর দায়িত্ব পেয়ে গেছে। তার ভাগে ভালো কোনও শিশু মিলেনি। একরকম বাধ্য হয়েই তিনি আবদুল মুত্তালিবের কোলে থাকা শিশুটিকে নিয়ে নেন। কিন্তু তাঁকে কোলে তুলে নেওয়ার পরক্ষণেই তার এমন সৌভাগ্যের দরজা খুলে যায়, যা দেখে পৃথিবীবাসী অবাক বিস্ময়ে নির্বাক তাকিয়ে রয়। যার এক ঝলক আপনারা সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে প্রত্যক্ষ করবেন, ইন শা আল্লাহ।

---

[১১] মুসলিম, ১৭৭১।

[১২] বুখারি, ৫১০০, ৫১০১; আবূ নুআইম, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ১/১৫৭; তাবারি, আত-তারীখ, ২/১৫৮।

হালীমা সা'দিয়ার পিতা আবূ যুওয়াইবের নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস। তিনি নবি ﷺ-এর দুধনানা। হালীমার স্বামীর নাম হারিস ইবনু আবদিল উযযা। তারা উভয়েই সা'দ ইবনু বকর ইবনি হাওইয়াযিন গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁদের সন্তানেরা নবিজি ﷺ-এর দুধভাইবোন। তাঁদের তিন জন সন্তান—আবদুল্লাহ, আনিসা এবং জুযামা। জুযামার আরেক নাম শায়মা। এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। বয়সে বড় ছিলেন। তিনিও শিশু মুহাম্মাদের দেখাশোনা করতেন, খাওয়াতেন এবং আদর করতেন।

হালীমার ঘরে বরকতের বারিধারা

মুহাম্মাদ ﷺ-কে কোলে তোলার পর থেকেই হারিস-হালীমা দম্পতির ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। অনাবিল ঐশ্বর্যে অবগাহন করে পুরো পরিবার। মুহাম্মাদ ﷺ যতদিন হালীমার পরিবারে ছিলেন, ততদিন তাঁদের ঘর প্রাচুর্যে ভাসতে থাকে। হালীমা নিজেই বলেছেন যে, যখন তিনি মক্কায় আসেন তখন ছিল দুর্ভিক্ষের সময়। তাদের একটি গাধি ছিল—এ-রকম দুর্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ যে, পুরো কাফেলার মধ্যে সবচেয়ে কমজোর ও ধীর গতির ছিল। সবাই তার সামনে, কেউ পেছনে ছিল না। একটি উটনীও ছিল কিন্তু একফোঁটাও দুধ দিত না। হালীমা নিজেও অভুক্ত, বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে। সন্তানেরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় সারারাত ছটফট করত এবং কাঁদতে থাকত। তারা নিজেরাও ঘুমাত না, বাবা-মাকেও ঘুমাতে দিত না।

কিন্তু তারা যখন মুহাম্মাদ ﷺ-কে ঘরে নিয়ে আসল এবং হালীমা তাঁকে কোলে তুলে নিল তখন তার সীনা দুধে ভরপুর হয়ে গেল। ফলে মুহাম্মাদ ﷺ ও তার বাচ্চারা তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করে আরামে ঘুমিয়ে পড়ল। ওদিকে তার স্বামী হারিস উঠে গিয়ে দেখেন যে, উটনীর ওলানও দুধে টইটম্বুর। তারা সে রাতে সব পাত্র ভর্তি করে দুধ দোহন করল এবং পুরো পরিবার পেট পুরে খেয়ে খুব প্রশান্তির সাথে রাত কাটাল।

মক্কা থেকে ফেরার সময় হালীমা তার ওই গাধির ওপরই সওয়ার হয়েছিল কিন্তু এবার সাথে ছিল মুহাম্মাদ ﷺ। ফলে সেই গাধিই এত দ্রুত চলা আরম্ভ করল যে, পুরা কাফেলাকে পেছনে রেখে সবার সামনে চলে গেল। তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলার মতো কেউ ছিল না।

কোনও এক অদৃশ্য ইশারায় হালীমার ঘরকে দুর্ভিক্ষ ও খরা আর স্পর্শ করে না। অথচ তাঁদের বাসস্থান বানূ সা'দ ছিল ওই এলাকার সবচেয়ে দুর্ভিক্ষময় ও খরাপ্রবণ জায়গা। তাঁদের ছাগলগুলো চারণভূমি থেকে পেট ভরে খেয়ে ফেরত আসে, ওলান থাকত দুধে ভরা। একসময় যেখানে একফোঁটা দুধও পাওয়া যেত না, সেখানে আজ দুধ দোহন

করেই কূল পাওয়া যায় না। খরার মাঝেও তাই শিশু মুহাম্মাদ বেড়ে ওঠেন স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হয়ে। এভাবে সুখের এই সময়গুলো অতিবাহিত হতে থাকে। দু-বছর পরে দুধ পানের সময়সীমা পূর্ণ হলে হালীমা নবি ﷺ-কে দুধ খাওয়ানো ছাড়িয়ে দেন।

শিশু মুহাম্মাদকে বুকে রাখতে হালীমার ব্যাকুলতা

ছয় মাস পরপর মুহাম্মাদ ﷺ-কে মক্কায় তাঁর মা ও পরিবারের সাথে দেখা করাতে নিতেন হালীমা। দু-বছর পর যখন দুধ ছাড়ানো হয়, তখন সারা জীবনের তরে মুহাম্মাদ ﷺ-কে পরিবারের কাছে দিয়ে আসার সময় আসে। হালীমা এবার শিশুকে মায়ের কাছে নেওয়ার পর ব্যাকুল হয়ে খুব করে অনুরোধ করলেন, যেন আরও কিছুকাল তাকে রাখতে দেয়। কারণ, যে কল্যাণ ও নিয়ামাতের ছোঁয়া তারা পেয়েছিল তা অবর্ণনীয়। তিনি নবি ﷺ-এর মাকে বলেন যে, মরুভূমিতে সে শক্ত-সামর্থবান-সুঠাম হয়ে বেড়ে উঠবে। এমনিতেও মক্কায় অহরহ মহামারি লেগেই থাকে। তা থেকেও দূরে থাকতে পারবে। আমিনার সম্মতিতে খুশিমনে শিশুকে নিয়ে ফিরে আসেন হালীমা।[১৩]

আরও বছর দুই পর এক অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা ঘটে। যা দেখে হারিস-হালীমা দম্পতি খুব ভয় পেয়ে যান। ফলে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাদের অতি প্রিয় মুহাম্মাদকে মক্কায় মায়ের কাছে রেখে আসেন।[১৪]

বক্ষবিদারণ: অলৌকিক ঘটনা

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু)। হালীমার ঘরের কাছেই একদিন মুহাম্মাদ ﷺ অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন। এমন সময় ফেরেশতা জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে তাঁকে শোয়ান। তারপর বালক মুহাম্মাদের বুক চিরে তাঁর হৃদপিণ্ড বের করে আনেন। সেখান থেকে একটি টুকরো ফেলে দিয়ে বলেন, "আপনার মাঝে ওটা ছিল শয়তানের অংশ।" এরপর তিনি হৃৎপিণ্ডটি যামযামের পানিতে পূর্ণ একটি স্বর্ণপাত্রে রেখে ধৌত করেন। তারপর পরিচ্ছন্ন সেই অন্তর পুনঃস্থাপিত করেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর বক্ষে।

তখন অন্য বাচ্চারা আতঙ্কে কান্না করতে করতে দৌড়ে যায় হালীমার কাছে। গিয়ে বলে, মুহাম্মাদকে হত্যা করে ফেলেছে। হারিস-হালীমা দম্পতি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে

---

[১৩] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৬২-১৬৪; ইবনু হিব্বান, আস-সীরাহ, ৮/৮২-৮৪।

[১৪] ইবনু সা'দ, তবাকাতুল কুবরা, ১/১১২; মাসউদি, মুরূজুয যাহাব, ১/১৮১; আবূ নুআইম, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ১/১৬১-১৬২। অনেকে ইবনু আব্বাসের কথা অনুসারে এই ঘটনা ৫ম বছরে ঘটেছে বলে মত পেশ করেছেন।

বালক মুহাম্মাদকে জীবিত দেখতে পান। কিন্তু তাঁর চেহারা ভয়ে একেবারে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে।

আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর বুক ফাড়া সেলাইয়ের দাগটা তিনি দেখেছেন।[১৫]

মায়ের কোলে প্রত্যাবর্তন

এই অতি-অলৌকিক ঘটনার পর নবি ﷺ-কে তারা মক্কায় ফিরিয়ে দিয়ে যায়। পরের দু-বছর সেখানে তিনি মায়ের আদর, ভালোবাসা আর স্নেহ-মমতায় বেড়ে উঠতে থাকেন। তাঁর বয়স যখন ছয়, তখন তাঁকে সাথে করে নানাবাড়ি মদীনার উদ্দেশে রওনা দেন আবদুল মুত্তালিব, আমিনা ও উম্মু আইমান। নবিজি ﷺ-এর বাবার কবরও সেখানেই। মদীনায় এক মাস কাটানোর পর মক্কা-অভিমুখে ফিরতিপথের দীর্ঘ যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু পথে আমিনা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। একসময় অসুস্থতা বেড়ে গিয়ে তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি ধূলির এই ধরা থেকে বিদায় নেন। শিশু মুহাম্মাদ মা'কে হারিয়ে এখন ইয়াতীম। অসহায়। বাবা-মা দু'জনেরই ছায়াশূন্য। আমিনাকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়।[১৬]

পিতামহের স্নেহ-ছায়ায়

বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব মা-বাবা হারা নাতিকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। নতুন এই বিপদের কারণে তাঁর হৃদয়ে এমন এক মমতার উদ্রেক হয়, যা তিনি আপন সন্তানদের প্রতিও কখনও কোনোদিন অনুভব করেননি। তিনি নবি ﷺ-কে অনেক আদর করতেন এবং মর্যাদা দিতেন। শুধু তাঁর জন্য নির্মিত বিছানাতেও নবিজিকে বসাতেন, যেখানে অন্য কারও বসার অনুমতি ছিল না। অন্যান্য লোকজনের সাথে বসলেও তিনি পাশে একটি মাদুরে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বসাতেন। তাঁর পিঠ চাপড়ে দিতেন, প্রতিমুহূর্তে খেয়াল রাখতেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর উঠা-বসা, চাল-চলন-আচরণ প্রতিটি বিষয়ই তাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করত এবং আনন্দ দিত।

তিনি একরকম নিশ্চিত ছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁর নাতি অনেক বড় হবে। সবার মাঝে অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তা দেখে যেতে পারলেন না। নবিজির বয়স যখন মাত্র আট বছর দুই মাস দশ দিন, তখন আবদুল মুত্তালিব

---

[১৫] মুসলিম, ১৬২।

[১৬] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৬৮; ইবনুল জাওযি, তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসার, ৭।

মৃত্যুবরণ করলেন।[১৭]

চাচার মমতাময় প্রতিপালন

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আবূ তালিব দায়িত্ব নেন মুহাম্মাদ ﷺএর প্রতিপালনের। তিনি নবিজির আপন চাচা। তিনিও নবিজিকে অনেক আদর ও স্নেহ করতেন। আবূ তালিব ধনী ও সচ্ছল ছিলেন না। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তার অল্প সম্পদেও এমন বরকত হতে আরম্ভ করে যে, একজনের খাবারই পুরা পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। আর নবিজি ﷺ নিজেও ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টির ক্ষেত্রে আদর্শ ছিলেন, যা জুটত তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

সিরিয়া সফর ও পাদরির সঙ্গে সাক্ষাৎ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স যখন বারো বছর (কিছু তথ্যসূত্র অনুযায়ী, বারো বছর দুই মাস দশ দিন),[১৮] তখন আবূ তালিব সিরিয়ায় একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু না তিনি চাইছিলেন ভাতিজাকে রেখে যেতে, আর না মুহাম্মাদ ﷺ চাইছিলেন চাচার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে। শেষমেশ তাঁকে সাথে নিয়ে চলেন আবূ তালিব।

সিরিয়ার সীমান্তে বুসরার নিকটে পৌঁছে কাফেলা যাত্রাবিরতি করে। কাফেলাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসেন সে শহরে থাকা বড় এক খ্রিষ্টান পাদরি। অথচ এর আগে বহু কাফেলা এসেছে গিয়েছে কিন্তু তিনি তাদের নিকট আসেননি এবং তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেননি। তার নাম ছিল বুহাইরা।[১৯] সবাইকে অতিক্রম করে বালক মুহাম্মাদের কাছে এসে তাঁর হাত ধরে বুহাইরা বললেন, "এই বালক হবে পুরা বিশ্বের নেতা এবং মহাপ্রভুর বার্তাবাহক। আল্লাহ তাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন।"

সবাই বলল, "আপনি কীভাবে তা জানতে পারলেন?"

বুহাইরা জবাবে বললেন, "সে এদিকটায় আসামাত্রই দেখলাম সব পাথর আর গাছ তাকে সাজদা করার জন্য ঝুঁকে পড়েছে। গাছ ও পাথর নবিদের ছাড়া আর কাউকেই সাজদা করে না। শুধু তা-ই না। নুবুওয়াতের সিলমোহর দেখেও আমি তাকে চিনেছি।

---

[১৭] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৬৮-১৬৯; ইবনুল জাওযি, তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসার, ৭।

[১৮] ইবনুল জাওযি, তালকীহ, ৭।

[১৯] তবে কেউ কেউ বলেছেন, বাহীরা।

তার কাঁধের নিচের নরম হাড়ের ওপর আছে ওটা, অনেকটা আপেলের মতো দেখতে। আমরা আমাদের কিতাবেও এমনটি পেয়েছি।”

বুহাইরা এরপর সেই কাফেলার সম্মানার্থে একটি ভোজের আয়োজন করেন। পরে একসময় আবূ তালিবকে ডেকে নিয়ে অনুনয় করেন যেন বালক মুহাম্মাদ ﷺ-কে আর সামনে না নেওয়া হয়; বরং বাড়িতেই ফিরিয়ে দিতে বলেন তাঁকে। পাছে ইয়াহূদি বা রোমানরা তাঁকে প্রতিশ্রুত সেই নবি হিসেবে চিনতে পেরে হত্যা করতে আসে—এই ভয়েই তিনি এমন পরামর্শ দেন। পাদরির আশঙ্কা আবূ তালিব উপেক্ষা করতে পারলেন না। ভাতিজার নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন তিনি।[২০]

বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর মুহাম্মাদ ﷺ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন। এর মাঝে দুটি ঘটনা আলাদা মনোযোগের দাবিদার।

ফিজার যুদ্ধ

মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স তখন বিশ বছর। যুল-কা'দা মাসে যথারীতি চলছে উকায মেলা। কিন্তু সেখানের কোনও এক ঘটনার জের ধরে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ বেধে যায়। এক পক্ষে রয়েছে কুরাইশ ও কিনানা গোত্রদ্বয়, আরেক পক্ষে কায়স ও গায়লান।

অনেক রক্তপাতের পর অবশেষে তারা একটি সমঝোতায় আসতে সমর্থ হয়। যে পক্ষে বেশি হতাহত হয়েছে, সে পক্ষ রক্তপণ (অবৈধ হত্যার বিনিময়ে প্রদেয় আর্থিক জরিমানা) পাবে। উল্লেখ্য, এর আগের তিন বছরেও কিন্তু পরপর তিনটি দাঙ্গা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে মারামারি, কাটাকাটি ও রক্তাক্ত হওয়ার কোনও ঘটনা ঘটেনি। সাধারণ ঝগড়া-বিবাদ ছিল। মোট এই চারবারের লড়াই-ই ফিজার যুদ্ধ নামে পরিচিতি পায়। আরবিতে ফিজার অর্থ অনৈতিকতা। যুল-কা'দা মাসের পবিত্রতার কারণে এ-সময় যেকোনও ধরনের রক্তপাত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সেই পবিত্রতা লঙ্ঘন করে যুদ্ধটি বেধেছিল বলেই এই নাম।

কুরাইশের সদস্য হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ নিজেও সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল শত্রুপক্ষের ছোড়া তির সংগ্রহ করে স্বগোত্রীয় যোদ্ধাদের হাতে তুলে দেওয়া।[২১]

---

[২০] তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৬২০; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ১১৭৮২; বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ২/২৪-২৫; তাবারি, আত-তারীখ, ২/২৭৮-২৭৯।

[২১] ইবনুল আসীর, আল-কামিল ফিত তারীখ, ১/৪৬৮-৪৭২; ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৮৪-১৮৭; মুহাম্মাদ ইবনু হাবীব বাগদাদি, আল-মুনাম্মাক ফী আখবারি কুরাইশ, ১৬৪, ১৮৫।

হিলফুল ফুদূল

ফিজার যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরে সেই মাসেই কুরাইশের পাঁচটি বংশের মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর নাম হিলফুল ফুদূল। স্বাক্ষরকারী পক্ষগুলো হলো বানূ হাশিম, বানূ আবদিল মুত্তালিব, বানূ আসআদ, বানূ যাহরা এবং বানূ তাইম।

চুক্তিটির আবির্ভাব হয় এক লজ্জাকর ঘটনার প্রতিবাদে। স্রেফ অপরিচিত আর অচেনা হওয়ার অপরাধে এক ব্যক্তিকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করার ঘটনা। 'যুবাইদ' (ইয়েমেন) অঞ্চল থেকে এক ব্যক্তি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন। আস ইবনু ওয়াইল নামক স্থানীয় এক ব্যক্তি তার সকল পণ্য বিনামূল্যে ছিনিয়ে নেয়। অসহায় লোকটি একে একে বানূ আবদিদ দার, বানূ মাখযূম, বানূ জামাহ্, বানূ সাহ্ম ও বানূ আদির কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। একটা মানুষও তার সেই আকুল আবেদনে সাড়া দেয়নি। মরিয়া হয়ে লোকটি জাবালে আবী কুবাইস-এর চূড়ায় উঠে দাঁড়ান। সবার কাছে ঘোষণা করেন নিজের দুঃখের কাহিনি। শ্রোতাদের কাছে সাহায্যের চেয়ে আকুল আবেদন ব্যক্ত করেন। সে আবেদনে সাড়া দেন যুবাইর ইবনু আবদিল মুত্তালিব। দুর্দশাগ্রস্ত অচেনা লোকটির দিকে বাড়িয়ে দেন সাহায্যের হাত।

যুবাইর সকল গোত্রের প্রতিনিধিদের এক জায়গায় জড়ো হওয়ার আহ্বান করেন। বানূ তাইমের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু জুদআনের বাড়িতে সভা বসে। সেখানে গোত্রপতিরা এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করেন। এখন থেকে বংশ-গোত্র নির্বিশেষে যেকোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়-অত্যাচার প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর আস ইবনু ওয়াইলকে বাধ্য করা হয় ওই ব্যক্তির পণ্যদ্রব্য ফিরিয়ে দিতে।

চুক্তির সময় মুহাম্মাদ ﷺ-ও সে সভায় নিজ চাচাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন।

নুবুওয়াত লাভের পর তিনি ঘোষণা করেন, "আবদুল্লাহ ইবনু জুদআনের ঘরে সেই চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনায় আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম। এমন এক চুক্তি, যার বিনিময়ে লাল উটও আমার অপছন্দ। ইসলামের যুগেও যদি সে চুক্তির জন্য আমাকে ডাকা হতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাতে সাড়া দিতাম।"[২২]

নবিজির কর্মজীবন

মুহাম্মাদ ﷺ ইয়াতীম হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রথমে আপন দাদা পরে চাচার অধীনে লালিত-পালিত হয়েছেন। পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অল্প কিছু সম্পদ

[২২] ইবনু সা'দ, তবাকাতুল কুবরা, ১/১২৬-১২৮; যুবাইরি, নাসাবু কুরাইশ, ২৯১।

পেয়েছিলেন, যা দিয়ে তেমন কিছুই করার উপযোগী ছিল না। এই কারণে তিনি যখন হালকা-পাতলা কাজ করার উপযুক্ত হন তখন থেকে তাঁর দুধভাইদের সাথে বানূ সা'দের ছাগল চরাতেন।[২৩]

মক্কায় ফিরে আসার পরও মাত্র কয়েক কীরাতের[২৪] বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগলের রাখালি করতেন।[২৫]

শুরু-জীবনে বকরি চরানো আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)-দের সুন্নাত। এই রাখালগিরি কিন্তু যেনতেন কোনও কাজ নয়। নবিজীবনে এই পেশার রয়েছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব। নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন,

وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا

"প্রত্যেক নবিই বকরি বা ভেড়া চরিয়েছেন।"[২৬]

যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন তিনি নিজেকে ব্যবসায়িক কাজে নিযুক্ত করেন। কিছু কিছু বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল ﷺ সাইব ইবনু আবী সাইবের সাথে মিলে ব্যবসা করতেন। নবিজি ছিলেন সর্বোত্তম ও বিনম্র পার্টনার। কখনও বাদানুবাদ কিংবা ঝগড়া করতেন না।[২৭] লেনদেনসহ সমস্ত কাজে বিশ্বস্ততা ও সততা ছিল তাঁর আমরণ সঙ্গী। এই কারণেই সবার মুখে মুখে তিনি "আল-আমীন" (অতি বিশ্বস্ত) বলে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে যান।

সিরিয়ায় ব্যবসা-যাত্রা

বিশ্বস্ত কর্মী সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের। যাতে তাদের সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ হয়। এমনই এক ব্যবসায়ী ছিলেন কুরাইশ গোত্রের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও ধনী নারী খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ। লোক ভাড়া করে তিনি তাদের দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্য পরিবহন ও বিক্রি করাতেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিশ্বস্ততার সুনাম শোনার পর খাদীজা কালবিলম্ব না করে তাঁকে কাজে নিয়ে নেন। ফলে যুবক মুহাম্মাদ ﷺ ব্যবসায়িক মালামাল নিয়ে সিরিয়া গমন করেন। সাথে থাকে খাদীজার একজন দাস মাইসারা।

[২৩] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৬৬।

[২৪] কীরাত হলো এক দীনারের বিশ ভাগের এক ভাগ বা চব্বিশ ভাগের এক ভাগ, যার মূল্য বর্তমানে সর্বোচ্চ ৮০-৯০ রুপিয়া (১০০-১১০ টাকা)।

[২৫] বুখারি, ২২৬২।

[২৬] বুখারি, ৫৪৫৩।

[২৭] আবূ দাউদ, ৪৮৩৬; ইবনু মাজাহ, ২২৮৭; আহমাদ, ৩/৪২৫।

অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত এক সফর শেষে মক্কায় ফেরেন মুহাম্মাদ ﷺ। এ-সময় ব্যবসায় প্রচুর লাভ হয় এবং সম্পদে এত বরকত হয় যে ইতিপূর্বে কখনও এমন হয়নি। মক্কায় এসে খাদীজার হাতে তুলে দেন বিপুল পরিমাণ মুনাফা।[২৮]

খাদীজার সাথে বিবাহ

ইতিমধ্যে খাদীজার দু'জন স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। বর্তমানে তিনি স্বামীহীন, বিধবা। প্রথম স্বামীর নাম আতীক ইবনু আয়িয মাখযূমি। তার মৃত্যুর পর বিবাহ করেন আবূ হালা তাইমিকে। আবূ হালার ঘরে তাঁর এক পুত্রসন্তানেরও জন্ম হয়। দ্বিতীয় স্বামী আবূ হালাও মৃত্যুবরণ করে। এরপর কুরাইশের একাধিক প্রভাবশালী নেতার কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি সবগুলোই ফিরিয়ে দেন। এবার মাইসারার কাছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সততা-বিশ্বস্ততা, দক্ষতা ও সুউচ্চ চরিত্রের বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান খাদীজা। তারপর যখন শুনলেন, সূর্যের তাপ থেকে বাঁচাতে দু'জন ফেরেশতা তাঁকে ছায়া দান করছিল—তখন খাদীজা অনুভব করলেন, জীবনসঙ্গী তিনি পেয়ে গেছেন। পরে বান্ধবী নাফীসার মাধ্যমে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে বিয়ের প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন।

মুহাম্মাদ ﷺ এ ব্যাপারে তাঁর চাচাদের সাথে পরামর্শ করেন। তারা খাদীজার চাচা আমর ইবনু আসাদের কাছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে খাদীজার জন্য বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। ভাতিজির পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করেন আমর। দেনমোহর হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ বিশটি উট প্রদান করেন (অন্য বর্ণনায় ছয়টি উটের কথাও আছে)। বানূ হাশিম ও কুরাইশ গোত্রপতিদের উপস্থিতিতে শুভ কাজটি সুসম্পন্ন হয়। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও স্তুতি এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর মর্যাদা ও গুণাবলি সহকারে খুতবা পাঠ করে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন আবূ তালিব। সিরিয়া থেকে ফেরত আসার দুই মাস কয়েক দিনের মাথায়ই পঁচিশ বছর বয়সি মুহাম্মাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। কনের বয়স ছিল চল্লিশ। কোনও কোনও বর্ণনায় আটাশের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

খাদীজা থেকে নবিজি ﷺ-এর সন্তানাদি

খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা) মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী। তিনি জীবিত থাকাবস্থায় নবি ﷺ আর কোনও বিবাহ করেননি। ইবরাহীম ছাড়া নবিজির বাকি সব সন্তান খাদীজার গর্ভেই জন্ম নেন। ইবরাহীম মারিয়া কিবতিয়া (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। নবিজির ছেলে-মেয়েদের নাম:

[২৮] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৮৭-১৮৮।

প্রথম—কাসিম	পঞ্চম—ফাতিমা
দ্বিতীয়—যায়নাব	ষষ্ঠ—আবদুল্লাহ
তৃতীয়—রুকাইয়া	সপ্তম—ইবরাহীম।
চতুর্থ—উম্মু কুলসূম	রদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

অবশ্য তাঁদের সঠিক সংখ্যা ও বয়সের ক্রম নিয়ে গবেষকদের মতপার্থক্য আছে। পুত্রসন্তান সব শিশুকালেই মারা যান। তবে কন্যারা সবাই পিতার নুবুওয়াত-প্রাপ্তি দেখেছেন। প্রত্যেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন ও মদীনায় হিজরতও করেছেন। ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) ছাড়া বাকি সবাই নবিজির জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। আর ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের ছয় মাস পরে ইন্তিকাল করেন।[২৯]

বাইতুল্লাহ বিনির্মাণ ও কালো পাথর ঘিরে বিবাদ নিরসন

মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ, তখনকার ঘটনা। এক বিধ্বংসী বন্যায় কা'বা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর আগেও আরেক অগ্নিকাণ্ডে দেয়াল দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। বন্যা এল গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে। ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন এক স্থাপনা একদম ধসে পড়ার দ্বারপ্রান্তে। একটু পরেই হয়তো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

কুরাইশরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল স্থাপনা সংস্কারের। জাহিলি যুগ হলে কী হবে? কিছু ব্যাপারে তখনো কুরাইশদের ধর্মীয় সততার চেতনা ছিল একদমই টনটনে। উক্ত সংস্কারকর্মকে তারা সব রকমের অবৈধ উপার্জনের টাকা থেকে পবিত্র রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

তবে সংস্কার করার আগে তো পুরো দেয়াল ভেঙে ফেলতে হবে। কুরাইশরা ভয় পেতে থাকে যে, পবিত্র ঘরটির সাথে এমন মন্দ আচরণ হতে দেখলে আল্লাহ পাকড়াও করবেন। অবশেষে ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা সাহস করে এগিয়ে আসেন। ঘোষণা দেন, "আল্লাহ সংস্কারকদের ধ্বংস করবেন না।" এই বলে তিনি দেয়াল ভাঙার কাজ শুরু করেন। কোনও আসমানি শাস্তি আসছে না দেখে বাকিরাও আশ্বস্ত হয়ে কাজে হাত

[২৯] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৮৯-১৯১; ইবনুল জাওযি, তালকীহ, ৭; ইবনু হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারি, ৭/১০৫।

দেয়। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর নির্মাণ করা আদি ভিত্তি ছাড়া পুরো কা'বা ভেঙে ফেলা হয়।

পুনর্নির্মাণ কাজে সব গোত্রকে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। সম্ভ্রান্তরা পাথরের টুকরো বহন করে নিয়ে এক জায়গায় স্তূপ করতে থাকেন। মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর চাচা আব্বাসও এ কাজেই নিয়োজিত ছিলেন।

বাকূম নামক জনৈক রোমান রাজমিস্ত্রি দেয়াল পুনর্নির্মাণের মূল কাজটি করেন। কিন্তু পুরা কাজ সম্পন্ন করার মতো যথেষ্ট টাকা কুরাইশদের কাছে ছিল না। ফলে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ভিত্তি অনুযায়ী নির্মাণ পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। তাই উত্তর দিকে ছয় হাতের মতো জায়গা ছেড়ে দিয়ে তার ওপর ছোট্ট করে একটি দেয়াল তুলে দেওয়া হয়। যাতে বোঝা যায় এটিও কা'বার অংশ। এ অংশটিকে বলা হয় হাজর এবং হাতীম।

যে স্থানে কালো পাথর (হাজরে আসওয়াদ) স্থাপন করার কথা, ওই পর্যন্ত দেয়ালের নির্মাণকাজ শেষ হলে দেখা দেয় এক বিরাট সমস্যা। প্রত্যেক গোত্রপতিই হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের বিরল সম্মান অর্জন করতে চায়। কেউ কাউকে ছাড় দিতে প্রস্তুত না। এনিয়ে তুমুল ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। যা চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত অবিরাম চলতে থাকে। এবার যেন হারামে রক্তপাত আর খুন-খারাবি ছাড়া কোনও সমাধান নেই। শেষমেশ একটি সমাধান নিয়ে এগিয়ে আসেন তাদের প্রবীণতম ব্যক্তি আবূ উমাইয়া। সমাধান পেশ করেন যে, পরবর্তী যে ব্যক্তিটি কা'বার ফটক দিয়ে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন, তাকেই এই বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব দেওয়া হবে। সকলেই তা মেনে নেয়। আর আল্লাহর কী মহিমা! ফটক দিয়ে ঢোকা পরবর্তী ব্যক্তিটি স্বয়ং মুহাম্মাদূর রাসূলুল্লাহ ﷺ।

তাঁকে দেখামাত্রই বলে সবাই উঠল, "আরে! এ তো মুহাম্মাদ! এমন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত মানতে আমাদের কারও কোনও আপত্তি নেই।" পুরো ব্যাপার শোনার পর মুহাম্মাদ ﷺ একটি কাপড় নিয়ে আসতে বললেন। হাজরে আসওয়াদকে সেই কাপড়ে বসিয়ে ডাক দিলেন প্রত্যেক গোত্রপতিকে। সবাইকে একসাথে কাপড়ের একেকটি দিক ধরে তুলতে বললেন পাথরটি। তাই করলেন সবাই। মুহাম্মাদ ﷺ তারপর নিজ হাতে পাথরটি যথাস্থানে বসিয়ে দেন। চমৎকার এই সমাধান মেনে নিয়ে মারাত্মক এক কোন্দল থেকে রক্ষা পেয়ে গেল সবাই।

ভূমি থেকে প্রায় দেড় মিটার উঁচুতে হাজরে আসওয়াদ। আর কা'বার দরজা দুই মিটার উঁচুতে। দরজা এত উঁচুতে করার কারণ হলো কুরাইশরা তাদের অনুমতি ছাড়া কাউকে

কা'বায় প্রবেশ করাতে নারাজ। দেয়ালের উচ্চতাও তারা আগের চেয়ে দ্বিগুণ করে আঠারো হাত আঠারো হাত করে বানায়। আগে ছিল নয় হাত নয় হাত করে। কা'বার ভেতরে দুই সারিতে ছয়টি স্তম্ভের ওপর পনেরো হাত উচ্চতায় স্থাপন করে একটি ছাদ। যেখানে আগে না ছিল কোনও স্তম্ভ আর না ছিল কোনও ছাদ।[৩০]

নুবুওয়াত লাভের পূর্বে নবি ﷺ-এর গুণাবলি

নুবুওয়াত লাভের আগে থেকেই মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাঝে প্রকাশিত হতো ভবিষ্যৎ-নবির অনেক গুণাবলি। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন প্রখর মেধাবী ও সচ্চরিত্র। সততা, সাহস, ন্যায়পরায়ণতা, সুকৃতি, ধৈর্য, নম্রতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির জন্য ছিলেন সুখ্যাত। প্রিয় ভাতিজার বর্ণনা দিয়ে আবূ তালিব বলেন,

"সে উজ্জ্বল ফর্সা, তাঁর বরকতেই রহমতের বৃষ্টি ঝরে।
সে এতিমদের আশ্রয়স্থল, বিধবাদের সুরক্ষা করে।"

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা, অন্যের বোঝা বহন, আতিথেয়তা ও দুর্দশাগ্রস্তদের স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।[৩১]

আল্লাহর রাসূল হিসেবে একদিন তিনি মূর্তিপূজা আর বহুত্ববাদের শেকড় উপড়ে ফেলবেন। এরই লক্ষণ হিসেবে তাঁর অন্তরে ছিল সমসাময়িক পৌত্তলিক সংস্কৃতির প্রতি সুপ্ত ঘৃণা। তাই সমাজের সাথে মিশে থাকা মানুষ হয়েও জীবনে কোনোদিন তিনি পৌত্তলিকতা ও মাদক-কেন্দ্রিক স্থানীয় পালা-পার্বণের কোনোটিতেই অংশ নেননি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবাই করা প্রাণীর গোশত পরিহার করার ব্যাপারেও ছিলেন সদা সচেতন। মূর্তি স্পর্শ করা তো দূরের কথা, সেগুলোর কাছেও যেতেন না তিনি। বিশেষত পৌত্তলিকদের প্রধান দুটি দেবী লাত ও উযযার নামে কসম করার প্রথাটিকে তিনি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন।[৩২]

---

[৩০] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/১৯২-১৯৭; তাবারি, আত-তারীখ, ২/২৮৯; বুখারি, ১৫৮২; আবূ দাউদ, আল-মুসনাদ, ১৪৯৬।

[৩১] বুখারি, ০৩।

[৩২] ইবনু হিশাম, ১/১২৮; তাবারি, আত-তারীখ, ২/১৬১; ইবনু আসাকির, তাহযীবু তারীখি দিমাশ্‌ক, ১/৩৭৩-৩৭৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নুবুওয়াত-প্রাপ্তি, আল্লাহর প্রতি আহ্বান ও আপতিত নিপীড়ন-নির্যাতন
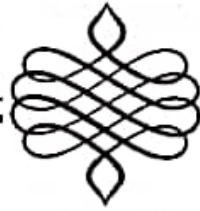
নুবুওয়াত ও সৌভাগ্যের নিদর্শন

মক্কায় সামাজিক বন্ধনের সবচেয়ে দৃঢ় কিছু নিয়ামকের বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ঘৃণা একদমই সুস্পষ্ট। এ থেকেই বোঝা যায়—একটা সময়ে মক্কাবাসীদের সাথে তাঁর বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। প্রকাশ্য মদ্যপান ও কন্যাশিশু-হত্যার এই সমাজ একসময় তাঁকে মেনে নেবে না। ক্রমেই একাকিত্ব তাঁর কাছে পছন্দনীয় হতে উঠতে থাকে। পালা-পার্বণের হই-হুল্লোড় আর বাজারের চ্যাঁচামেচি থেকে দূরের নীরবতা তাঁকে প্রশান্তি দেয়। একই সাথে আসন্ন ধ্বংস থেকে জাতিকে বাঁচানোর ভাবনাও ঝড় তোলে অন্তরে। অন্তরের অসন্তোষ বাড়তে বাড়তে একসময় তিনি আশ্রয় নেন হেরা গুহায়।[৩৩] এখানে তিনি একা একা দীর্ঘ সময় কাটাতেন। সকল মূর্তি ও কাল্পনিক উপাস্যকে ছেড়ে এখানেই অদ্বিতীয় সত্য আল্লাহর উপাসনার সূচনা হয় তাঁর মাধ্যমে।

একত্ববাদী পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বাছাইকৃত নির্দিষ্ট কিছু কর্মধারা অনুসরণ করে মুহাম্মাদ ﷺ পরপর তিন বছর রমাদান মাসগুলো এই গুহায় অতিবাহিত করেন। এরপর তিনি মক্কায় ফিরে গিয়ে কা'বা তওয়াফ করে ঘরে যেতেন। এভাবে নবিজির বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়। আর চল্লিশতম বছরই হলো মানবজীবনের সর্বদিক বিবেচনায় পরিপূর্ণতার বছর। সাধারণত এ-বয়সেই নবিদের নুবুওয়াত প্রদান করা হয়ে থাকে। চল্লিশ বছর বয়সে মুহাম্মাদ ﷺ নুবুওয়াতের কিছু লক্ষণ বোধ করতে শুরু করেন। তিনি কল্যাণকর স্বপ্ন দেখতেন, আর যা দেখতেন বাস্তবে তা-ই ঘটত। আবার আলো দেখতে পেতেন এবং আওয়াজ শুনতেন। রাসূল ﷺ বলেছেন,

> "মক্কার একটি পাথরকে আমি চিনি, যে আমার নুবুওয়াতের পূর্বেই আমাকে সালাম দিত।"[৩৪]

নুবুওয়াতের সূচনা ও ওহির অবতরণ

যথারীতি তিনি তৃতীয় রমাদানেও হেরা গুহায় একাকী আল্লাহর যিক্‌র ও ইবাদাত করছিলেন। তখন নবি ﷺ-এর বয়স একচল্লিশ চলছিল। হঠাৎ সেখানে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে ওহি ও নুবুওয়াত দানে

---

[৩৩] হেরা পর্বত বর্তমানে 'জাবালুন নূর' (আলোর পাহাড়) নামে পরিচিত। মক্কা থেকে প্রায় দু-মাইল দূরে অবস্থিত। পাহাড়টির চূড়া দূর থেকেই দেখা যায়। হেরা পর্বতের সেই গুহাটি দৈর্ঘ্যে চার মিটারের কিছু কম, আর প্রস্থে দেড় মিটারের কিছু বেশি।

[৩৪] মুসলিম, ২২৭৭।

সৌভাগ্য-মণ্ডিত করেন। বহু হাদীসের বর্ণনাকারী আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর মুখেই শোনা যাক সাধারণ এক মানুষের নবি হয়ে ওঠার মুহূর্তটি সম্পর্কে:

“নবি ﷺ-এর ওপর ওহির সূচনা হয় ঘুমের মধ্যে ভালো ভালো স্বপ্ন দেখার মাধ্যমে। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন তা হুবহু সেভাবেই ঘটত, প্রভাতের আলোর ন্যায় (সুস্পষ্ট)। এরপর একসময় তাঁর কাছে একাকিত্ব প্রিয় হয়ে ওঠে। হেরা গুহায় গিয়ে তিনি কয়েক দিন ও রাত ধ্যান করে কাটাতেন। বেশ কিছুদিন থাকার মতো খাবার-পানি সাথে করে নিয়ে যেতেন তিনি। পরে কোনও একসময় খাদীজার কাছে ফিরে এসে আবারও জিনিসপত্র গুটিয়ে রওনা হতেন। কয়েকদিন ধরে এ-রকমই চলল। অবশেষে একদিন তিনি হেরা গুহায় থাকাকালে এক ফেরেশতা তাঁর কাছে আসেন সত্যের বাণী নিয়ে। ফেরেশতা এসে বললেন, “পড়ুন!”

“আমি পড়তে জানি না।” মুহাম্মাদ ﷺ জবাব দিলেন। ফেরেশতা তাঁকে ধরে সজোরে চাপ দিয়ে সহ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে আবারও বললেন, “পড়ুন!”

মুহাম্মাদ ﷺ বললেন, “আমি তো পড়তে জানি না!” ফেরেশতা আবারও আগের মতো চাপ দিয়ে বললেন, “পড়ুন!”

মুহাম্মাদ ﷺ একইভাবে বললেন, “আমি পড়তে পারি না!” তৃতীয়বারের মতো চাপ দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার পর ফেরেশতা বললেন, “পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তবিন্দু থেকে। পড়ুন! আর আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।”[৩৫]

ভীত-সন্ত্রস্ত নবিজির হৃৎপিণ্ডের গতি প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। দ্রুত ঘরে ফিরে এসে খাদীজাকে বলতে লাগলেন, “আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও!” খাদীজা তাঁর গায়ে চাদর জড়িয়ে দিয়ে তাঁকে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, “কী হয়েছে সেটা তো বলবেন!” খানিক ধাতস্থ হয়ে নবিজি ﷺ হেরা গুহায় ঘটে যাওয়া সবকিছুর বর্ণনা দিলেন। তারপর বললেন, “আমি আমার জীবন-নাশের আশঙ্কা করছি!!”

খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, “আল্লাহর শপথ! এমন কখনও হবে না।

---

[৩৫] সূরা আলাক, ৯৬ : ১-৫।

আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। কারণ, আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায়ের বোঝা নিজে বহন করেন, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং ভালো কাজে সহযোগিতা করে থাকেন।"

এরপর খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা) মুহাম্মাদ ﷺ-কে তার এক জ্ঞাতিভাইয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর নাম ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল। মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তিনি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর দ্বীন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষা পড়তে ও লিখতে জানতেন। আল্লাহ তাআলার তাওফীকে হিব্রু ভাষায় ইনজিল লিপিবদ্ধ করছিলেন। সে সময় তিনি অতিশয় বৃদ্ধ এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

খাদীজা বললেন, "ভাই, শুনুন তো আপনার ভাতিজা কী বলে।"

ওয়ারাকা বললেন "ভাতিজা, কী হয়েছে?" নবি ﷺ তার কাছে পুরো ঘটনা বিস্তারিতভাবে বললেন। সব শুনে ওয়ারাকার বিস্ময়কর জবাব, "আরে! এ তো সেই একই ফেরেশতা, যাকে আল্লাহ তাআলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কাছেও পাঠিয়েছিলেন! ইস্! আমি যদি এখন যুবক থাকতাম! তোমার কওম যেদিন তোমাকে এই শহর থেকে বের করে দেবে, সে সময় পর্যন্ত আমি যদি জীবিত থাকতাম!"

"তারা আমাকে বের করে দেবে?" অবাক হয়ে বললেন মুহাম্মাদ ﷺ!

"হ্যাঁ! তোমার মতো এই বিষয় যাদের কাছেই এসেছিল, তাঁদের সবাই এ-রকম শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছেন। তুমি বহিষ্কৃত হওয়ার সময় যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে অবশ্যই সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করব তোমায়।" এর কিছুদিন পর ওয়ারাকার মৃত্যু হয় এবং ওহি আসা বন্ধ হয়।[৩৬]

নুবুওয়াত ও ওহি সূচনার তারিখ

এই ঘটনাই ওহি অবতীর্ণ হওয়ার ও নুবুওয়াত-প্রাপ্তির সর্বপ্রথম ঘটনা। এটি সংঘটিত হয় রমাদান মাসে কদরের রাত্রে (লাইলাতুল কদর-এ)।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

---

[৩৬] বুখারি, ০৩; মুসলিম, ১৬০।

"রমাদান মাস, এ মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়।"[৩৭]

আবার অন্য স্থানে বলেছেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾

"নিশ্চয়ই আমি একে অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে।"[৩৮]

বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এই ঘটনা ঘটে সোমবার রাতের শেষ প্রহরে সূর্যোদয়ের খানিক পূর্বে। সময়টা ছিল রমাদান মাসে কদরের রাত্রি। সে বছর কদর ছিল ২১ রমাদানে। সে অনুসারে নবি ﷺ-এর নুবুওয়াতের সূচনা হয় তাঁর জন্মের একচল্লিশতম বছরের ২১ রমাদান সোমবার রাতে।[৩৯] ১০ আগস্ট ৬১০ ঈসায়ি। চন্দ্রবর্ষের হিসেবমতে তখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর বয়স ছিল ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন। আর সৌরবর্ষের হিসেবমতে ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন। সৌরবর্ষ অনুসারে নবি ﷺ চল্লিশতম বছরের শুরুর দিকেই নুবুওয়াত-প্রাপ্ত হয়েছেন।

ওহি-বিরতি ও পুনরাবৃত্তি

হেরা গুহার সে ঘটনার পর কোনও ওহি আসা ছাড়াই বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে যায়।[৪০] মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুশ্চিন্তা হয় যে, আল্লাহ মনে হয় তাঁকে ত্যাগ করেছেন। কিন্তু কেন? হতাশায় মাঝেমাঝে তিনি পাহাড় থেকে লাফ দিতে চাইতেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়টায় জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর উপস্থিতি অনুভূত হতো, ফলে শান্ত হয়ে যেতেন তিনি। আসলে এই বিরতিটুকু পরেরবার ওহি লাভের কষ্ট সামলাতে মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রস্তুত করে। ভয় দূর করে এবং নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করে। এ কারণে বরং তিনি ওহির প্রতি একধরনের আগ্রহ ও টান অনুভব করেন। ওহি অবতীর্ণ হওয়ার প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

মুহাম্মাদ ﷺ একদিন হেরা গুহায় ইবাদাত শেষে পাহাড় বেয়ে নামছিলেন। এমন সময় আরেকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। তাঁর নিজের বর্ণনায় ঘটনাটি এমন:

"পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকায় আসতেই কাউকে আমাকে ডাকতে শুনলাম। ফলে

---

[৩৭] সূরা বাকারা, ২ : ১৮৫।

[৩৮] সূরা কদর, ৯৭ : ১।

[৩৯] অন্য একটি সহীহ হাদীস অনুযায়ী কুরআন অবতীর্ণের তারীখ হলো, ২৪ রমাদান (২৫তম রাতে)। আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/১০৭।

[৪০] ইবনু সা'দ, তবাকাতুল কুবরা, ১/১৯৬।

আমি আমার ডানে তাকালাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। বামে তাকালাম সেখানেও কিছু নেই। সামনে তাকালাম, পেছনে তাকালাম কিন্তু কিছুই দেখলাম না। এরপর আমি মাথা তুলে দিগন্তপানে তাকালাম। দেখি হেরা গুহায় আমার কাছে যিনি এসেছিলেন, সেই ফেরেশতা। আসমান ও জমীনের মাঝে বিরাট এক চেয়ারে বসে আছেন। তাঁকে দেখে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলাম। এরপর দ্রুতপায়ে বাসায় ফিরে খাদীজাকে বললাম, "আমায় চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! আমায় চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে কম্বল পরিয়ে দাও আর আমার ওপর একটু ঠান্ডা পানি ঢালো!" ফলে সে আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয় এবং ঠান্ডা পানি ঢালে। অতঃপর অবতীর্ণ হতে শুরু করে—

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾

"হে বস্ত্রাবৃত, উঠুন এবং সতর্ক করুন! আপনার প্রতিপালকের বড়ত্ব বর্ণনা করুন। পোশাক পবিত্র করে নিন। অপবিত্রতা পরিহার করুন। বেশি পাওয়ার লোভে দান করবেন না; বরং আপনার প্রতিপালকের জন্য ধৈর্য ধরুন।"[৪১]

এই ঘটনা সালাত ফরজ হওয়ার পূর্বেই ঘটেছিল। এরপর থেকে ওহি ধারাবাহিকভাবে নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়।[৪২]

প্রথম ওহির মাধ্যমে মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ওহির মাধ্যমে তাঁকে রাসূল হিসেবে নির্বাচিত করা হলো। নুবুওয়াত ও রিসালাতের মাঝে ওহি-বিরতির সময়টুকুই ব্যবধান। উক্ত আয়াতে নবি ﷺ-কে দুটো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সে দুটি কাজের পরিণামও জানিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমটি হলো, قُمْ فَأَنذِرْ 'উঠুন এবং সতর্ক করুন' আদেশ করা হচ্ছে, মানুষকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ জানিয়ে দিতে এবং তাদের পাপরাশির কঠোর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতে। তারা যে পথভ্রষ্টতা ও পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে, গাইরুল্লাহর পূজা করছে এবং আল্লাহর সাথে তাদের শরীক করছে এর পরিণামে আল্লাহ তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো, আপনি নিজেও আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলো যথাযথভাবে পালন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হোন। অন্যের জন্য নিজেকে আদর্শ হিসেবে

[৪১] সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৭।
[৪২] বুখারি, ৪৯২৬; মুসলিম, ১৬১।

গড়ে তুলুন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে এই আদেশ করা হয়েছে।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ—'আপনার প্রতিপালকের বড়ত্ব বর্ণনা করুন'—দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনি বড়ত্ব এবং মহত্ত্ব বর্ণনার জন্য কেবল আল্লাহ তাআলাকেই নির্দিষ্ট করে নিন। এর মধ্যে অন্য কাউকে শরীক করবেন না।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ—এই আয়াতের আক্ষরিক অর্থ হলো, 'আপনার পোশাক পবিত্র করে নিন'—যাতে আপনার কাপড়ে এবং শরীরে কোনও নাপাকি না থাকে। কারণ, আল্লাহর সামনে অপবিত্রাবস্থায় দাঁড়ানো অনুচিত। তবে গবেষকদের মতে আক্ষরিক অর্থের পাশাপাশি এটিও উদ্দেশ্য যে, আপনি আপনার অন্তরাত্মাকে পবিত্র রাখুন।

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ —'অপবিত্রতা পরিহার করুন'—বলে নবি ﷺ-কে আদেশ করা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও আযাবের কারণসমূহ থেকে এবং নিজ সম্প্রদায়ের মন্দ-কর্ম, অসৎ আচরণ ও অপবিত্রতা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন।

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ—'বেশি পাওয়ার লোভে অনুগ্রহ করবেন না'—অর্থাৎ পার্থিব জীবনেই কাজের প্রতিদান পেতে তাড়াহুড়া করবেন না; বরং মনে করবেন, বিপদাপদ হলো পরীক্ষার একটি পন্থা। এই জন্য নিজ সম্প্রদায়ের দ্বীন ছেড়ে দেওয়া এবং এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে গিয়ে কষ্ট ও মুসীবত সহ্য করতে নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন।

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ —'আর আপনার প্রতিপালকের জন্য ধৈর্য ধরুন।'

শুরু হলো আল্লাহর দিকে আহ্বান

নবি ও রাসূল হিসেবে নিজের দায়িত্বগুলো দৃঢ় প্রত্যয়ে পালন করতে তৈরি হন মুহাম্মাদ ﷺ। উক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকেই নবি ﷺ মানুষকে আল্লাহর প্রতি, ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়া আরম্ভ করে দেন। যেহেতু আরব জাতি মূর্তিপূজারি, অগ্নিপূজারি ছিল, নিজ পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত রীতি-নীতিকেই নির্ভুল ও সঠিক মনে করত, তাদের অহংকারও ছিল খুব বেশি, সামান্য বিষয়েই খুনাখুনি ও রক্তপাত করা ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য—এই সব বিষয় সামনে রেখেই আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-কে দাওয়াতের কাজ গোপনে গোপনে করার নির্দেশ দেন। শুধু তাদেরই দাওয়াত দেওয়ার জন্য আদেশ করেন, যারা সত্য গ্রহণে আগ্রহী এবং যাদের নিকটে ক্ষতির আশঙ্কা নেই। এ জন্যে নবি ﷺ সর্বপ্রথম নিজ পরিবার, গোত্র এবং কাছের বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত দিতে থাকেন।

সর্বপ্রথম ঈমান আনলেন যাঁরা

স্বামী মুহাম্মাদ যে আল্লাহর রাসূল ও নবি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন, এ কথা সবার আগে বিশ্বাস করে নেন নবিজির স্ত্রী খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)।

আসলে সবচেয়ে কাছের মানুষ হিসেবে তিনিই সবচেয়ে ভালো করে জানতেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ কোনও যেনতেন ব্যক্তি নয়। তাঁর সুমহান চরিত্র ও স্বভাবজাত নৈতিকতা তাঁকে সমাজের আর দশটা মানুষ থেকে আলাদা করেছে। আল্লাহর অনাগত শেষ রাসূলের আবির্ভাবের ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা তিনি আগেই শুনেছিলেন। আবার তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে ঘটা কিছু অলৌকিক ঘটনার কথাও অন্যদের মাধ্যমে জেনেছিলেন। তা ছাড়া ওয়ারাকা ইবনু নাওফালের কথাগুলো তো তিনি সামনাসামনিই শুনেছেন। সর্বোপরি, সূরা মুদ্দাসসির নাযিল হওয়ার সময় তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তিনিই যদি সর্বপ্রথম ইসলাম-গ্রহণকারী না হন, তাহলে আর কে হবে!

আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) খাদীজা (রদিয়াল্লাহ আনহা)-এর পর সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছেন। তিনি এই উম্মাহর প্রথম মুমিন পুরুষ। সূরা মুদ্দাসসিরের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পরই রাসূল ﷺ আবূ বকরের কাছে ছুটে যান। তিনি তখন মক্কার একজন প্রধান ব্যবসায়ী। নিজ গুণেই যথেষ্ট প্রভাবশালী লোক। নবি ﷺ-এর চেয়ে মাত্র দু-বছরের ছোট। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সত্যবাদিতা ও অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি ভালোই অবগত। আল্লাহর রাসূলের মুখে পুরো ঘটনা শোনার পর তিনি এতটুকুও সন্দেহ করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দিলেন। আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইসলাম গ্রহণ করাই মুহাম্মাদ ﷺ সত্য হওয়ার অনেক বড় একটি প্রমাণ। কারণ, তিনি তাঁর ছোটবেলা থেকেই প্রকাশ্য-গোপন সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতেন।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর মিশন শুরু হওয়ার সময় আলি ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) একেবারেই অল্পবয়সি বালক। কিছু সূত্র থেকে জানা যায়, মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি ইসলাম কবুল করেন। তাঁর বাবা আবূ তালিব প্রত্যেক সন্তানের ব্যয়ভার বহন করতে অপারগ হওয়ায় আলি থাকতেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে। আর জা'ফার ছিলেন তার আরেক চাচা আব্বাস-এর দায়িত্বে। অভিভাবক মুহাম্মাদ ﷺ-কে আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) নির্দ্বিধায় ও সন্তুষ্টচিত্তে নবি হিসেবে মেনে নেন। ছোটদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

শুরুর দিকের আরেকজন মুসলিম যাইদ ইবনু হারিসা ইবনি শারাহীল (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মুক্ত করা একজন দাস। প্রাক-ইসলামী যুগে তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। হাকীম ইবনু হিযাম তাকে ক্রয় করে নিজ ফুপু খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে উপহার হিসেবে দেন। খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা) তাকে নবি ﷺ-এর খিদমাতে পেশ করেন। পরবর্তী সময়ে একসময় তাঁর আত্মীয়রা জানতে পেরে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছ থেকে তাঁকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিতে চায়। কিন্তু তিনি নিজেই নবিজিকে ছেড়ে যেতে অস্বীকৃতি জানান। কিছুকাল তিনি যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পালকপুত্রকে পালকপিতার নামে পরিচিত করানোর প্রথাকে হারাম ঘোষণা করে বিধান নাযিল হয়। ফলে তাঁকে তাঁর পূর্বোক্ত আসল নামেই ডাকা শুরু হয়। কিন্তু নবিজির প্রতি যাইদের ভালোবাসা ছিল অন্তরের গভীরে প্রোথিত, নামের পরিবর্তনে যার কোনোই হেরফের হয় না।

সূরা মুদ্দাসসির নাযিল হওয়ার দিনেই এই চার জন ইসলাম গ্রহণ করেন। যে ক্রমে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হলো, ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, তাঁদের ইসলাম গ্রহণের ক্রমও এটাই।

এরপর থেকেই বদলে যেতে থাকে তাঁদের জীবন। নিজে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর অন্যদেরও মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে উৎসাহিত করতে থাকেন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, দানশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য খ্যাত আবূ বকরের কথা আরবদের কাছে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কাউকে সত্য গ্রহণে আগ্রহী মনে হলে তিনি তার সাথে ইসলাম নিয়ে কথা বলতেন। নিয়ে যেতেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে। আবূ বকরের মাধ্যমে যারা মুসলিম হন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো, উসমান ইবনু আফফান উমাবি, যুবাইর ইবনুল আওয়াম আসাদি, আবদুর রহমান ইবনু আওফ যুহরি, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস যুহরি এবং তালহা ইবনু উবায়দিল্লাহ তাইমি (রদিয়াল্লাহু আনহুম)।

কুরাইশদের মধ্যে আরও অনেকে একে একে মুসলিম হন। এদের মাঝে রয়েছেন, আমীনুল উম্মাহ আবূ উবাইদা আমির ইবনুল জাররাহ, আবূ সালামা ইবনু আবদিল আসআদ ও তাঁর স্ত্রী উম্মু সালামা, আরকাম ইবনু আবী আরকাম, উসমান ইবনু মাযঊন, তাঁর ভাই কুদামা ইবনু মাযঊন ও আবদুল্লাহ ইবনু মাযঊন, উবাইদা ইবনুল হারিস ইবনিল মুত্তালিব, সাঈদ ইবনু যাইদ ও তাঁর স্ত্রী (উমরের বোন) ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব, খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত, জা'ফার ইবনু আবী তালিব, তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতু উমাইস, খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনিল আস, তাঁর স্ত্রী আমিনা বিনতু খালাফ,

তার ভাই আমর ইবনু সাঈদ ইবনিল আস, হাতিব ইবনুল হারিস, তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতুল মুজাল্লিল, হাতিবের দুই ভাই খাত্তাব ইবনুল হারিস ও মুআম্মার ইবনুল হারিস, খাত্তাবের স্ত্রী ফুকাইহা বিনতু ইয়াসার, মুত্তালিব ইবনু আযহার ও তাঁর স্ত্রী রামলা বিনতু আবী আওফ এবং নাঈম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি নাহাম। রদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

অন্যান্য গোত্র থেকে আগত ইসলাম গ্রহণকারীরা হলেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ হুযালি, মাসঊদ ইবনু রবীআ, আবদুল্লাহ ইবনু জাহশ ও তাঁর ভাই আবূ আহমাদ ইবনু জাহশ, সুহাইব ইবনু সিনান রূমি, আম্মার ইবনু ইয়াসির আনসি, পিতা ইয়াসির ও তাঁর মাতা সুমাইয়া এবং আমির ইবনু ফুহাইরা রদিয়াল্লাহু আনহুম।

ওপরে উল্লেখিত নারী সাহাবি ছাড়াও যারা প্রথম দিকে ঈমান এনেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন,

নবিজি ﷺ-এর পিতার আবিসিনিয়ান দাসী উম্মু আইমান, যার নাম বারাকাহ। শিশু মুহাম্মাদকে তিনি লালন-পালন করেছিলেন। যার আলোচনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও আছেন নবিজির চাচা আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফাদ্‌ল লুবাবাহ আল-কুবরা বিনতুল হারিস হিলায়্যা এবং আসমা বিনতু আবী বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহু আনহুন্না।[৪৩]

অনুসন্ধান ও তালাশের মাধ্যমে জানা যায়, যারা একদম শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের মোট সংখ্যা ১৩০। তবে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা করে ইসলাম গ্রহণের নির্দিষ্ট সময় নির্ণয় করাটা মুশকিল। তবে এই সংখ্যার মধ্যে নবি ﷺ প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করার পর ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবিগণও সম্ভবত অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

ঈমানদারদের ইবাদাত ও প্রশিক্ষণ

সূরা মুদ্দাসসিরের নির্দেশনাগুলো শুধু নবিজি ﷺ-এর জন্যই ছিল না; বরং সকল মুমিনের জন্য। এ আয়াতগুলোতে জীবনযাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূলনীতি দেওয়া হয়। এ নিয়মগুলো আজও সকল মুসলিমের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সূরা মুদ্দাসসির অবতীর্ণ হওয়ার পর ওহি ধারাবাহিকভাবে আসতে শুরু করে। এর পরই নাযিল হয় সূরা ফাতিহা। আল্লাহর স্তুতি বর্ণনা ও প্রার্থনা করার বেশ কিছু নিয়ম ও পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে এখানে। আরও জানা যায় দুনিয়া ও আখিরাতে সকল কাজের প্রতিদান পাওয়ার বিষয়টিও।

---

[৪৩] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/২৪৫-২৬২।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হওয়ার পর তার ওপর গড়ে তুলতে বলা হয় ইবাদাতের দালান। রিসালাত-প্রাপ্তির পর সর্বপ্রথম যে আমলের নির্দেশ আসে, তা হলো সালাত। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নবিজি ﷺ-কে ওজু করার এবং সালাত আদায়ের নিয়ম শেখান। তারপর সকালে ও সন্ধ্যায় দু-রাকাআত করে সালাত পড়ার আদেশ করেন।[৪৪]

ওজু যেহেতু সালাতের পূর্বশর্ত, তাই পবিত্রতা হয়ে যায় মুমিনের চিহ্ন। সূরা ফাতিহাকে সালাতের আসল এবং হাম্‌দ ও তাস্‌বীহকে সালাতের অন্যান্য যিক্‌র হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়। প্রতিটি নড়াচড়ার মাঝে থাকে আল্লাহ তাআলার মহিমা ও বড়ত্বের ঘোষণা। ঈমানের এই প্রধান অবলম্বনকে মুশরিকদের পূতিগন্ধ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত রাখতে মুমিনরা তখন সালাত আদায় করতেন গিরি-উপত্যকার মতো নির্জন স্থানে। কখনও গোপন কোনও ঘাঁটি নির্বাচন করতেন সালাত আদায়ের জন্য।[৪৫]

ইসলামের প্রাথমিক সময়টাতে সালাত ছাড়া অন্য কোনও ইবাদাত কিংবা আদেশ-নিষেধ ছিল না। এ সময়ে নাযিল হওয়া ওহির মূল বক্তব্য ছিল ঈমানের বিভিন্ন বিষয় এবং তাওহীদ। সাহাবিদের মাঝে এ-সকল আয়াত আত্মশুদ্ধি ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে। জান্নাত-জাহান্নামের স্পষ্ট বর্ণনাও দেওয়া হয়। জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, আখিরাতের চিরস্থায়িত্ব, চিরশান্তি ও চিরশাস্তির কথা বিধৃত হয় সুসংবাদ ও সতর্কবাণীর আকারে।

নবি ﷺ তাঁর প্রতি নাযিল হওয়া আয়াতগুলোর অর্থ অনুসারীদের শিখিয়ে দিতেন। আর এ নির্দেশনাগুলোর নিখুঁত বাস্তব রূপ দেখিয়ে দিতেন নিজে পালন করার মাধ্যমে। অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে তাঁদের নিয়ে চলেন ঈমানের আলোতে, দেখিয়ে দেন সরল পথ, আর খুব আন্তরিকভাবে নসীহত করেন আল্লাহর দ্বীনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে। আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে দূরে থাকতে। মুখ ফিরিয়ে নিতে।

তখনো নবিজি ﷺ প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া শুরু করেননি। কিন্তু কুরাইশরা তাঁর কর্মতৎপরতা আঁচ করতে পারে। কয়েকজন মুমিন প্রকাশ্যে তাঁদের নতুন দ্বীন পালন করতেন। কুরাইশরা তাদের বিদ্রূপ করতেন এবং বাধাও দিতেন, তবে তা ছিল একেবারে সামান্য। প্রথমদিকে তারা খুব একটা পাত্তা দেয়নি এই অল্প অল্প সামাজিক পরিবর্তনকে। রাসূল ﷺ-ও তখন তাদের বা তাদের উপাস্যদের কোনও বিরোধিতা করেননি এবং তাদের ব্যাপারে কোনও কথা বলেননি।

---

[৪৪] শাইখ আবদুল্লাহ, মুখতাসারুস-সীরাহ, ৮৮।
[৪৫] আবূ দাউদ, আল-মুসনাদ, ১৮৪; ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/২৪৭।

ইসলামের প্রকাশ্য প্রচারণা

আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

নববি মিশনের প্রথম তিন বছর ছিল ব্যক্তিপর্যায়-কেন্দ্রিক। কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষও ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন একেবারেই হাতেগোনা। এবার আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে আদেশ দিলেন—জ্ঞাতি-আত্মীয়দের মূর্তিপূজার ব্যাপারে সতর্ক করতে। দাওয়াত কবুলকারীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা এবং প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٦﴾

"আপনি নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক করুন এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন। যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে, তাহলে বলে দিন, তোমরা যা করো তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।"[৪৬]

এ আদেশ পাওয়ার পর নবি ﷺ তাঁর নিকটতম জ্ঞাতিবংশ বানূ হাশিমকে এক জায়গায় জড়ো করেন। বানুল মুত্তালিবের কিছু মানুষও তার মধ্যে ছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এর শুরুতেই ছিল আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, বড়ত্ব ও তাঁর একত্বের ঘোষণা। তারপর তিনি বলেন,

"আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া কোনও ইলাহ নেই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তাবাহক। বিশেষ করে আপনাদের প্রতি এবং সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির প্রতি আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

আল্লাহর শপথ! রাতে যেভাবে ঘুমান, ঠিক সেভাবেই একদিন আপনারা মারা যাবেন। আর সকালে যেভাবে জেগে ওঠেন, ঠিক সেভাবেই আপনাদের আবার পুনরুত্থিত করা হবে। তারপর আপনাদের সব কাজের হিসেব-নিকেশ হবে। ভালো কাজের ভালো প্রতিদান, মন্দ কাজের মন্দ প্রতিদান। তারপর চিরদিনের জন্য জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।"

বক্তব্য শুনে সবার অন্তর প্রশান্ত হলো। তারা পরস্পর আস্তে আস্তে নরম স্বরে কথা

---

[৪৬] সূরা শুআরা, ২৬ : ২১৪-২১৬।

বলছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁর চাচা আবূ লাহাব বলে উঠল, "আরে এ তো দেখছি সারা আরব জাহানকে ক্ষেপিয়ে তুলবে! কেউ থামাও ওকে! পরে একূল-ওকূল সবই হারাবে। ওদের হাতে একে তুলে দিলে সে তো অপমানিত হবেই। আর তাকে বাঁচাতে গেলে সবাই ওদের হাতে মারা পড়বে।"

কিন্তু নবিজির আরেক চাচা আবূ তালিব বলেছেন, "কী যা-তা বলছ? আল্লাহর কসম! বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমরা ওকে রক্ষা করে যাব।" তারপর ভাতিজার দিকে ফিরে বলেন, "তুমি তোমার কাজ করে যাও। আল্লাহর কসম! আমি সব সময় তোমার পাশে আছি। তবে আমার মন চায় না যে, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করি।"[৪৭]

সাফা পাহাড়ের চূড়ায়

ওই দিনগুলোতেই আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন,

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

> "আপনাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।"[৪৮]

এই হুকুম পাওয়ার পর প্রকাশ্য প্রচারকাজের অংশ হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দাঁড়ান। এটি কা'বার কাছেই অবস্থিত একটি ছোট পাথুরে পাহাড়। সবচেয়ে উঁচু পাথরে দাঁড়িয়ে উঁচু আওয়াজে বলেন, "ইয়া সাবাহা!"

সাধারণত কোনও আসন্ন বিপদের খবর জানান দিতে এমনটা করা হতো। যেমন, আশপাশ থেকে কোনও সৈন্যদলকে আক্রমণে আসতে দেখা গেলে কেউ একজন পাহাড়ে উঠে "ইয়া সাবাহা!" বলে এলাকাবাসীদের জানান দিত। নবিজি ﷺ-ও মক্কাবাসীদের কোনও এক মহাবিপদের সংবাদ দিতে চলেছেন। প্রতিটি পরিবারকে তিনি নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, "হে বানী ফিহর! হে বানী আদি! হে বানী অমুক! হে বানী আবদি মানাফ! হে বানী আবদিল মুত্তালিব... !"

ডাক শুনে একেকটি বংশ-পরিবারের লোকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল। যারা আসতে পারছিল না, তারা তাদের পক্ষ থেকে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিল।

সবাই জড়ো হলে নবি ﷺ বললেন, "যদি বলি এই উপত্যকার পেছন থেকে একদল

---

[৪৭] ইবনুল আসীর, আল-কামিল, ১/৫৮৪-৫৮৫।

[৪৮] সূরা হিজ্‌র, ১৫ : ৯৪।

সৈনিক ঘোড়া ছুটিয়ে আপনাদের আক্রমণ করতে আসছে, তাহলে কি আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন?"

প্রশ্ন শুনে একটু অবাক হলেও তারা জবাব দিল, "হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা তো আপনাকে কখনও মিথ্যা বলতে শুনিনি। সব সময় সত্যবাদী হিসেবেই পেয়েছি।"

"তাহলে শুনুন। এক মহাশাস্তি আসার পূর্বেই আমি আপনাদের সাবধান করতে এসেছি। আমার এবং আপনাদের মাঝে উপমা হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে শত্রুপক্ষকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি নিজ সম্প্রদায়কে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে দৌড় দিয়েছে। কিন্তু আশঙ্কা করছে যে, তার আগেই শত্রুরা পৌঁছে যাবে, ফলে সে চিৎকার করে বলতে লাগল, ইয়া সাবাহা! ইয়া সাবাহা!"

এই স্পষ্ট রূপক কথার পর নবি ﷺ তাদের "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর সাক্ষ্য (শাহাদাহ) দিতে বলেন। বুঝিয়ে বলেন যে, ইহকাল ও পরকালে এটিই মুক্তির একমাত্র পথ। এই বার্তা প্রত্যাখ্যান করে মূর্তিপূজা আঁকড়ে ধরে থাকলে যে আল্লাহ শাস্তি দেবেন, স্বয়ং নবিও যে তাদের বাঁচাতে পারবেন না, সবকিছু বিস্তারিতভাবে বলে দেন।

এরপর নাম ধরে ধরে প্রত্যেককে সতর্ক করে আহ্বান করেন,

"হে কুরাইশ, আল্লাহর কাছ থেকে মুক্তিপণ দিয়ে নিজেদের ছাড়িয়ে নিন। নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। আমি আপনাদের লাভ কিংবা ক্ষতি কিছুরই মালিক নই। আল্লাহর কাছ থেকে আপনাদের বাঁচাতেও পারব না।

হে কা'ব ইবনু লুয়াই পরিবার, জাহান্নাম থেকে নিজেদের বাঁচান! আমি আপনাদের লাভ কিংবা ক্ষতি কিছুরই করার অধিকার রাখি না।

হে বানী মুররা ইবনি কা'ব, নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচান।

হে বানী কুসাই সম্প্রদায়, নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচান। আমি আপনাদের লাভ কিংবা ক্ষতি কোনও কিছুরই মালিক নই।

হে বানী আবদি শামস্, নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচান।

হে বানী আবদি মানাফ, নিজেদের জাহান্নাম থেকে বাঁচান। আমি আপনাদের লাভ কিংবা ক্ষতি কিছুরই মালিক নই।

হে বানী হাশিম, জাহান্নাম থেকে বাঁচুন।

ওহে বানী আবদিল মুত্তালিব, নিজ দায়িত্বে জাহান্নাম থেকে বাঁচুন। আমি না আপনাদের কোনও লাভ-ক্ষতি করার কেউ, আর না আল্লাহর কাছ থেকে বাঁচানোর কেউ। আমার সম্পত্তি থেকে যা চান, নিয়ে যান। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি থেকে আপনাদের বাঁচানোর কোনও ক্ষমতা আমার নেই।

হে আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব, রাসূলের চাচা, আল্লাহর কাছ থেকে কিন্তু আপনাকে আমি বাঁচাতে পারব না।

হে সফিয়্যা বিনতু আবদিল মুত্তালিব, রাসূলের ফুপু, আল্লাহর কাছ থেকে আমি আপনাকে বাঁচাতে পারব না।

হে ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ, আমার সম্পত্তি যা চাও, নিয়ে নাও। তবু জাহান্নাম থেকে বাঁচো। আল্লাহর কাছ থেকে আমি তোমায় বাঁচাতে পারব না।

তবে হ্যাঁ, আপনাদের সবার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, অবশ্যই আমি এর হক যথাযথ আদায় করব।"

নবিজি ﷺ-এর এই সতর্কবাণী শোনা শেষে সবাই আস্তে আস্তে ফিরে চলল। সবাই এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। কেউ সমর্থন বা বিরোধিতা করেছে বলে জানা যায় না। তবে আবূ লাহাব জঘন্য আচরণ করে বলেছিল, "ধ্বংস হয়ে যাও তুমি! এসব বলার জন্যই কি তুমি আমাদের জমা করেছিলে?"

এর প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তাআলা একটি সূরা অবতীর্ণ করলেন,

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾

"আবূ লাহাবের দু-হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। তার ধন-সম্পদ এবং যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোনও কাজে আসেনি। অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে। এবং তার স্ত্রীও—যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে খর্জূরের রশি নিয়ে।"[৪৯]

আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ ধ্বংস হবে না; বরং ধ্বংস হবে আবূ লাহাব নিজে, তার স্ত্রী, তার ধন-সম্পদ সবই এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।[৫০]

[৪৯] সূরা লাহাব, ১১১ : ১-৫।

[৫০] বুখারি, ৪৭৭০; মুসলিম, ২০৮; ইবনু হিব্বান, ৬৫৫০; তিরমিযি, ৩১৮৪।

সাধারণ লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য শুনে পেরেশান হয়ে গেল। কী করবে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। কিন্তু ঘরে ফিরে নিজেরা আলাপ-আলোচনা করার পর অহংকার তাদের পেয়ে বসল, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সতর্কবার্তার প্রতি নাক সিটকান আরম্ভ করল। নবিজি ﷺ বড় কারও পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে ঠাট্টা করে বলত, "দেখো, একেই রাসূল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে!? আবূ কাবশার এই নাতির কাছে আসমান থেকে সম্বোধন করা হয়!"

আবূ কাবশা নবিজি ﷺ-এর মায়ের দিকের একজন পূর্বপুরুষ। কুরাইশদের পৌত্তলিক ধর্ম ছেড়ে তিনি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর দ্বীনের অনুসারী হয়েছিলেন। তাদের ধারণা অনুসারে সে পথভ্রষ্ট হয়েছিল। তাই মুহাম্মাদ ﷺ যখন তাদের থেকে আলাদা এক ধর্মের কথা প্রচার করলেন তখন তারা অবজ্ঞা ও অপমান করার উদ্দেশ্যে নবি ﷺ-কে আবূ কাবশার দিকে সম্পৃক্ত করে সম্বোধন করতেন। রাসূল ﷺ-কেও তার মতো পথভ্রষ্ট মনে করতেন।

স্বগোত্রীয়দের বিদ্রুপ ও শত্রুতা সত্ত্বেও নবি ﷺ তাঁর মিশনে অবিচল থাকেন। সভা-সমাবেশ, মাহফিল কিংবা মাজলিস সেখানে যাকে পেতেন ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে সেই একই বার্তা দিতেন, যুগে যুগে যা দিয়ে গেছেন আগেকার নবি-রাসূলগণ। তিনি বলতেন,

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

> "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনও মা'বূদ নেই।"[৫১]

এর সাথে সাথে নবি ﷺ সবার চোখের সামনেই প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত শুরু করে দেন। কা'বা প্রাঙ্গণে দিন-দুপুরে সালাত আদায়ও শুরু করেন। ধীরে ধীরে সফলতা পেতে থাকে তাঁর দাওয়াত। একের পর এক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। সেই সাথে মুমিন-কাফিরে বাড়তে থাকে ফাটল। তৈরি হয় বৈরিতা। এমনকি একই পরিবারের সদস্যদের মাঝেও শত্রুতা দানা বাঁধে। পরিবার, গোত্র, সংস্কৃতির মতো মহাপবিত্র বন্ধনের চেয়ে ইসলাম ধর্মকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার এই ক্ষমার অযোগ্য পাপ (!) ক্রমেই কুরাইশদের রাগ বাড়িয়ে দিতে থাকে।

---

[৫১] সূরা আ'রাফ, ০৭ : ৮৫।

হাজীদের ভুল বোঝাতে কুরাইশদের বৈঠক

মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে কুরাইশদের দুশ্চিন্তা। এদিকে হাজ্জ মৌসুমও এগিয়ে আসছে। ক'দিন পরই সারা আরব উপদ্বীপ থেকে দলে দলে লোক হাজির হবে মক্কায়। যদি মুসলিমরা তাদের পেয়ে বসে? যদি তাদের ইসলামের দাওয়াত দেয়? ধর্মীয় তীর্থস্থানে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের উত্থানের খবর যদি আরববাসীদের কানে যায়, কুরাইশদের মান-সম্মান কিছু থাকবে? তাই একটি প্রতিনিধিদল পরামর্শ চাইতে গেল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরার নিকট। সে ছিল তাদের সবচেয়ে প্রবীণ ও সম্মানিত ব্যক্তি।

সে বলল, "কুরাইশের লোকেরা, শুনুন! হাজ্জের দিনক্ষণ এগিয়ে আসছে। বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষজন তোমাদের এখানে আসবে। অনেকেই ইতিমধ্যে মুহাম্মাদের ব্যাপারে শুনেছে। তাই ওর ব্যাপারে আমরা অতিথিদের কাছে কী বলব, তা আগেই ঠিক করে নিন। নাহলে পরে একেকজনে একেক কথা বললে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।"

সবাই বলল, "তাহলে আপনিই কিছু একটা ঠিক করে দিন।"

"না, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু আপনারা পরামর্শ দিন, আগে সেগুলো শুনি।"

তারা বলল, "আচ্ছা! আমরা বলব, সে একজন গণক।"

ওয়ালীদ বলল, "না। সে তো গণক নয়। আমরা গণকদের দেখেছি। সে না ওদের মতো কথা বলে, না ওদের মতো ছন্দ বলে।"

তারা বলল, "উন্মাদ বললে কেমন হয়?"

ওয়ালীদ বলল, "না, তাও হবে না। পাগল-ছাগলের কাজকারবার তো আমরা জানিই। মুহাম্মাদের আচরণ, চাল-চলন কিংবা কথাবার্তা কিছুতেই পাগলামি নেই।"

তারা বলল, "তাহলে কবি বলে চালিয়ে দিই?"

ওয়ালীদ বলল, "কিন্তু সে তো কবিও না! কবিতার যত শত প্রকার রয়েছে তার সবই আপনারা খুব ভালো করেই জানেন। আর ওর কথাবার্তাও কোনও ধরনের কবিতার সাথে মেলে না। সুতরাং তাকে কবিও বলা যাবে না।"

কুরাইশরা বলল, "আচ্ছা, জাদুকর? জাদুকর তো বলা যায়, নাকি?"

ওয়ালীদ বলল, "সে জাদুকরও না। জাদু আর জাদুকরদের আমরা অনেক দেখেছি, তাদের খুঁটিনাটি সবই জানা। সে ওইসব তুকতাক-তন্ত্রমন্ত্র কিছুই করে না।"

“তাহলে বলবটা কী?” কুরাইশদের কণ্ঠে হতাশার সুর।

ওয়ালীদ কিছুক্ষণ ভাবল। ভেবে বলল, “আল্লাহর কসম! ওর কথাগুলো কিন্তু দারুণ সুন্দর, পরিষ্কার আর আকর্ষণীয়। যেন দৃঢ় শেকড় আর ফলবান শাখাওয়ালা গাছ! তাই যে অভিযোগই করুন না কেন, কিছুই ধোপে টিকবে না। তবে আমার মতে, যেটা বললে সবচেয়ে ভালো হয়, তা হলো জাদুকর। বলবে যে, ওর কথা শুনে পিতার সাথে পুত্রের, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের, স্বামীর সাথে স্ত্রীর বিভেদ তৈরি হয়। একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়। ওর ষড়যন্ত্রে আজ পরিবারগুলোতে ভাঙন ধরেছে।”

প্রোপাগান্ডার এই রূপরেখার ব্যাপারে একমত হয়ে কুরাইশরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল। হাজীদের আসার পথগুলোতে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিটা পথচারীকে নবি ﷺ-এর ব্যাপারে সতর্ক করতে লাগল। তাদের প্রোপাগান্ডা অব্যাহত রাখল। ফলে হিতে বিপরীত হলো। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে না দেখেই সবাই তাঁর ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করতে শুরু করে।[৫২]

অবশেষে চলে এল সেই কাঙ্ক্ষিত সময়। নবিজি ﷺ-ও প্রস্তুত হলেন হাজীদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে। তাদের তাঁবুতে গিয়ে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া আরম্ভ করলেন তিনি। সবাইকে বলতেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا

“হে লোকসকল, বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সফল হয়ে যাবে।”[৫৩]

আবূ লাহাব এ-সময় আরেকটা কাজ করত। মুহাম্মাদ ﷺ-এর পেছন পেছন হাঁটতে থাকত এবং তাঁর ব্যাপারে নানারকম কুকথা বলত। তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করত এবং নানা উপায়ে কষ্ট দিত, অত্যাচার করত।[৫৪]

ওই বছর হাজীরা ফিরে যাওয়ার পর দেখা গেল পুরো আরব ভূখণ্ডেই মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। তাঁর ব্যাপারে সবাই জেনে যাচ্ছে। তাঁর নিজের কর্মতৎপরতার ভূমিকা যেমন আছে, তেমনি তাঁর বিরোধীদের ভূমিকাও এতে কম নয়।

---

[৫২] বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ২/১৯৮; ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/২৭১।

[৫৩] ইবনু হিব্বান, ৬৫৬২, সহীহ।

[৫৪] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩/৪৯২; ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া, ৫/১৯৮।

দমন-ষড়যন্ত্রের নানান রূপ

হাজীগণ যখন নিজ নিজ বাড়িতে ফিরলেন, ততদিনে নতুন এই প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মটি নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা চলছে। দীর্ঘদিন পৌত্তলিকতায় ডুবে থাকার ফলে ইসলাম আরবদের কাছে আগাগোড়া এক নতুন ধর্ম হিসেবে প্রতীয়মান হয়, যেটাকে যত দ্রুত সম্ভব দমন করতে হবে। তারা স্বীকারই করতে চাইছিল না যে, এটি আসলে তাদের আদিপুরুষ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর চর্চিত বিশুদ্ধ একত্ববাদেরই পুনরুত্থান।

সামনা-সামনি হাসি-ঠাট্টা ও অপমান-অপদস্থ

রাগান্বিত মূর্তিপূজকেরা বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দিতে নানারকম ফন্দি করতে লাগল। তখনো তাদের ধারণা, এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলেই ইসলামের হুমকি নির্মূল হয়ে যাবে। দমে যাবে তাদের সকল চেষ্টা-তদবীর।

নবি ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে তাদের অন্যতম হাতিয়ার ছিল হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রুপ, নিন্দা, গালিগালাজ, অপমান আর প্রকাশ্যে উত্ত্যক্ত করা।

আল্লাহর রাসূলকে আরব মুশরিকরা নানাভাবে অপমান করতে থাকে, "আরে এ তো কবি, পাগল কোথাকার, গণক, শয়তান এসে ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে যায়...সে জাদুকর, মিথ্যুক।" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা পাড়তে থাকে।

মুহাম্মাদ ﷺ-কে সামনে পেলে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, "এই লোকটা আমাদের দেব-দেবীদের খাটো করে।" মুসলিমদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উসকানি দিত, "দেখো, দেখো! পৃথিবীর রাজা-বাদশারা যাচ্ছেন। আল্লাহ নাকি আমাদের ছেড়ে এদের ওপরেই অনুগ্রহ করেছেন।"

এটা একটা সূক্ষ্ম বিদ্রুপ। মুসলিম সংখ্যালঘুরা সামাজিকভাবে দুর্বল ছিলেন। ক্ষমতাধর সংখ্যাগুরুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ধৃষ্টতার কারণে মুশরিকরা এসব বলে ঠাট্টা করত। যেমন আল্লাহ তাআলা তাদের আচরণ সম্পর্কে বলেছেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوْا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوْا إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ لَضَالُّوْنَ ﴿٣٢﴾

"যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদের উপহাস করত। আর তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পর চোখ টিপে ইশারা করত। আর তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরত, তখনো হাসাহাসি করে ফিরত। যখন তারা বিশ্বাসীদের দেখত, তখন বলত, নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত।"[৫৫]

এসব মিথ্যে অভিযোগ ও বিদ্রুপ এমনকি মুহাম্মাদ ﷺ-কেও প্রচণ্ড আহত করে। আল্লাহ্ বলেন,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

"আমি জানি যে, তাদের কথা-বার্তায় আপনার অন্তর সংকুচিত হয়।"[৫৬]

নবিজিকে অটল রাখার এবং সেগুলোর প্রভাব দূর করার পন্থাও আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

"অতএব, আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস মহিমা বর্ণনা করুন। আর সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন। এবং আপনার রবের ইবাদাত করতে থাকুন, যে পর্যন্ত নিশ্চিত বস্তু (মৃত্যু) না আসে।"[৫৭]

এর পূর্বের আয়াতে নবিজি ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

"বিদ্রুপকারীদের জন্যে আমিই আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। তারা শীঘ্রই (এর পরিণাম) জানতে পারবে।"[৫৮]

রাসূল ﷺ-কে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের কাজ-কর্ম তাদের জন্যই বিপদের

[৫৫] সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ : ২৯-৩২।

[৫৬] সূরা হিজ্‌র, ১৫ : ৯৭।

[৫৭] সূরা হিজ্‌র, ১৫ : ৯৮।

[৫৮] সূরা হিজ্‌র, ১৫ : ৯৫-৯৬।

কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾

"নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদের ওই শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত।[৫৯]

মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাক্য শ্রবণ থেকে মানুষকে ফিরানো

পৌত্তলিকরা শুধু মুসলমানদের গালাগাল আর অপমান করেই ক্ষান্ত হয়নি। অন্যেরা যাতে নবিজি ﷺ-এর বার্তা শুনতে না পায়, সে চেষ্টাও করেছে। যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনও দলের কাছে দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করতেন, মুশরিকরা তার আগেই ওই সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করে দিত। তারা সেখানে হই-চই, শোরগোল, চিৎকার, চ্যাঁচামেচি করত। নুবুওয়াতের পঞ্চম বছরের রমাদান মাসে প্রথমবারের মতো জনসমাবেশে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ আসে। বিপুলসংখ্যক মানুষের সামনে তখন তিনি সূরা নাজম তিলাওয়াত করেছিলেন।

পরিস্থিতি এমন কঠিন ছিল যে, মুশরিকরা যখনই নবি ﷺ-কে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনত (বিশেষ করে শেষ-রাতের তাহাজ্জুদ সালাতে), তখনই তারা কুরআনের ব্যাপারে, এর নাযিলকারীর ব্যাপারে এবং এর বাহকের ব্যাপারে আজেবাজে কথা বলতে শুরু করত এবং অকথ্য ভাষায় গালি দিত। তাই আল্লাহ তাআলা নবিজি ﷺ-কে নির্দেশ দিলেন তিলাওয়াতের স্বর নিচু করতে,

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

"আপনি আপনার সালাতে স্বর উঁচু করবেন না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবেন না। এই দুয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন।"[৬০]

কুরআনে অতীতের অনেক ঘটনার বর্ণনাও রয়েছে। মূর্তিপূজকরা দেখল যে, এগুলো থেকে মানুষের মন সরানোর জন্য বিকল্প বিনোদনের ব্যবস্থা করা দরকার। তাই নাদর ইবনুল হারিস নামক এক লোক হিরা ও সিরিয়া গমন করল। সেখান থেকে শিখে

---

[৫৯] সূরা আনআম, ০৬ : ১০।

[৬০] সূরা ইসরা, ১৭ : ১১০।

এল দারা, আলেকজান্ডার, রোস্তম, পারসিয়ান রাজা ইস্ফান্দারসহ আরও অনেকের প্রাচীন-কাহিনি ও উপকথা। কোথাও নবি ﷺ দাওয়াত দিচ্ছেন, এমন খবর পেলেই ছুটে যেত ওই জায়গায়। লোকদের বলত, "আরে ওসব শুনে কী হবে? আমার কাছে এর চেয়ে মজাদার গল্প আছে।" তারপর ওইসব গল্প-কাহিনি বর্ণনা করে বলত, "এবার বলো, মুহাম্মাদের ওইসব কাহিনি কি আমার এগুলোর চেয়ে সুন্দর হতে পারে?"[৬১]

নাদর আরও এক ধাপ আগে বেড়ে গায়িকাও ভাড়া করে আনে। কেউ মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে জানতে পেলেই তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেত কোনও বাইজির কাছে। উদরপূর্তি আর মদ গলাধঃকরণের পাশাপাশি চলত গান-বাজনা। তারপর সেই হবু মুসলিমকে নাদর বলত, "দেখো, মুহাম্মাদ যার আহ্বান করছে তার চেয়ে আমাদের এগুলো বেশি উত্তম!"

আল্লাহ এই প্রসঙ্গে তখন এই আয়াত নাযিল করেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾

"কিছু মানুষ এমনও আছে, যারা আল্লাহর রাস্তা থেকে মানুষকে বিচ্যুত করতে নির্বোধের মতো অর্থহীন কথাবার্তা ক্রয় করে। আর তারা আল্লাহর বাণীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। নিশ্চয়ই তারা এক লাঞ্ছনাকর শাস্তি ভোগ করবে।"[৬২]

সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করা ও অপপ্রচার চালানো

কেবল বিদ্রূপ-বিনোদনে যখন ইসলাম নির্মূল হলো না, পৌত্তলিকরা তখন ধরল মিথ্যা প্রচারণার পথ। এ ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হলো।

প্রথম প্রথম তারা দাবি করত যে, মুহাম্মাদ ﷺ রাতের বেলা হিজিবিজি হাবিজাবি স্বপ্ন দেখে আর দিনের বেলায় ওগুলোকেই কুরআন নামে চালিয়ে দেয়। পরে একসময় বলতে লাগল, এই জিনিস তিনি নিজে নিজে রচনা করেন। আবার কখনও বলত, অন্য কেউ তাঁকে এসব শিখিয়ে-পড়িয়ে দেয়, আর তিনি সেসব মুখস্থ করে আওড়ান। কখনও-বা বলত, কুরআন হলো স্রেফ প্রাচীনকালের রূপকথা আর উপকথার সমষ্টি।

---

[৬১] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/২৯৯-৩০০।

[৬২] সূরা লুকমান, ৩১ : ৬।

যা সে লিখে রেখেছে। কখনও বলত, কোনও শয়তান জিনের আসা-যাওয়া আছে তার কাছে। গণকের মতো । এর জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন,

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿١٢٢﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾

"বাস্তবেই কাদের ওপর শয়তান অবতীর্ণ হয়, জানো কি? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক পাপাচারী মিথ্যুকের ওপর।"[৬৩]

মুহাম্মাদ ﷺ-কে স্নায়ুবিক বৈকল্যের রোগী বলেও দাবি করত মুশরিকরা। এভাবে অজ্ঞান হওয়া, ঘোরের মধ্যে চলে যাওয়া আর শরীর কাঁপুনি দেওয়ার সময়ই নাকি কুরআনের কথাগুলো তাঁর মাথায় আসে! আবার কখনও কখনও বলত, সে একটা কবি। এ দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ বলেন,

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٤٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٥٢٢﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٢٢﴾

"আর কবিদের অনুসরণ করে তো কেবল বিভ্রান্তরা। তুমি কি দেখো না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফেরে? এমন কাজ করার দাবি করে, যা তারা আদৌ করে না।"[৬৪]

এ আয়াতে কবিদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে:

১. এদের অনুসারীরা বিভ্রান্ত।

২. তাদের নির্দিষ্ট কোনও গন্তব্য নেই।

৩. তারা যা করে না তা-ই বলে বেড়ায়।

রাসূল ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে ঠিক এগুলোর বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ-এর অনুসারীরা যেমন নেককার ও সৎ, তেমনি তাঁর লক্ষ্যও সুনির্দিষ্ট। তিনি এক আল্লাহ, এক দ্বীন এবং এক পথের কথাই প্রচার করেন এবং সেদিকেই আহ্বান করেন। আর তিনি যা শিক্ষা দেন, বাস্তবে তা নিখুঁতভাবে পালন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

---

[৬৩] সূরা শুআরা, ২৬ : ২২১-২২২।

[৬৪] সূরা শুআরা, ২৬ : ২২৪-২২৬।

ইসলাম নিয়ে মুশরিকদের আপত্তি উত্থাপন

নবিজি ﷺ-এর শিক্ষার তিনটি বিষয় নিয়ে ছিল মুশরিকদের প্রধান আপত্তি। সত্যি বলতে এ তিনটি বিষয়ই তাদের ও মুসলিমদের মাঝে দ্বন্দ্বের মূল জায়গা। মৃত্যুর পর বিচারের জন্য পুনরুত্থান, মরণশীল মাটির এক মানুষের নবি হওয়া এবং আল্লাহর একত্ব। পৌত্তলিক মগজে এগুলো একদমই অবোধ্য ও অবাস্তব।

প্রথমে আসা যাক পুনরুত্থানের কথায়। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার বিষয়টি তাদের নিকট অতি আশ্চর্যের, যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাদের ভাষায়,

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾

"আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনো কি আমরা পুনরুত্থিত হব? আমাদের পিতৃপুরুষগণও কি?"[৬৫]

তাদের কথা—মাটির সাথে মিশে যাওয়া হাড়গোড় আবার জীবিত হয় কী করে? আমাদের মৃত পূর্বপুরুষেরা বুঝি আবার উঠে দাঁড়িয়ে চলতে-ফিরতে-বলতে শুরু করবে?

ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿٣﴾

"এ প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত।"[৬৬]

নিজেদের মাঝে কথাবার্তা বলার সময় তারা এ বিষয়টা নিয়ে হাসিঠাট্টা করত,

هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾
أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ

"আমরা কি তোমাদের এমন ব্যক্তির সন্ধান দেবো, যে তোমাদের খবর দেয় যে, তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃজিত হবে! সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ।"[৬৭]

কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজেই পুনরুত্থানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। মুশরিকরা দাবি করত পুনরুত্থান অযৌক্তিক। কিন্তু কুরআন মানুষের স্বাভাবিক

---

[৬৫] সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৬-১৭।

[৬৬] সূরা কাফ, ৫০ : ৩।

[৬৭] সূরা সাবা, ৩৪ : ৭-৮।

ন্যায়বোধকে নাড়া দিয়ে দেখায় যে, পুনরুত্থান ও শেষ বিচার হলো জীবনচক্রের এক অপরিহার্য ও স্বাভাবিক উপাদান।

কত পাপাচারী-অপরাধী আছে যারা তাদের কুকর্মের সামান্যতম প্রতিফল না পেয়েই মারা যায়। আবার কত নিরীহ-নিরপরাধ মানুষ তাদের জীবদ্দশায় তাদের ওপর হওয়া অত্যাচারের বিচার দেখে যেতে পারে না। আবার অনেক ভালো মানুষও মরে যায় তার সুকৃতির কোনও প্রতিদান না পেয়েই। মৃত্যুই যদি শেষ কথা হয়, তাহলে কেন মানুষ কষ্ট করে ভালো হওয়ার চেষ্টা করবে? ভালো কাজ করবে? একে-অপরকে লাথি-গুঁতো দিয়ে, অত্যাচার করে নিজে সর্বোচ্চ সুখ পাওয়াটাই তো তাহলে জীবনের সার্থকতা বলে প্রতীয়মান হবে! কিন্তু আমাদের ন্যায়বোধ বলে—না। এমনটা হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা অবিবেচকের মতো এমন অসম করে আপন সৃষ্টিকুল সাজাতে পারেন না। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি পূর্ণ ন্যায়বিচারক। আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন,

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٦٣﴾

"বিশ্বাসী আর পাপাচারীদের সাথে কি আমি একই আচরণ করব? কী হলো তোমাদের? কী করে তোমরা এমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?"[৬৮]

অন্যত্র বলেছেন,

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿١٢﴾

"দুষ্কর্ম উপার্জনকারীরা কি ভেবেছে যে, তাদের আমি ইহকাল ও পরকালে সৎকর্মশীল বিশ্বাসীদের সমান বানিয়ে দেবো? কত নিকৃষ্ট তাদের বিচারবোধ!"[৬৯]

এই তো গেল ন্যায়বোধের কথা। এখন মৃত মানুষের জীবিত হওয়ার ধারণাটা কি যৌক্তিক? এটা কি অসম্ভব কিছু? আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٧٢﴾

"কোনটি সৃষ্টি করা বেশি কঠিন? তোমাদের, না তোমাদের মাথার ওপর

---

[৬৮] সূরা কলাম, ৬৮ : ৩৫-৩৬।

[৬৯] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২১।

স্থাপিত ঊর্ধ্বাকাশ? তিনি তো তা সৃষ্টি করেছেন।”[৭০]

অন্যত্র বলেছেন,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾

“তারা কি বোঝে না, যে আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোনও ক্লান্তিবোধ করেননি তিনি মৃতকেও পুনর্জীবিত করতে সক্ষম? অবশ্যই, কেন নয়? নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতাধর।”[৭১]

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

“তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হয়েছ, তবুও তোমরা অনুধাবন করো না কেন?[৭২]

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

“যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছি, ঠিক সেভাবে এর পুনরাবৃত্তি করব। এ আমার প্রতিশ্রুতি এবং আমি তা পূর্ণ করেই ছাড়ব।”[৭৩]

আবার কেউ কেউ বলতেন যে, মানলাম যে, আল্লাহ সারা জাহানের স্রষ্টা। কিন্তু একটা জিনিস পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আবার তা তৈরি করাটা তো অসম্ভব। আল্লাহ তাদের ভুল সংশোধন করে দিলেন, শূন্য থেকে কোনোকিছু প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত জিনিস পুনর্নির্মাণ করা অতি সহজ।

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

“আমি তো একবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়িনি! তারাই বরং নতুন করে সৃষ্টি করার বিষয়টি নিয়ে ধাঁধায় পড়ে আছে।”[৭৪]

---

[৭০] সূরা নাযিআত, ৭৯ : ২৭।

[৭১] সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৩।

[৭২] সূরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৬২।

[৭৩] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ১০৪।

[৭৪] সূরা কাফ, ৫০ : ১৫।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় বিষয়ে। মুহাম্মাদ ﷺ-কে একজন সত্যবাদী মানুষ হিসেবে মানতে কুরাইশদের আপত্তি নেই। কিন্তু রক্ত-গোশতের তৈরি একজন মানুষকে আল্লাহর নবি ও রাসূল হওয়ার মতো ভারী কাজ দেওয়া হতে পারে, এটি তাদের অকল্পনীয়। তারা বিষয়টি মানতে পারেনি। মুহাম্মাদ ﷺ নুবুওয়াত ও রিসালাত দাবি করার পর কুরাইশরা জবাব দেয়,

مَالِ هَـٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْأَسْوَاقِ

"এ আবার কেমন ঐশী-দূত, যে খাবারও খায় আবার বাজারেও যায়?"[৭৫]

তাদের সংশয়ের উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

بَلْ عَجِبُوْا أَنْ جَاءَهُم مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هَـٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٢﴾

"তারা তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হয়েছেন বলে বিস্ময়বোধ করে, অতঃপর কাফিররা বলে, এটা অতি আশ্চর্যের ব্যাপার।"[৭৬]

তারা এ-ও বলে,

مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ

"আল্লাহ কোনও মানুষের প্রতি কোনও কিছু অবতীর্ণ করেননি।"[৭৭]

আল্লাহর পক্ষ থেকে মরণশীল কোনও মানুষ ঐশীবাণী পেতে পারে, এটা তাদের মনঃপূত নয়। তাদের এই ধ্যানধারণা খণ্ডন করে আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ مُوْسَىٰ نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ

"তাদের জিজ্ঞেস করুন, 'তাহলে ওই গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল? যা এক আলোকবর্তিকা এবং মানুষের জন্য পথনির্দেশ?"[৭৮]

কুরআনে বহু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে রক্ত-মাংসের মানুষকে তাঁর জাতি নবি বলে মানতে চায়নি। তাদের বক্তব্য ছিল,

---

[৭৫] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭।
[৭৬] সূরা কাফ, ৫০ : ২।
[৭৭] সূরা আনআম, ৬ : ৯১।
[৭৮] সূরা আনআম, ৬ : ৯১।

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا

"তুমি তো কেবল আমাদের মতোই মানুষ।"[৭৯]

নবিগণ জবাবে বলেছেন,

إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَـٰكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

"হ্যাঁ, আমরাও তোমাদের মতো মানুষ বটে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান, তাকে অনুগ্রহ দান করেন।"[৮০]

মূল কথা হলো, প্রত্যেক নবি-রাসূলই মানুষ ছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ-ও এর ব্যতিক্রম নন। আর অতিপ্রাকৃতিক ফেরেশতারা যদি নবি-রাসূল হয়ে আসতেন, তাহলে রক্ত-গোশতে গঠিত এসব মানুষ তাঁদের অনুসরণ করতে পারত না। শুধু বার্তা পৌঁছে দিয়ে ক্ষান্ত হওয়াই তো নবি-রাসূলের কাজ নয়; বরং আসমানি বার্তাকে জমীনে কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে, সেটা দেখিয়ে দেওয়াও তাঁদের কর্তব্য। মানুষের চেয়ে ভালোভাবে সেটা আর কে পারবে? ফেরেশতা পাঠানো হলে মুশরিকরা আবার এই আপত্তি করত, "এসব অতিপ্রাকৃতিক সত্তা যা পারে, আমরা কীভাবে তা পারব?" প্রজ্ঞাপূর্ণ এই বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এই আয়াতে,

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾

"যদি আমি কোনও ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে তাকেও তো আমি মানবাকৃতিতেই পাঠাতাম। এতেও তারা ওই সন্দেহই করত, যা এখন করছে।"[৮১]

আরব পৌত্তলিকরা যেহেতু ইবরাহীম, ইসমাঈল, মূসা (আলাইহিমুস সালাম)-কে নবি বলেও স্বীকার করত আবার তাদের মানুষ বলেও মানত, তাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ আর ধোপে টিকল না। ফলে তারা আরেকটি নতুন আপত্তি পেশ করল, 'আল্লাহ কি নবি বানানোর জন্য একসময়ের ইয়াতীম অসহায় এই গরিব ব্যক্তিটাকেই পেল? এটা কী করে সম্ভব যে, কুরাইশ কিংবা সাকীফ গোত্রের বড় বড় নেতাদের ছেড়ে এক মিসকীনকে আল্লাহ নিজের নবি হিসেবে নির্বাচন করল!'

---

[৭৯] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১০।

[৮০] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১১।

[৮১] সূরা আনআম, ৬ : ৯।

لَوْلَا نُزِّلَ هَـٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾

"দুই এলাকার (মক্কা ও তায়িফ) কোনও প্রভাবশালী গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে কেন কুরআন অবতীর্ণ হলো না?"[৮২]

একদম অল্প কথায় আল্লাহ এর যথাযথ জবাব দিয়ে দেন,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

"আপনার রবের রহমত কি ওরা বণ্টন করে দেবে নাকি?"[৮৩]

কুরআন, নুবুওয়াত, ওহি সবকিছুই আল্লাহর রহমতের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো কাকে দেওয়া হবে, তা তিনিই নির্ধারণ করবেন। এর অধিকার কেবল তাঁরই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

"কাকে বার্তাবহনের দায়িত্ব দিতে হবে, তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন।"[৮৪]

আবারও মোক্ষম জবাব পেয়ে মুশরিকরা এবার ভিন্ন আরেকটি রাস্তা ধরল। আপত্তি তুলল যে, রাজা-বাদশারা কত জাঁকজমক আর ধনসম্পদে বেষ্টিত থাকে। নির্দিষ্ট কিছু লোক ছাড়া তাদের ধারেকাছেও কেউ ভিড়তে পারে না। তুখোড় সব উপদেষ্টা, শত-শত দাস, দেহরক্ষী, আর সুন্দরী রমণী থাকে তাদের। তাহলে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদকে কেন কাজ করতে হয়, বাজারে গিয়ে নিজের খাবার উপার্জন ও ক্রয় করতে হয়? তারা বলে,

لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٨﴾

"তাঁর কাছে কেন কোনও ফেরেশতা নাযিল করা হলো না যে তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত? অথবা তিনি ধন-ভান্ডার প্রাপ্ত হলেন না কেন, কিংবা তাঁর একটি বাগান হলো না কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন?

[৮২] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩১।
[৮৩] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩২।
[৮৪] সূরা আনআম, ৬ : ১২৪।

জালিমরা বলে, তোমরা তো একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ।"[৮৫]

মুশরিকদের বিবেচনাবোধ বলে যে, দেবদূত তো রাজদূতের মতোই হওয়ার কথা। অথচ এই লোকের প্রাসাদ কোথায়? সম্পদ কই? কোথায় তার রাজকীয় পাইক-পেয়াদা? একটা ফেরেশতাও তো তার পাশে কখনও দেখা যায় না! তার সাথে তো হত-দরিদ্র দুর্বল শ্রেণির লোকজনকেই বেশি দেখা যায়!

এসব কিছুর জবাব ছোট্ট একটি বাক্যেই নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে—মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল, দাস-স্বাধীন সবার কাছেই তিনি আল্লাহর বার্তা পৌঁছাতে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি যদি রাজা-বাদশার মতো শান-শওকত নিয়ে চলাফেরা করতেন, তাহলে বেশির ভাগ মানুষই দূরে সরে যেত। তাই সাদাসিধে থাকাটাই তাঁর মিশনের দাবি। তাহলেই মানুষ বুঝবে যে ইসলাম কোনও সম্রাট, ধর্মতত্ত্ববিদ বা দার্শনিকের অবসরের বিনোদন নয়; বরং প্রাত্যহিক মানবজীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কিন্তু স্বগোত্রীয় একজন মানুষের বিরুদ্ধে কুরাইশদের এমন উঠেপড়ে লাগাটা আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত। মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াতে কী এমন ছিল, যা মূর্তিপূজারিদের কাছে এত আপত্তিকর ঠেকল? সত্যিকারার্থে নবিজি ﷺ ও মুশরিকের মাঝে দ্বন্দ্বের আসল জায়গাটা ছিল তাওহীদ—একত্ববাদ ও বহুত্ববাদের দ্বৈরথ।

পৌত্তলিকরা তাওহীদের কিছু বিষয় মানত বটে। যেমন: আল্লাহ তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মে একক ও অদ্বিতীয়, এটা মানতে তাদের আপত্তি নেই। তা ছাড়া আল্লাহই যে বিশ্বজাহানের একমাত্র স্রষ্টা, সকল জীবের প্রতিপালক ও আহারদাতা, জীবন-মৃত্যু দেওয়ার মালিক, কারও কাছে জবাবদিহি ছাড়া একক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম—এগুলোও স্বীকার করত তারা।

তবে সাথে সাথে এটাও বিশ্বাস করত যে, কিছু কিছু সত্তা আল্লাহর দেওয়া বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং বিশেষ বান্দা। যেমন: আম্বিয়ায়ে কেরাম, আল্লাহর আউলিয়াগণ, নেককার বুযুর্গ এবং তাদের বানানো আরও দেব-দেবীরা। মুশরিকদের মতে, এরা আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতায় অলৌকিক কর্মকাণ্ড করতেও সক্ষম, যেমন: অসুস্থকে সুস্থ করা, বন্ধ্যা নারীকে গর্ভধারণ করানো, প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়া ইত্যাদি। এদের তারা মনে করত আল্লাহ ও মানুষের মাঝে মাধ্যম, তাদের

[৮৫] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭-৮।

কাছে প্রার্থনা করা হলে তারা সেটা আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে।

ফলে পৌত্তলিকরা এ-সকল উচ্চপদস্থ সত্তাকে খুশি করার সর্বাত্মক চেষ্টা করত। তাদের ধারণা, এ-সকল পুণ্যাত্মাদের সন্তুষ্ট করলে আল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন। সন্তুষ্ট করার পদ্ধতিগুলোও বেশ বাহারি। তাদের কবরের ওপর নির্মাণ করা হতো সৌধ। তীর্থযাত্রীরা এসে এ-সকল সৌধকে ঘিরে নানারকম আচার-অনুষ্ঠান করে ওই ব্যক্তিবর্গদের খুশি করতে চাইত। এমনকি এদের উদ্দেশ্য করে শস্য, পণ্য, সোনাদানা ও পশুবলিও করা হতো দেদারসে। এ-সকল অর্ঘ্য প্রথমে পেশ করা হতো সেখানকার সেবক-পুরোহিতদের হাতে। তারা সেগুলো নিয়ে রাখত সৌধ বা দেব-দেবীর মূর্তির সামনে। সাধারণত এদের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর ইবাদাত তারা করত না।[৮৬]

তবে পশুবলির ধরন ছিল নানারকম। কখনও সেসব বুযুর্গদের নামে একটি পশুকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হতো। অবাধে ঘুরে বেড়ানো এসব পশু সামনে পড়লে প্রচণ্ড ভক্তি দেখাত ভক্তরা। কখনও তাদের কবরের সামনে নিয়ে গিয়ে ওই ব্যক্তির নামে যবাই করা হতো প্রাণীটি।[৮৭]

আবার বছরে একবার-দুবার এসব তীর্থস্থান ঘিরে মেলাও বসত। উপরোল্লেখিত আচার-অনুষ্ঠানগুলোই করা হতো এখানে। সাধারণত ওখানকার কারও মৃত্যুবার্ষিকীকে ঘিরে আয়োজিত হতো এসব মেলা। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসত ভক্তি নিবেদন করতে। এসব আচার-প্রথার উদ্দেশ্য ছিল মৃত নেককারদের সন্তুষ্টি লাভ, যাতে তারা আল্লাহর কাছে ভক্তদের নামে সুপারিশ করেন।

কিছু সাধুকে উদ্দেশ্য করে পৌত্তলিকরা বলত, "বাবা, আমার প্রার্থনা গ্রহণ করুন, এই এই বিপদাপদ সরিয়ে দিন।" তাদের মতে, আল্লাহ এ-সকল মৃত ব্যক্তিকে তাদের প্রার্থনা শোনার ক্ষমতা তো দিয়েছেনই, এমনকি সেগুলোর জবাব দেওয়া বা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতাও দিয়েছেন।[৮৮]

এই ছিল মুশরিকদের শির্ক এবং গাইরুল্লাহর জন্য তাদের ইবাদাত। আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্যান্য উপাস্য। এদেরই তারা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করত। তাদেরই মূর্তি বানিয়ে পূজা করত তাদের সন্তুষ্টির আশায়।

---

[৮৬] সূরা আনআমের ১৩৬ নং এবং এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

[৮৭] দ্রষ্টব্য—সূরা মাইদা, ৫ : ৩, ১৩০; সূরা আনআম, ৬ : ১২১, ১৩৮; বুখারি, ৪৬২৩; ইবনু হিশাম, ১/৮৯-৯০।

[৮৮] সূরা ইউনুসের ১৮ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

নবিজি ﷺ যখন তাওহীদ ও একত্ববাদ এর আহ্বান নিয়ে তাদের নিকট আসলেন এবং আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত উপাস্যকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানালেন তখন তাদের কাছে তা অতি কষ্টকর ও বেশ ভারী মনে হলো। তারা একে পথভ্রষ্টতা এবং ষড়যন্ত্র বলে বিবেচনা করল। তারা বলল,

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَـٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَـٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾

"সে কি সব উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করেছে? নিশ্চয় এ বড় বিস্ময়কর বিষয়! তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এ কথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাকো। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। এক উপাস্যওয়ালা কোনও ধর্মের কথা তো আমরা শুনিনি! নিশ্চয়ই এটা কোনও নতুন উদ্ভাবন।"[৮৯]

কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে এসব মুশরিকের সাথে বিতর্ক করেছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তাদের জিজ্ঞেস করেছেন যে, কাউকে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ভাবার জন্য তাদের মানদণ্ডটা কী। কীভাবে তারা নিশ্চিত হতো যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহর বিশেষ বান্দা। এটা নির্ধারণ করার উপায় স্রেফ দুটি— নিজেরাই অদৃশ্যের জ্ঞান লাভ করা, অথবা আসমানি কিতাব থেকে জেনে নেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٧٤﴾

"তাদের কাছে কি অদৃশ্যের খবর আছে? ফলে তারা তা টুকে রাখে?"[৯০]

ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَـٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾

"তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এটির আগে অবতীর্ণ হওয়া কোনও কিতাব নিয়ে আসো, অথবা তোমাদের দাবির স্বপক্ষে পরম্পরাগত কোনও জ্ঞান থাকলে তা পেশ করো।"[৯১]

---

[৮৯] সূরা সাদ, ৩৮ : ৫-৭।

[৯০] সূরা কলাম, ৬৮ : ৪৭।

[৯১] সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৪।

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿١٤٨﴾

"আপনি বলুন, তোমাদের কাছে কি কোনও প্রমাণ আছে যা আমাদের দেখাতে পারো। তোমরা শুধু আন্দাজের অনুসরণ করো এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বলো।"[১২]

মুশরিকরা স্বীকার করত যে, তাদের কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান নেই। আসমানি কোনও কিতাবও নেই তাদের কাছে। বাপ-দাদার সময় থেকে চলে আসা ঐতিহ্য-সংস্কৃতিই তাদের আসল সম্বল। ফলে তারা বলতে লাগল,

بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

"বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যে বিষয়ের ওপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করি।"[১৩]

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

"আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি।"[১৪]

মূর্তিপূজারিদের অজ্ঞতা ও অসহায়ত্ব এখান থেকেই প্রকাশ পায়। কুরআনে আল্লাহ তা একদম স্পষ্ট করে দিয়েছেন,

إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।"[১৫]

তাদের নেককার ও নৈকট্যপ্রাপ্ত পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে আল্লাহ স্পষ্টত বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

---

[১২] সূরা আনআম, ৬ : ১৪৮।
[১৩] সূরা লুকমান, ৩১ : ২১।
[১৪] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ২৩।
[১৫] সূরা নাহল, ১৬ : ৭৪।

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো, তারা সবাই তোমাদের মতোই বান্দা।"[১৬]

অর্থাৎ যে বিষয়গুলো আল্লাহ্ তাআলার সাথে বিশেষায়িত সেগুলোর ওপর তোমাদের যেমন কোনও ক্ষমতা নেই ঠিক তেমনি তোমাদের উপাস্যদেরও কোনও ক্ষমতা নেই। সুতরাং তোমরা এবং তারা অসহায়ত্ব ও ক্ষমতাহীনতার দিক দিয়ে সমান সমান। এ জন্যই আল্লাহ্ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন,

فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴿١٩٤﴾

"তোমরা তাদের ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে তারা যেন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়।"[১৭]

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿١٣﴾

"আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ডাকো, তারা তুচ্ছ একটি খেজুর আঁটিরও মালিক নয়।"[১৮]

إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿١٤﴾

"তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামাতের দিন তারা তোমাদের শির্‌ক অস্বীকার করবে। পূর্ণ অবগত সত্তার (আল্লাহ) ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।"[১৯]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জ্ঞান পরিপূর্ণ এবং সবকিছুর খবর তিনি রাখেন। সুতরাং তিনি যা বলবেন তা-ই সঠিক হবে আর অন্যরা যা বলবে তা হবে মিথ্যা ও বানোয়াট। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ

---

[১৬] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৯৪।
[১৭] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৯৪।
[১৮] সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৩।
[১৯] সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৪।

أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾

"আল্লাহকে ছাড়া আরও যাদের কাছে তারা প্রার্থনা করে, তারা একটা জিনিসও সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা নিজেরাই সৃজিত। তারা মৃত, নির্জীব। কখন তাদের পুনরুত্থিত করা হবে, সেটাই তো তারা জানে না।"[১০০]

أَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٢﴾

"তারা কি আল্লাহর সাথে এমন অংশীদার নির্ধারণ করে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং উল্টো তারা নিজেরাই সৃষ্ট? এসব প্রার্থিতরা না তাদের প্রার্থীদের সাহায্য করতে পারে, না নিজেদের।"[১০১]

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوْرًا ﴿٣﴾

"তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজের ভালোও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক না।"[১০২]

আল্লাহ তাআলা তাদের উপাস্যদের অবস্থা একটি উপমার মাধ্যমে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন,

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ ﴿١٤﴾

"আর তাঁকে ছাড়া তারা যাদের ডাকে, তারা তাদের কোনও কাজে আসে না, ওদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ দু-হাত পানির দিকে প্রসারিত করে, যাতে পানি তার মুখে পৌঁছে যায়। অথচ পানি কোনও সময়ই তার মুখে পৌঁছাবে না। কাফিরদের যত আহ্বান তা সবই ভ্রষ্টতায় নিপতিত।"[১০৩]

---

[১০০] সূরা নাহল, ১৬ : ২০-২১।

[১০১] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৯১-১৯২।

[১০২] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৩।

[১০৩] সূরা রা'দ, ১৩ : ১৪।

মুশরিকদের বলা হলো, তোমরা কীভাবে আল্লাহ্ তাআলার সাথে—যিনি সর্বশক্তিমান এবং সবকিছুর স্রষ্টা—অন্যান্য উপাস্যদের শরীক করো। যাদের কোনও ক্ষমতা নেই, যাদের নিজেদেরই সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ আর তারা কি সমান হতে পারে?

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٧١﴾

"যিনি সৃষ্টি করে, তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি এতটুকুও বুঝবে না।"[১০৪]

যখন তাদের সামনে এই প্রশ্ন রাখা হলো তারা হতভম্ব হয়ে গেল। নির্বাক হয়ে হতাশ চেয়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় ছিল না। তাদের হুজ্জতবাজি খতম হতে দেখে তারা নতুন কৌশল আবিষ্কার করে বলতে শুরু করল, 'দেখো, আমাদের বাপ-দাদারা সমস্ত মানুষ থেকে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ছিলেন। তাদের অনন্য বুদ্ধিমত্তার বিষয়টি সবার মাঝে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। দূর-দূরান্তের মানুষও বিষয়টি অকুণ্ঠচিত্তে মান্য করত। ওই সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিদের দ্বীন-ধর্ম-ইবাদাতই ছিল এ-রকম। সুতরাং তা বাতিল ও গোমরাহ হওয়া অসম্ভব। স্বয়ং মুহাম্মাদের বাপ-দাদারাও এই একই ধর্মের ওপর অতিবাহিত হয়েছেন।

এর প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ

"তারা বলে, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যাতে পেয়েছি সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না, জানত না সরল পথটাও।"[১০৫]

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّيْنَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

"তারা তাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছিল বিপথগামী। অতঃপর তারা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে ছিল তৎপর।"[১০৬]

আবার বাপ-দাদা ও দেব-দেবীদের অপমান ও বিরোধিতা করার ফলে মুহাম্মাদ ﷺ ও

---

[১০৪] সূরা নাহল, ১৬ : ১৭।

[১০৫] সূরা বাকারা, ২ : ১৭০।

[১০৬] সূরা সফফাত, ৩৭ : ৬৯-৭০।

মুসলিমরা অভিশপ্ত হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলে মুশরিকরা।

إِنْ نَّقُوْلُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْءٍ

"আমরা এ কথাই বলি যে, তোমার ওপর আমাদের কোনও উপাস্যের অশুভ ছায়া পড়েছে।"[১০৭]

এসব দুর্বল হুমকির জবাবে আল্লাহ তাদের মনে করিয়ে দেন সেসব দেব-দেবীর চূড়ান্ত অক্ষমতার কথা। নিশ্চল, নির্বাক, প্রতিরোধহীন এসব প্রতিমা কী করে মুসলিমদের ক্ষতি করবে?

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا قُلِ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنظِرُوْنِ ﴿١٩٥﴾

"তাদের কি পা আছে যে, হাঁটবে? হাত আছে যে, ধরবে? চোখ আছে যে, দেখবে? না কি কান আছে যে, শুনবে? বলে দাও, যাদের তোমরা আল্লাহর শরীক বলে দাবি করো, তাদের ডাকো অতঃপর আমার অমঙ্গল করো এবং আমাকে কোনও অবকাশই দিয়ো না।"[১০৮]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿٧٣﴾

"হে লোকসকল, একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করো, তারা কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্র হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনও কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধারও করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী এবং যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন দুর্বল।"[১০৯]

নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি মুশরিকদের করা অপমান শুনতে শুনতে কোনও কোনও

---

[১০৭] সূরা হূদ, ১১ : ৫৪।

[১০৮] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৯৫।

[১০৯] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৩।

মুসলিম ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে যেতেন। রাগের মাথায় মুশরিকদের বলে বসতেন, "তোদের দেবতাদের মাথায় শিয়ালে প্রস্রাব করে গেলেও তো তারা কিছু বলতে পারে না। যার মাথায় শিয়াল প্রস্রাব করে সে কতই-না অপদস্থ ও লাঞ্ছিত।"

মুশরিকরা এতে রাগে অন্ধ হয়ে মুসলিমদের ও আল্লাহর নামে গালিগালাজের ঝড় বইয়ে দিত। গভীর এক আধ্যাত্মিক দ্বৈরথ যেন নিছক গলাবাজিতে পর্যবসিত না হয়, তাই আল্লাহ সাথে সাথে নির্দেশ দেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

> "আল্লাহকে ছাড়া তারা যেসবকে ডাকে, সেগুলোকে গালমন্দ কোরো না। তাহলে তারাও ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে।"[১১০]

তো দেখা যাচ্ছে যে, মুশরিকদের উত্থাপিত প্রতিটি আপত্তির জবাব আল্লাহ তাআলা নিজেই দিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহর নবি ﷺ সব বিদ্রুপ ও গালিগালাজ উপেক্ষা করে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বাকযুদ্ধে হেরে পৌত্তলিকরা সিদ্ধান্ত নিল বলপ্রয়োগে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার। গোত্রপতিরা নিজ নিজ গোত্রের মুসলিমদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করল। আবূ তালিবের কাছে একসময় একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে দাবি করল যে, তিনি যেন মুহাম্মাদকে তার দাওয়াতি প্রচারণা বন্ধ করতে বলেন।

মুসলমানদের ওপর অত্যাচার

ইসলামের শুরুর যুগের এ সময়টা ছিল বড়ই কঠিন ও কণ্টকাকীর্ণ। কুরাইশদের হাতে মুসলিমদের নির্যাতিত ও নিহত হওয়ার বেশকিছু লোমহর্ষক ও হৃদয়-বিদারক ঘটনা ঘটে। প্রথম দিককার মুসলিমদের সামষ্টিক স্মৃতি থেকে এমন বহু ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে। ইসলামের নবির জীবনেতিহাসে এগুলোও প্রাসঙ্গিক। ঈমানের তরে জান-কুরবান কিছু সাহাবির জীবন-মরণের ঘটনা তাই এখানে উল্লেখিত হওয়ার দাবি রাখে।

নির্যাতন-নিপীড়নের কিছু নমুনা

- বিলাল ইবনু রবাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন উমাইয়া ইবনু খালাফের দাস। দাসের এমন আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা উমাইয়ার সহ্য হয়নি। সে তাঁর গলায় রশি বেঁধে রাস্তার কিছু বখাটে ও ছোট ছোট বালকদের হাতে তুলে দিত। তারা তাঁকে ছেঁচড়ে

---

[১১০] সূরা আনআম, ৬ : ১০৮।

টেনে নিয়ে যেত আর বিলালের মুখে অনবরত ধ্বনিত হতো, "আহাদ! আহাদ!" এ ছাড়াও তাঁকে দুপুরের তপ্ত মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে চিত করে ফেলে বুকে পাথর চাপিয়ে দিত উমাইয়া। তারপর বলত, "হয় এখানে পড়ে থেকেই মরবি, আর নয়তো মুহাম্মাদকে অস্বীকার করে লাত ও উযযার আরাধনা করবি।" সবকিছু সয়ে নিয়ে বিলাল ঘোষণা করে চলতেন, "আহাদ! আহাদ!"

যাতনার সমাপ্তি হয় আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাত ধরে। এক দিন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) হাঁটছিলেন। বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে তখনো শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। তিনি এই নির্মম নির্যাতন দেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তাঁকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন।[১১১]

❖ আমির ইবনু ফুহাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এমনই আরেক নিপীড়িত অগ্র-মুসলিম। তাঁকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলা হতো। এত অধিক অত্যাচার করা হতো যে, তিনি কী বলছেন বা না বলছেন, বুঝতে পারতেন না।[১১২]

❖ আফলাহ্ (রদিয়াল্লাহু আনহু)। যার আরেক নাম ছিল আবূ ফুকাইহা। তিনি বানূ আবদিদ দারের দাস ছিলেন। তাঁকে শেকলে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হতো এবং উত্তপ্ত বালুতে কিংবা আগুন গরম পাথরে নগ্ন করে ফেলে রাখা হতো। বুকে চাপা দেওয়া থাকত বেশ ভারী পাথর। ফলে তিনি একটু নড়াচড়াও করতে পারতেন না। তাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি প্রায়ই জ্ঞান হারাতেন। এভাবে তাঁকে বহু দিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কষ্ট দেওয়া হতো। দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরতের সময় তিনিও হিজরত করেন। মুশরিকরা একবার তাঁর গলা ও পায়ে রশি বেঁধে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। এমনভাবে তীব্র মরুতে ফেলে রাখে যে, তিনি যেন মৃত, প্রাণহীন। এবারও মুমূর্ষু এই মুমিনের সাহায্যে এগিয়ে আসেন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। বিলালের মতো তাঁকেও কিনে মুক্ত করে দেন।[১১৩]

❖ খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত (রদিয়াল্লাহু আনহু) একজন সুবিখ্যাত সাহাবি। বানূ খুযাআ গোত্রের উম্মু আনমার বিনতু সাবা'র দাস। খাব্বাব পেশায় ছিলেন কামার। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁর মালিক উম্মু আনমার উত্তপ্ত লোহার টুকরা তাঁর পিঠে রেখে দিত আর বলত, 'মুহাম্মাদের দ্বীন ছেড়ে দে। তাকে অস্বীকার কর।' এই কথা শুনে তাঁর ঈমান আরও বেড়ে যেত। ইসলামের ওপর অনড় থাকত। অন্যান্য

---

[১১১] ইবনু কাসীর, সূরা নাহলের ১০৬ নং আয়াতের তাফসীর; ইবনু হিশাম, ১/৩১৭-৩১৮; ইবনুল জাওযি, তালকীহ, ৬১।

[১১২] ইবনু সা'দ, তবাকাতুল কুবরা, ৩/৪৮।

[১১৩] ইবনুল আসীর, উসদুল গাবাহ, ৫/২৪৮; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, ৭/১২৫।

মুশরিকরাও তাঁকে নির্যাতন করত। কখনও কখনও খাব্বাব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘাড়ে খুব জোরে জোরে আঘাত করত, আবার কখনও চুল ছিঁড়তে থাকত, কয়েকবার তো জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, তাঁর দগ্ধ পিঠের চর্বিই যা নির্বাপিত করেছিল।[১১৪]

❖ যিন্নীরা (রদিয়াল্লাহু আনহা) ইসলাম গ্রহণকারিণী এক রোমান দাসী। তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর পাওয়ার পর পৌত্তলিকেরা নির্যাতন করতে করতে তাঁকে অন্ধ করে ফেলে। এরপর দাবি করে বসে লাত-উযযা দেবীর অভিশাপে নাকি সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে! উত্তরে যিন্নীরা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন যে, আল্লাহই তাঁকে অন্ধ করেছেন, তিনি চাইলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়েও দিতে পারেন। পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে, সত্যিই তাঁর দৃষ্টি ফিরে এসেছে! কিন্তু নির্যাতনকারীরা এই অলৌকিক ঘটনা দেখে বলতে লাগল, "এটা মুহাম্মাদের জাদু ছাড়া আর কিছু নয়!"[১১৫]

❖ উম্মু উবাইস (রদিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন বানূ যাহরার এক দাসী। তাঁর মনিবের নাম আসওয়াদ ইবনু আবদি ইয়াগূস। সে উম্মু উবাইসের ইসলাম গ্রহণের খবর পেয়ে তাঁকে বিরামহীন অত্যাচার করতে শুরু করে। এই আসওয়াদ লোকটা নবি ﷺ-এর এক দাগী শত্রু। নবিজিকে অক্লান্তভাবে অপমান ও ঠাট্টা করত সে।[১১৬]

❖ বানূ আদি গোত্রের আমর ইবনু মুআম্মালের এক দাসী ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে নির্যাতন করতেন স্বয়ং উমর ইবনুল খাত্তাব। তখনো তিনি মুসলিম হননি। শারীরিক শক্তির জন্য বিখ্যাত উমর ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দাসীটিকে মারধর করতেন। বিরতির সময় বলতেন, "আমি কিন্তু দয়ামায়ার কারণে থামিনি, বুঝেছিস? একটু ক্লান্ত হয়ে গেছি।" সেই দাসী (রদিয়াল্লাহু আনহা) জবাব দিতেন, "আপনার মালিকও আপনার সাথে এ-রকমই আচরণ করবেন!"[১১৭]

এমন আরও দু'জন মুসলিমা দাসী ছিলেন নাহদিয়্যা ও তাঁর মেয়ে। রদিয়াল্লাহু আনহুমা। বানূ আবদিদ দারের এক নারী এঁদের মনিব ছিল। মা-মেয়ের ওপরও যথারীতি নিপীড়ন চলতে থাকে।[১১৮]

---

[১১৪] ইবনুল আসীর, উসদুল গাবাহ, ১/৫৯১-৫৯২; ইবনুল জাওযি, তালকীহ, ৬০।

[১১৫] ইবনুল আসীর, উসদুল গাবাহ, ৫/৪৬২; ইবনু সা'দ, তবাকাত, ৮/২৫৬।

[১১৬] ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, ৮/৪৩৪।

[১১৭] ইবনু হিশাম, ১/৩১৯; ইবনু সা'দ, তবাকাত, ৮/২৫৬।

[১১৮] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৩১৮-৩১৯।

এবারও এগিয়ে আসেন সেই আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন এই দু'জনকেও। এসব জায়গায় আবূ বকরকে টাকা খরচ করতে দেখে তাঁর বাবা আবূ কুহাফা ভর্ৎসনার সুরে বলেছিল, "তুমি দেখি দুর্বল মানুষদের পেছনে সব টাকা খরচ করে ফেলছ! এরচেয়ে কয়েকটা শক্তসমর্থ মানুষকে মুক্ত করলে তো বিপদের সময় ওরা তোমার কাজে আসত।" আবূ বকর জবাব দেন, "আমি তো এগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় করছি।"

এই ঘটনার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রশংসা করে এবং তাঁর শত্রুদের নিন্দা জানিয়ে আয়াত অবতীর্ণ করেন:

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

"তোমাদের সতর্ক করছি এক ভয়ংকরভাবে প্রজ্বলিত আগুনের ব্যাপারে। এতে প্রবেশ করবে কেবল সেসব মহাদুর্ভাগা, যারা অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু আল্লাহভীরুকে এ আগুন থেকে রক্ষা করা হবে, যে আত্মশুদ্ধির জন্য সম্পদ খরচ করে এবং তার ওপর কারও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়; বরং সে চায় শুধুই তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি। আর শীঘ্রই সে সন্তুষ্টি লাভ করবে।"[১১৯]

কিন্তু সকল মুসলিম দাসই মুক্তিপণের সৌভাগ্য পাননি। কেউ শহীদ হন, আবার কেউ প্রকাশ্যে কুফরের ঘোষণা দিতে বাধ্য হন। তবে মনে মনে ঠিকই মুমিন থাকেন। অন্তর থাকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে ভরপুর ও পরিতৃপ্ত।

❖ আম্মার ইবনু ইয়াসির ও তাঁর বাবা-মা (রদিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন বানূ মাখযূম গোত্রের। আবূ জাহল ছিল যার গোত্রপতি। তার নেতৃত্বে একেকবার গোত্রের একেকজন এসে ইয়াসির পরিবারকে আবতাহ নামক স্থানে ধরে নিয়ে যেত। তারপর তাদের উত্তপ্ত সূর্যালোকের নিচে রেখে নির্যাতন করত। নবি ﷺ তাঁদের এই অবর্ণনীয় দুর্ভোগ দেখে সান্ত্বনা দিতেন, "ইয়াসির পরিবার, ধৈর্য ধরো। তোমাদের গন্তব্য জান্নাত। হে আল্লাহ, ইয়াসির পরিবারকে মাফ করে দিন।"[১২০]

---

[১১৯] সূরা লাইল, ৯২ : ১৪-২১।

[১২০] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৯/২৯৬; ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, ৩/৬৪৮।

সত্যিই তাঁরা একদম শেষ পর্যন্ত দৃঢ় থেকেছেন ঈমানের ওপর। আম্মারের বাবা ইয়াসির অত্যাচার সইতে সইতে শহীদ হয়ে যান।

❖ আম্মারের মায়ের নাম সুমাইয়া বিনতু খাইয়াত (রদিয়াল্লাহু আনহা)। তিনি ছিলেন আবূ হুযাইফা মাখযূমির দাসী। তিনি বেশ দুর্বল এবং বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অমানুষ আবূ জাহল তাঁর যোনিতে একটি বর্শা প্রবেশ করিয়ে দেয়। যার অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি শাহাদাতবরণ করেন। তিনিই ইসলামের প্রথম নারী শহীদ।

❖ আর আম্মার (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্য অত্যাচার ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠতে থাকে। মুশরিকরা কখনও তাঁকে শেকল পরিয়ে তপ্ত পাথর বুকে চাপিয়ে মরুভূমিতে ফেলে রাখত। কখনও পানিতে ডুবিয়ে রাখত। একপর্যায়ে যন্ত্রণা সইতে না পেরে বাধ্য হয়ে তিনি মুশরিকদের আদেশমতো কুফরি কথা উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু অন্তর ছিল ঈমানে পূর্ণ। দেহ-মনের এই টানাপড়েনে খুবই বিমর্ষ ও ভীত হয়ে পড়েন আম্মার (রদিয়াল্লাহু আনহু)। কিন্তু আল্লাহ তাঁদের মনে শান্তির সুবাতাস বইয়ে এই আয়াত নাযিল করেন,

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

"যার ওপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত, যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের ওপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"[১২১]

সমাজের পক্ষ থেকে এমন বিরোধিতা আসাটাই স্বাভাবিক ছিল। তবে নব্য-মুসলিমদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনেরাও যেভাবে তাতে হাত লাগিয়েছে, তা একটু অবাক করার মতোই বটে। মূর্তির প্রতি আনুগত্যের সামনে অর্থহীন হয়ে যায় পারিবারিক বন্ধন।

❖ ধনী ও বিলাসী পরিবারের শৌখিন যুবক মুসআব ইবনু উমাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। ইসলাম গ্রহণের পর খাবার-পানীয়ও বন্ধ করে দেন তাঁর মা। এমনকি ঘর থেকেও বের করে দেন। জন্মদাত্রী মায়ের কাছ থেকে এমন অসহনীয় আচরণের পাশাপাশি সইতে হয়েছে শারীরিক অত্যাচারও। ফলে সাপের চামড়ার ন্যায় তাঁর চামড়াও উঠে গিয়েছিল।[১২২]

---

[১২১] সূরা নাহল, ১৬ : ১০৬; ইবনু হিশাম, ১/৩১৯-৩২০।

[১২২] ইবনুল আসীর, উসদুল গাবাহ, ৪/৪০৬।

❖ সুহাইব ইবনু সিনান রূমি (রদিয়াল্লাহু আনহু) এমন আরেকজন মুসলিম। নির্যাতনের ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতেন তিনি। তাঁর কোনও খবরই থাকত না যে, তিনি কী বলছেন!![১২৩]

কুরাইশদের চোখে মুসলিম দাসেরা ছিল অবাধ্য বিদ্রোহীর মতো, যাদের একমাত্র পাওনা মৃত্যু। নিচু সামাজিক অবস্থানের কারণে তাঁরা একেবারেই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েন। অবশ্য সম্পদ আর সামাজিক মর্যাদাও কাজে আসেনি মুসলিমদের জন্য। উসমান ইবনু আফফান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো ধনী ও সম্মানিত মানুষকেও নানাভাবে অত্যাচার সইতে হয়েছে। তাঁর এক চাচা তাঁকে একবার একটি খেজুরের চাটাইয়ে পেঁচিয়ে নিচ থেকে অঙ্গারের তাপ দিতে থাকে।[১২৪]

আবূ বকর এবং তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কেও অপমান সইতে হয়েছে। নাওফাল ইবনু খুয়াইলিদ, কেউ কেউ বলেন উসমান ইবনু উবাইদিল্লাহ, তাঁদের একসাথে একই রশি দিয়ে বেঁধে রাখে, যেন সালাত আদায় করতে এবং ধর্মীয় আচারগুলো পালন করতে না পারেন। কিন্তু তাঁরা তা মানতেন না। মুশরিকরা দেখে পেরেশান হয়ে যেত যে, তাঁদের রশি খোলা এবং তাঁরা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে। অথচ তাদের দু'জনকে একত্রে বেঁধে রাখা হয়েছিল। একই রশিতে দু'জনকে বাঁধা হতো বলে তাঁদের 'করীনান' (قَرِيْنَانِ) বলা হতো। এর অর্থ 'একসাথে মিলিত দু'জন'।[১২৫]

ইসলামের প্রতি আবূ জাহলের মারাত্মক বিদ্বেষ ও চরম অহংকারের কথা কুরআনে বেশ কয়েকবার এসেছে। মক্কার যেসব গোত্রপতি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধিতা করাকে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করেছিল, আবূ জাহল তাদেরই একজন। একেকজন মুসলিম হওয়ার খবর আসে, আর তার বিদ্বেষের মাত্রা বেড়ে চলে। সেই নব্য-মুসলিম সামাজিকভাবে মর্যাদাবান হলে শুধু তিরস্কার করত আর সম্পদ-সম্মান ছিনিয়ে নেওয়ার হুমকি দিত। আর সমাজের নিচুতলার বাসিন্দা হলে তো নিজেও মারধর করত, অন্যদেরও এই কাজ করতে ডাকত এবং আদেশ করত। এই দুর্বল ও গরিব মুসলিমদের অত্যাচার, এমনকি পিটিয়ে মারাটাই ছিল সাধারণভাবে মুশরিকদের নিয়ম। তবে গণ্যমান্য কোনও লোকের ধর্মান্তরিত হবার খবর পেলে একটু রয়েসয়ে প্রতিক্রিয়া দেখাত। সমশ্রেণির মুশরিক ছাড়া অন্য কেউ সেই মুসলিমের ধর্মান্তরকে চ্যালেঞ্জ করতে পারত না।[১২৬]

---

[১২৩] ইবনু সা'দ, তবাকাত, ৩/২৪৮।

[১২৪] সালমান মানসূরপুরি, রহমাতুললিল আলামীন, ১/৮৭।

[১২৫] ইবনুল আসীর, উসদুল গাবাহ, ২/৪৬৮।

[১২৬] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৩২০।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মুশরিকদের আচরণ

আল্লাহ্ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ-কে বেশ প্রভাব, গাম্ভীর্য আর মর্যাদা দান করেছিলেন। ফলে তাঁর সাথে বাড়াবাড়ি করার সাহস কেউ পেত না। সে যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন। তার ওপর নবি ﷺ ছিলেন সম্মানিত গোত্রের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে, তাই তাঁর সাথে অতটা দুর্ব্যবহার করা হতো না, যতটা করা হতো দাস-শ্রেণির মুসলিমদের সাথে। আবার আরেক সম্মানিত গোত্রপতি আবূ তালিব তাঁর ভাতিজাকে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছিলেন। বানূ আবদি মানাফের এই ব্যক্তি শুধু কুরাইশদের কাছে না, গোটা আরবেই ছিল সমীহের পাত্র। এমন লোকের ভাতিজাকে কষ্ট দিতে এবং তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করতে সবাই একটু হলেও ইতস্তত করত। ভয় পেত।

এর বদলে তারা আবূ তালিবের সাথে সলা-পরামর্শ করে। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর মিশন বন্ধ না করলে কী পরিণতি হবে, তা নিয়ে একটু-আধটু ইঙ্গিত দিত কথায় কথায়।

আবূ তালিবের সাথে কুরাইশদের কথোপকথন

বেশ কিছুদিন চিন্তাভাবনার পর কুরাইশের একদল রুই-কাতলা সিদ্ধান্ত নিল আবূ তালিবের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করার। দেখা করে বলল, "দেখুন, আপনার ভাতিজার কাজকারবার তো সবই জানেন। সে আমাদের উপাস্যদের নামে খারাপ কথা বলে, আমাদের ধর্মকে দোষারোপ করে। বলে যে, আমরা নাকি অজ্ঞ, কিছু বুঝি না। আবার আমাদের বাপ-দাদাদের নিয়েও এটা-সেটা বলতে ছাড়ে না। তাই বলছিলাম, হয় আপনি তাকে থামান, আর নয়তো তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন। তখন আমরাই ওর সাথে বোঝাপড়া করব।" আবূ তালিব নরম স্বরে কিছু একটা উত্তর দিয়ে সেদিনের মতো তাদের বিদেয় করেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর নুবুওয়াতের দাবি ও ইসলামের প্রচারণার ওপর অটল রইলেন।[১২৭]

আবূ তালিবকে কুরাইশদের হুমকি ও চ্যালেঞ্জ

আরও কিছুকাল অপেক্ষা করে কুরাইশরা যখন দেখল যে, আবূ তালিব কিছুই করছেন না। এদিকে মুহাম্মাদ ﷺ-ও তাঁর কাজ এবং প্রচার-প্রসার করেই যাচ্ছেন। তখন তারা অবশেষে একটা এসপার-ওসপার করার সিদ্ধান্ত নেয়। আবারও আবূ তালিবের সাথে মিটিংয়ে বসে। এবার আর আগের মতো নরম স্বরে না বলে কড়া ভাষায় জানাল, "আবূ তালিব, আপনার বয়সও হয়েছে, মুরুব্বি হিসেবে সম্মানও করি। আপনার

---

[১২৭] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/২৬৫।

ভাতিজার ব্যাপারে একটা অনুরোধ করে গিয়েছিলাম, সেটাকে তো কোনও পাত্তাই দিলেন না। আল্লাহর কসম! আমরা কিন্তু এসব আর বেশিদিন সহ্য করব না। আমাদের পূর্বপুরুষদের অপমান করে, আমাদের অজ্ঞ বলে, দেবতাদের খারাপ কথা বলে, কী শুরু হয়েছে এসব? শুনুন, হয় আপনি তাকে থামাবেন, আর নয়তো আমরা যুদ্ধের ঘোষণা করছি। কোনও এক পক্ষ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করে যাব।"

আবূ তালিব এবারে হুমকি আমলে নিলেন। তিনি কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেন। নবিজি ﷺ-কে ডেকে কুরাইশদের বলা কথাগুলো বুঝিয়ে বললেন। অনুরোধ করলেন, "আমাকেও দয়া করো, নিজেকেও দয়া করো। এমন বোঝা আমার ওপর চাপিয়ো না, যেটা নিতে পারব না।"

আবূ তালিবের পুরো কথা শুনে মুহাম্মাদ ﷺ বললেন,

> يَا عَمِّ! وَاللهِ لَوْوَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي، عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هٰذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ

> "চাচা! আল্লাহর শপথ! এরা যদি আমাদের ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদও এনে দেয়, আমি আমার কাজ ছাড়ব না। হয় আল্লাহ্ আমাকে বিজয়ী করবেন, নয়তো এ কাজ করতে করতেই আমার মৃত্যু এসে যাবে।"[১২৮]

এ কথা বলার পর নবি ﷺ-এর চোখে অশ্রু চলে আসে, তিনি নীরবে অশ্রুপাত করতে থাকেন। এ অবস্থা দেখে আবূ তালিবের মুহাব্বত বেড়ে যায় এবং নিজের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসেন এবং বলেন, "ভাতিজা, যেখানে চাও যাও। যা ইচ্ছা বলো। আল্লাহর কসম! আমি কিছুতেই তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব না।"[১২৯]

কুরাইশদের অদ্ভুত প্রস্তাব ও তার অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যান

কুরাইশরা যখন দেখল যে, হুমকি-ধমকিতে কাজ হচ্ছে না, আবূ তালিবও যেকোনও মূল্যে ভাতিজাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত, তখন তারা এক অদ্ভুত পথ ধরল। নতুন এই পরিকল্পনার কেন্দ্রে ছিল আম্মারা ইবনুল ওয়ালীদ। সে কুরাইশ গোত্রের এক সুদর্শন তরুণ। তাকে আবূ তালিবের কাছে নিয়ে গিয়ে তারা বলল, "ওহে আবূ তালিব, এই যুবককে আপনার তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিন। একদম নিজের ছেলেই মনে করুন একে।

---

[১২৮] ইবনু ইসহাক, কিতাবুল মাগাযি, ১/২৮৪-২৮৫, দুর্বল।

[১২৯] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/২৬৫-২৬৬; বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ২/১৮৮।

যত চান, নিরাপত্তা দিন। বিনিময়ে আপনার ভাতিজাকে তুলে দিন আমাদের হাতে। মক্কায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করা, জ্ঞানীগুণী লোকদের অজ্ঞ ঠাওরানো আর বাপ-দাদাদের ধর্ম ছেড়ে দেওয়ার দায়ে আমরা তাকে হত্যা করব। আর তার বিনিময়ে আমরা আপনাকে এই সুদর্শন যুবককে দিচ্ছি।"

এমন বিদঘুটে ও বিস্ময়কর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আবূ তালিব জবাব দিলেন, "আল্লাহর কসম! তোমরা তো আমার সাথে জঘন্য সওদা করার জন্য এসেছ! তোমাদের ছেলেকে পেট ভরে খাওয়াব, আদর-যত্ন করব; আর বিনিময়ে তোমরা আমার ছেলেকে মেরে ফেলবে? আল্লাহর কসম! এটি তো কখনও হতে পারে না!!"

নবিজি ﷺ-এর ওপর নির্যাতন

হুমকি-ধমকি আর দামাদামি কিছুতেই যখন আবূ তালিবকে টলানো গেল না, এবার কুরাইশরা সিদ্ধান্ত নিল সরাসরি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অত্যাচার শুরু করার। সেই সাথে মুমিনদের বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ড আরও জোরদার করার।

মক্কায় নবিজি ﷺ-এর সামাজিক মর্যাদার কারণে শুধু সমমর্যাদার মানুষেরাই দুর্ব্যবহার করার সাহস পেল। আপন লোকদের মাঝে যারা নবিজিকে কষ্ট দিত, তারা হলো আবূ লাহাব, হাকাম ইবনু আবিল আস, উকবা ইবনু আবী মু'আইত, আদি ইবনু হামরা সাকাফি, ইবনুল আসদা হুযালি।

সকলেই এরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিবেশী। নবি ﷺ সালাতে সাজদায় গেলে এদের কেউ এসে উটের নাড়িভুঁড়ি ছুড়ে মারত পিঠের ওপর। আবার অনেকে দরজার সামনে ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখত। নবি ﷺ একটি কাঠের টুকরো দিয়ে সেগুলো সরাতে সরাতে বলতেন, "ওহে বানূ আবদি মানাফ, এ কেমন প্রতিবেশীর কাজ!"[১৩০]

- নবিজি ﷺ-কে দেখলেই উস্কানিমূলক কথা বলত উমাইয়া ইবনু খালাফ। চোখ টিপে টিপে তাঁর প্রতি ইশারা করে বাজে মন্তব্য ছুড়ত। তার ভাই উবাই ইবনু খালাফ হুমকি-ধামকি দিত এবং বলত, "মুহাম্মাদ, আমার একটা ঘোড়া আছে। নাম রেখেছি ঊদ। জম্পেশ খানাদানা করিয়ে মোটাতাজা করছি, যাতে ওটার পিঠে চড়ে একদিন তোমাকে হত্যা করতে পারি।"

একদিন মুহাম্মাদ ﷺ কথাটার একটি জবাব দিয়ে বসলেন, "না; বরং আল্লাহ চাইলে তো আমিই তোমাকে হত্যা করব।"

---

[১৩০] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৪১৬।

উহুদের যুদ্ধে নবিজির এ কথা সত্য হয়েছিল। একদিন এই উবাই ইবনু খালাফই একটি পচা দুর্গন্ধযুক্ত হাড্ডি নিয়ে নবি ﷺ-এর চেহারার দিকে ছুড়ে মেরেছিল।[১৩১]

❖ আরেকবার উকবা ইবনু আবী মু'আইত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে বসে তাঁর কথা শুনছিল। সে আবার উবাই ইবনু খালাফের বন্ধু। উবাই যখন খবর পেল তার জিগরি দোস্ত নবিজি ﷺ-এর কথা শুনেছে, তখন এ জন্য তাকে প্রচণ্ড তিরস্কার করল এবং বলল, "যাও, গিয়ে মুহাম্মাদের মুখে থুতু মেরে আসো।" আরব মুশরিকদের কাছে ভদ্রতার চেয়ে গোত্রপ্রীতি আগে। উকবা তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে সেই জঘন্য কাজটি করে এল।[১৩২]

❖ নবিজি ﷺ-এর চাচা আবূ লাহাব। এই ভাতিজার জন্মের সুসংবাদ পেয়ে সে একজন দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছিল। অথচ সাফা চূড়া থেকে আসা সেই ঘোষণার পর থেকে ভাতিজাই হয়ে পড়েন আবূ লাহাবের জানের দুশমন। তার দুই ছেলে উতবা এবং উতাইবা বিয়ে করেছিল রাসূলের দুই মেয়ে, যথাক্রমে রুকাইয়া ও উম্মু কুলসূমকে। রদিয়াল্লাহু আনহুমা। আবূ লাহাব দুই ছেলেকেই বলে দিল নিজ নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে, নাহলে সে আর ছেলেদের মুখও দেখবে না। তার স্ত্রী উম্মু জামীল আরওয়া বিনতু হারবেরও একই কথা। পুত্রবধূরা "ধর্মত্যাগী" হয়ে গেছে বলে সেও ছেলেদের তালাক দেওয়ার ফরমান জারি করে। মা-বাবার কথামতো উতবা ও উতাইবা তাদের তালাক দিয়ে দেয়।[১৩৩]

❖ স্বামীর চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না উম্মু জামীলের শত্রুতা। নিজেকে রাসূল দাবি করে তার প্রিয় দেব-দেবীদের বিরোধিতা করছে ভাতিজা, এটা তার সহ্য হয়নি। নবি ﷺ ও সাহাবিগণের হাঁটার পথে সে কাঁটা বিছিয়ে রাখত, যাতে তাদের যখম হয়, তারা কষ্ট পায়।

একসময় কুরআনের সূরা লাহাব নাযিল হয়। আবূ লাহাব ও তাঁর স্ত্রীকে সেই সূরায় অভিহিত করা হয় চিরস্থায়ী জাহান্নামি হিসেবে। উম্মু জামীল সে খবর পেয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে একটি পাথর হাতে নিয়ে বের হয় নবিজি ﷺ-এর খোঁজে। তিনি তখন কা'বার কাছেই আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে বসা। উম্মু জামীল এসে আবূ বকরকে বলল, "তোমার ওই সঙ্গী কই? আমাকে নিয়ে নাকি কী কী বলেছে সে? আল্লাহর কসম! তাকে পেলে এই পাথর ওর মুখে ছুড়ে মারব। 'আর শোনো, ও-রকম

---

[১৩১] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৩৬১-৩৬২।

[১৩২] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৩৬১।

[১৩৩] তাবারানি, মু'জামুল কাবীর, ২২/৪৩৫।

কবিতা আমরাও বানাতে জানি', বলে সে এই চরণগুলো আবৃত্তি করে,

"নিন্দিতকে ত্যাগ করেছি, শুনব না তার ডাক
সে নিজে আর তার ধর্ম, সব গোল্লায় যাক।"

এই বলে সে গটগট করে হেঁটে চলে গেল। আবূ বকর অবাক হয়ে নবিজিকে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, উনি কি আপনাকে দেখতে পায়নি?"

নবি ﷺ বললেন, "পারবে কী করে? আল্লাহ আমার থেকে তার দৃষ্টিশক্তি বন্ধ করে রেখেছিলেন।"[১৩৪]

তার আওড়ানো কবিতা থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কুরাইশরা নবিজি ﷺ-কে অপমান করতে নতুন আরেক বুদ্ধি বের করেছে। মুহাম্মাদকে তারা মুযাম্মাম বলে ডাকতে শুরু করে। মুহাম্মাদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত, আর মুযাম্মাম অর্থ নিন্দিত।

আবূ জাহলের আসল উপনাম ছিল আবুল হাকাম। এর আক্ষরিক অর্থ জ্ঞানের পিতা। কিন্তু নবিজি ﷺ-এর প্রতি আচরণ দেখে মুসলিমদের কাছে তার ডাকনাম হয়ে যায় আবূ জাহল—অজ্ঞতার পিতা। স্থানীয় পৌত্তলিক ধর্মত্যাগকারী প্রতিটা ব্যক্তি আবূ জাহলের চোখে বিচ্ছিন্নতাবাদী। সে তাঁদের বিদ্রোহের দায়ে শাস্তি দিত। অপমান করত। মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রকাশ্যে অপমান করা আর সালাতে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সে ছিল অগ্রগামী।

একদিন নবি ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখে যথারীতি উত্যক্ত ও হুমকি প্রদান শুরু করল সে। অবশেষে নবি ﷺ আবূ জাহলের গলার কাপড় ধরে সজোরে ঝাঁকি দিয়ে তিলাওয়াত করলেন,

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾

"দুর্ভোগ, তোমার দুর্ভোগ! আবারও বলি। দুর্ভোগ, তোমার দুর্ভোগ!"[১৩৫]

আবূ জাহল উত্তর দিল, "মুহাম্মাদ, তুই আমার ওপর খবরদারি করছিস! তুই আর তোর খোদা আমার কোনও ক্ষতিই করতে পারবি না। এই পুরো এলাকায় আমিই সবচেয়ে ক্ষমতাবান।"[১৩৬]

প্রতিশোধের নেশায় পাগল আবূ জাহল একদিন তার দোস্তদের বলল, "মুহাম্মাদ কি

[১৩৪] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ১১/৪৯৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ২/৩৬১।
[১৩৫] সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩৪-৩৫।
[১৩৬] তিরমিযি, ৩৩৪৯; তাবারি, তাফসীর, ৩০/২৩৪; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৪৯০।

তোমাদের সামনে মাটিতে মুখ ঘষে (সালাত পড়ে)?"

তারা জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

"লাত ও উযযার কসম! আর একবার ওকে এই কাজ করতে দেখলে তার ঘাড়ে পা দিয়ে চেহারা মাটিতে মিশিয়ে দেবো।"

আরেকদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাত পড়তে দেখে আবূ জাহল তার হুমকি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আগে বাড়ল। তাকিয়ে থাকা লোকেরা দেখল যে, আবূ জাহল নিরস্ত্র মুহাম্মাদ ﷺ-এর একটু কাছে গিয়েই আবার দৌড়ে ফিরে আসছে এবং হাত দিয়ে কিছু একটা থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

সবাই জিজ্ঞেস করল "আবুল হাকাম, কী হয়েছে?"

আবূ জাহল বলতে লাগল, "আমার আর ওর মাঝখানে দেখলাম আগুনের একটি পরিখা আর ভয়ানক কতগুলো দৃশ্য!"

সাহাবিদের নবি ﷺ পরে বলেছিলেন, "সেদিন সে আমার কাছে ভিড়লে ফেরেশতারা টেনে টেনে তার প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে ফেলতেন।"[১৩৭]

❖ নবিজি ﷺ-কে অসম্মান করে চির-লাঞ্ছনার অধিকারী হওয়া আরেক ব্যক্তির নাম উকবা ইবনু আবী মু'আইত। একবার নবি ﷺ কা'বার কাছে সালাত আদায় করছিলেন। অনেকের সাথে কাছেই বসা ছিল আবূ জাহল। হঠাৎ সে বলল, "মুহাম্মাদ যখন সাজদা দেবে, তখন অমুক গোত্রের একটা উটের নাড়িভুঁড়ি এনে ওর পিঠে কে রেখে দিতে পারবে?" উকবা ইবনু আবী মু'আইত তখন নিজের কাবিলিয়াত প্রমাণ করার জন্য রীতিমতো ছটফট করছে। সুযোগ পেয়েই সে ছুটল যবাই করা একটি উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে আসতে। ফিরে এসে অপেক্ষা করতে লাগল মুহাম্মাদ ﷺ কখন সাজদায় যান। যেই না তিনি মাথা ঝোঁকালেন, অমনি গিয়ে সে আবর্জনাগুলো ঢেলে দিল নবিজি ﷺ-এর ঘাড়ের ওপর।

আবূ জাহল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ার জোগাড়। নবিজি ﷺ মাথা না তুলে ওভাবেই সাজদায় রইলেন। ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে কেউ একজন খবরটা পাঠাল। তিনি দৌড়ে কা'বা প্রাঙ্গণে এসে দুর্গন্ধময় নাড়িভুঁড়ি সরিয়ে দিলেন বাবার শরীরের ওপর থেকে। ভারী জিনিসটা সরে যাওয়ায় রাসূলুল্লাহ উঠে সোজা হয়ে বসলেন। দুআ করলেন,

[১৩৭] মুসলিম, ২৭৯৭, ২৭৯৮।

اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ

"হে আল্লাহ, কুরাইশদের আপনি চেপে ধরুন!"

আবূ জাহল ও তার শিষ্যদের হৃদয় হঠাৎ কেমন ভার হয়ে এল। মক্কায় করা কোনও দুআ যে বিফলে যায় না, এ বিশ্বাস তাদেরও ছিল।

নবি ﷺ প্রতিটি শত্রুর নাম ধরে ধরে সশব্দে দুআ করতে থাকলেন, যেন আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেন।

কুরাইশদের আশঙ্কাই সত্যি হয়। নবিজি ﷺ-এর দুআ কবুল হওয়ার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় অদূর ভবিষ্যতে বদর যুদ্ধে।[১৩৮]

তবে আপাতত মনে হচ্ছে যেন ইসলামের শত্রুরা সংখ্যায়-শক্তিতে মুসলিমদের বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। আবূ বকর ও উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-সহ অল্প কিছু সৌভাগ্যবান ব্যক্তির কথা বাদ দিলে মক্কার বাকি সব রুই-কাতলারা নিজেদের সবটুকু সম্পত্তি আর প্রভাব-প্রতিপত্তি ঢেলে দিচ্ছে নবিজির বিরোধিতায়, ইসলামের ধ্বংস-চিন্তায়। আবূ জাহল ছাড়াও এমন আরও পাঁচ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি হলো ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা মাখযূমি, আসওয়াদ ইবনু আবদি ইয়াগূস যুহরি, আবূ যামআ আসওয়াদ ইবনু আবদিল মুত্তালিব আসাদি, হারিস ইবনু কাইস খুযাঈ এবং আস ইবনু ওয়াইল সাহমি। নুবুওয়াতি মিশন শুরু হওয়ার পর মক্কায় এত বছর কেটে গেলেও নবি ﷺ একটিবারের জন্যও প্রতিশোধ নেননি। কারণ, আল্লাহই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যথাসময়ে তিনি এদের দেখে নেবেন। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ ﷺ-এর কঠিনতম শত্রুরা করুণতম মৃত্যুর শিকার হয়েছিল।

- ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরার গায়ে সামান্য তিরের আঁচড় লেগেছিল। সে এটিকে পাত্তাই দেয়নি। কিন্তু জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আঁচড়টির দিকে ইশারা করেন ফলে তাতে জ্বালাপোড়া শুরু হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে সেই ক্ষতের প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে অবশেষে মৃত্যু হয় ওয়ালীদের।
- একইভাবে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আসওয়াদ ইবনু আবদি ইয়াগূসের দিকে ইশারা করেন। তার শরীরে ফোস্কা পড়ে যায় এবং এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়। আরেক উৎস থেকে জানা যায় যে, সূর্যের প্রখর তাপে এই ফোস্কা পড়ে। তবে এতেও জিবরীলেরই ভূমিকা ছিল। অন্য আরেক বর্ণনামতে, জিবরীল তার পেটের

---

[১৩৮] বুখারি, ২৪০, ৫২০, ২৯৩৪, ৩১৮৫, ৩৮৫৪, ৩৯৬০।

দিকে ইশারা করেন। ফলে তার পেট এমনভাবে ফুলে ওঠে যে, এতেই তার মৃত্যু হয়।

- আসওয়াদ ইবনু আবদিল মুত্তালিবের বাড়াবাড়ি চরমে পৌঁছালে নবি ﷺ দুআ করেন, যেন আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তাকে পিতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করেন। জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-কে পাঠানো হয় একটি কাঁটাদার গাছের ডাল দিয়ে আঘাত করে তাকে অন্ধ করে দিতে এবং তার ছেলেকেও মেরে ফেলতে। তিনি যথাযথভাবে আদেশ পালন করেন। ফলে সে অন্ধ হয়ে যায় এবং তার ছেলেরাও মৃত্যুবরণ করে।

- হারিস ইবনু কাইসের মৃত্যু আরও করুণ। মৃত্যুশয্যায় তার তার পেট হলুদ তরলে ভরে ওঠে। আর পেটের সব বর্জ্য বেরিয়ে আসতে থাকে নাক দিয়ে। এভাবে যন্ত্রণাকর অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

- আস ইবনু ওয়াইল একবার একটি কাঁটাযুক্ত গাছে বসেছিল। যার একটি কাঁটা তার পায়ে বিদ্ধ হয়। সে কাঁটার বিষে তার পা ফুলে যায় এবং সে বিষ মাথা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ওই বিষের প্রভাবেই তার জীবনাবসান ঘটে।[১৩৯]

এই হলো তাদের পাঁচ জনের সংক্ষিপ্ত পরিণাম-কাহিনি। এসব ইসলামবিদ্বেষী দুর্ভাগারা এ-রকম ঐশী শাস্তির শিকার হয়।

তবে বেশির ভাগ সময়ই নবি ﷺ ধৈর্য ধরে সকল বিরোধিতা সহ্য করে যান, ঠিক যেমনটি করেছিলেন পূর্বেকার নবি-রাসূলগণ। এমন অটল ধৈর্য ও ঈমান দেখে সাহাবিদের অন্তরও প্রশান্ত হয়, আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকে তাদের হৃদয়। এদিকে যথারীতি চলতে থাকে মুশরিকদের মৌখিক গালাগাল ও শারীরিক নির্যাতন। আক্রান্ত মুসলিমদের প্রতিরক্ষায় নবি ﷺ দুটি পদক্ষেপ নেন।

মুসলিমদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র—দারুল আরকাম

প্রথম পদক্ষেপ: নবি ﷺ সাহাবি আরকাম ইবনু আবিল আরকাম মাখযূমি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘরটিকে গোপন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেন। এখানে মুমিনদের ইবাদত, দাওয়াত, তাবলীগ, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ সবকিছু হতো। ঘরটির অবস্থানও একেবারে আদর্শ জায়গায়। কা'বা থেকে অল্প একটু হাঁটা-দূরত্বে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে, কিন্তু শহরের কোলাহল থেকে যথেষ্ট দূরে। আশপাশে বসবাসরত

---

[১৩৯] তাবারি, তাফসীর, ৮/৯০; সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ৪/২০০।

মুশরিকরা তাই খেয়ালও করেনি যে, এই জায়গাটিতে প্রায়ই লোকজন জড়ো হচ্ছে।

নবি ﷺ সেখানে সাহাবিদের কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। আর সাহাবিগণ সেগুলো আত্মস্থ করে নিতেন। এভাবেই প্রথম দিককার মুসলিমরা দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির শিক্ষা এবং নির্ঝঞ্ঝাটে সালাত আদায়ের সুবর্ণ সুযোগ পান দারুল আরকামে।

তবে নবিজি ﷺ নিজে ঠিকই প্রকাশ্যে সালাত আদায় অব্যাহত রাখেন। নির্যাতন, অপমান, হয়রানি সত্ত্বেও সকলের কাছে পৌঁছে দিতে থাকেন ইসলামের দাওয়াত। চরম বৈরী পরিবেশেও রাসূলের মাধ্যমে প্রকাশ্যে দাওয়াত চালানোটা আল্লাহর এক বিশেষ প্রজ্ঞা ও দয়ার নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার কারণেই বিচার-দিবসে কেউ এই অভিযোগ করতে পারবে না যে, তাদের কাছে কেউ সরলপথের আহ্বান নিয়ে আসেনি।

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত (রজব, নুবুওয়াতের ৫ম বছর)

দ্বিতীয় পদক্ষেপ: উত্তরোত্তর শত্রুতা থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল হিজরত। নবিজি ﷺ জানতে পারেন যে, আবিসিনিয়ার ন্যায়পরায়ণ খ্রিষ্টান রাজা তাঁর শাসনভূমিতে কোনও নির্যাতন বরদাশত করেন না। তাই তিনি মুসলিমদের নির্দেশ দেন আবিসিনিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিতে।

নুবুওয়াতের পঞ্চম বছরের রজব মাসে মুসলিমদের প্রথম দলটি হিজরত করে। বারো জন পুরুষ এবং চার জন নারীর সেই ছোট্ট কাফেলাটি লোহিত সাগর ধরে আবিসিনিয়ায় যাত্রা করেন। দলটির নেতৃত্বে থাকেন উসমান ইবনু আফফান (রদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর স্ত্রী নবি-তনয়া রুকাইয়া (রদিয়াল্লাহু আনহা)। নবি ইবরাহীম ও লূত (আলাইহুমাস সালাম)-এর পর এটাই ছিল প্রথম কোনও পরিবারের ধর্মরক্ষার্থে হিজরত করা।

মুহাজিরদের দলটি রাতের অন্ধকারে নীরবে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন। পৌঁছে যান জেদ্দার দক্ষিণে অবস্থিত বিশাল সমুদ্রবন্দরে। সৌভাগ্যবশত তারা তখনই পেয়ে যান দুটো মালবাহী জাহাজ। তাতে চড়েই আবিসিনিয়া পৌঁছান তাঁরা। পেয়ে যান বহুল আকাঙ্ক্ষিত নিরাপদ আশ্রয়।

এদিকে কুরাইশরা খবর পেয়ে রাগে ফেটে পড়ে। তৎক্ষণাৎ তারা তাদের পিছু ধাওয়া করে। এই ভেবে যে, তাঁদের ফিরিয়ে এনে উচিত সাজা দেওয়া যাবে। কিন্তু ততক্ষণে মুসলিমরা সমুদ্রবন্দর ছেড়ে বহুদূর চলে গেছেন। ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে মক্কায় ফিরে আসে

মুশরিকরা। আর ভেতরে ভেতরে ক্রোধে জ্বলতে থাকে।[১৪০]

মুসলিম-মুশরিক লুটিয়ে পড়ে সাজদায় অদৃশ্যের ইশারায়

আবিসিনিয়া হিজরতের ঘটনার পর প্রায় দু-মাস পেরিয়ে গেছে। অতি সম্প্রতি নাযিল হয়েছে সূরা নাজম। নবি ﷺ একদিন এলেন কা'বা প্রাঙ্গণে। গোত্র-নেতারাসহ কুরাইশদের বিশাল একটি দল বসা ছিল তখন। হঠাৎ নবিজি ﷺ কুরাইশদের সামনে গিয়ে সূরা নাজমের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতে থাকেন। অশ্রুতপূর্ব এই শক্তিশালী কথাগুলো স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে মুশরিকরা। এতদিনের চরম শত্রু এখন তাদেরই নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে যাচ্ছেন, অথচ কারও আঙুল তুলবারও সাধ্য নেই, থামানো বা বিদ্রুপ করা তো দূরের কথা। শেষ আয়াতটি পড়ে জগৎসমূহের প্রতিপালকের উদ্দেশে সাজদায় লুটিয়ে পড়লেন আল্লাহর রাসূল ﷺ,

> "আল্লাহর প্রতি সাজদা করো এবং তাঁরই উপাসনা করো।"[১৪১]

হঠাৎ কুরাইশ মূর্তিপূজকদের কী যেন হলো। বর্ণনাতীত এক আবেগের আতিশয্যে সবাই বে-এখতিয়ার সাজদা দিয়ে বসে! একজনও বাদ ছিল না। তবে সেখানে উপস্থিত একমাত্র উমাইয়া ইবনু খালাফ সাজদা করেনি। সাহাবি ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) তার ব্যাপারে বলেছেন, "সে সেদিন এক মুষ্টি মাটি তুলে কপালে ঘষে বলেছিল, 'আমার জন্য এটাই যথেষ্ট।'" তিনি বলেন আমি তাকে কাফির অবস্থায় বদর যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছি।[১৪২]

মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

কুরাইশরা কুরআনের আয়াত শুনে সাজদা দেওয়ার খবর আবিসিনিয়ায়ও পৌঁছে যায়। মুহাজিরদের মাঝে কানকথা ছড়িয়ে পড়ে যে, কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। ফলে তাঁরা সানন্দে জাহাজে উঠে পড়েন আরবের উদ্দেশে। কিন্তু মক্কার অদূরে এসেই খবর পান যে, সবই আগের মতো আছে। আপন বাসভূমি তখনো শত্রুতার কাঁটায় ঘেরা। চারদিক নির্যাতনে ছাওয়া। হতাশ হয়ে আবার কেউ আবিসিনিয়ায় ফিরে যান, কেউ গোপনীয়ভাবে কোথাও অবস্থান করেন, আর কেউ কেউ সরাসরি মক্কায় প্রবেশ করেন সহানুভূতিশীল কোনও অমুসলিমের কাছে আশ্রয় নিয়ে।[১৪৩]

---

[১৪০] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ১/২৪।
[১৪১] সূরা নাজম, ৫৩ : ৬২।
[১৪২] বুখারি, ১০৬৭।
[১৪৩] ইবনু হিশাম, ১/৩৬৪; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ১/২৪, ২/৪৪।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত

সাজদার সেই ঘটনার পর কুরাইশদের আর কোথাও মুখ দেখানোর জো রইল না। পাছে লোকে ভেবে বসে তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর বার্তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই তারা পূর্বের তুলনায় শত্রুতা আরও বাড়িয়ে দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ দিল। আবার মুসলিমদের প্রতি আবিসিনিয়ার রাজার উদার আচরণের কথা জেনেও রাগে ফুঁসছিল তাদের অন্তর।

নিরাপত্তার খাতিরে মুসলিমদের আরও একটি দলকে আবিসিনিয়া পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন নবিজি ﷺ। বিরাশি বা তিরাশি জন পুরুষ আর আঠারো জন নারী নিজেদের প্রস্তুত করলেন এ যাত্রায়। যদিও কাফির-মুশরিকদের পাহারার চোখগুলো আগের চেয়ে সচেতন ছিল, তবুও তাঁরা সেগুলোকে ফাঁকি দিয়ে মক্কা ছাড়তে সক্ষম হলেন।

মুসলমানদের ফেরাতে কুরাইশদের অপতৎপরতা

এবার আগের চেয়েও বড় দল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় কুরাইশদের মাথার চুল ছেঁড়ার মতো অবস্থা। কিন্তু এবার তারা এক মারাত্মক চাল দিল মুসলিমদের মক্কায় ফিরিয়ে আনার জন্য। আবিসিনিয়ান রাজার সাথে দর কষাকষি করতে তারা পাঠাল দুই সদস্যের এক প্রতিনিধিদল—একজন আমর ইবনুল আস এবং অপরজন আবদুল্লাহ ইবনু রবীআ। তখন তারা মুশরিক ছিল। বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্যে তারা ছিল সে সময়কার প্রবাদপুরুষ। মুখে মুখে তাদের নাম।

পরিকল্পনামাফিক এই প্রতিনিধিদ্বয় প্রথমে আবিসিনিয়ার যাজকদের সাথে দেখা করে। উৎকোচ দিয়ে আদায় করে নেয় রাজার সাথে দেখা করার অনুমতি। সাক্ষাতের দিনে তারা রাজার সামনে পেশ করে আরবদেশ থেকে আনা বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন। গলায় মধু ঢেলে বলে,

"মহারাজ, আমাদের শহর থেকে কিছু আহাম্মক এসে আপনার এই মহান রাজ্যে আস্তানা গেড়েছে। তারা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে বটে। কিন্তু আপনার ধর্মও গ্রহণ করেনি; বরং তারা নতুন এক দ্বীন-ধর্ম আবিষ্কার করেছে। যা না জানি আমরা আর না আপনি। তাদের পরিবারগুলো তাদের পাগলামির কারণে দুশ্চিন্তায় অস্থির। তাই তারা মহারাজের কাছে আমাদের পাঠিয়েছে, যেন আমরা ঘরের লোকদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। কারণ, ঘরের লোকই ভালো জানে তাদের অবস্থা সম্পর্কে। ফলে সে অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হবে।"

রাজ-যাজকরাও পাশ থেকে সায় জানাতে থাকে। রাজাকে অনুরোধ করে এ আবেদন মেনে নিতে। কিন্তু রাজাকে তারা যতটা বোকা ভেবেছিল তিনি ততটা বোকা নন। তিনি বললেন যে, উভয়পক্ষকেই নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া হবে। দরবারে ডেকে আনা হয় মুহাজির মুসলিমদের। পরিবারকে ত্যাগ করে অজানা এক ধর্ম গ্রহণের কারণ জিজ্ঞেস করেন রাজা।

নবিজি ﷺ-এর চাচাত ভাই জা'ফার ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিমদের মুখপাত্র হয়ে বলেন,

"সম্রাট, আমরা অজ্ঞতায় ডুবে থাকা এক জাতি ছিলাম। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত প্রাণীর মাংস খাওয়া থেকে শুরু করে এমন কোনও জঘন্য কাজ নেই, যা আমরা করতাম না। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীদের সাথে করতাম অসদাচরণ। সবলেরা দুর্বলদের চুষে খেত। এভাবেই কাটছিল আমাদের দিন। তারপর আল্লাহ তাআলা একদিন আমাদের মধ্য থেকে তুলে আনলেন এমন এক বার্তাবাহক, যার বংশমর্যাদা, সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা আর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমরা সবাই ওয়াকিফহাল। তিনি আমাদের আহ্বান করলেন এক ও অদ্বিতীয় উপাস্যকে মেনে নিতে, আল্লাহর ইবাদাত করতে। আমাদের বাপ-দাদারা যেসব ইট-পাথরকে পূজা করতেন, সেগুলোকে ত্যাগ করতে বললেন। আরও আদেশ দিলেন সদা সত্য বলার, কথা দিয়ে কথা রাখার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের প্রতি দয়া করার। অন্যায় রক্তপাত, নির্লজ্জতা, মিথ্যাচার ও ধোঁকাবাজি করা থেকে নিষেধ করলেন। আরও নিষেধ করলেন অনাথের সম্পদ আত্মসাৎ ও সতী নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়া থেকে।

তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা কোনও অংশীদার সাব্যস্ত করা ছাড়াই এক আল্লাহর আরাধনা করি। আদেশ করেছেন সালাত আদায়ের, সিয়াম পালনের এবং অভাবীকে তার প্রাপ্য প্রদানের। আমরা তাঁকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করে নিয়েছি। আল্লাহর কাছ থেকে তিনি যা-ই নিয়ে আসেন, তারই অনুসরণ করি আমরা। তিনি যা নিষেধ করেন, তা পরিত্যাগ করি। যা আদেশ করেন, তা গ্রহণ করে নিই। আমাদের জাতির তা সহ্য হলো না। তারা আমাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাল, লোভ দেখিয়ে মূর্তিপূজায় ফেরত নিতে চাইল, ছেড়ে আসা জঘন্য কাজগুলো আবারও শুরু করতে বলল। আমাদের ও আমাদের দ্বীনের মাঝে তারা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালে আমরা তাদের থাবা থেকে পালাতে উদ্যত হই। অন্য সবার বদলে বেছে নিই আপনার আশ্রয়কে। মহারাজ, আমরা এখানে আপনার নিরাপত্তাপ্রার্থী। আশা করি আমাদের সাথে কোনও অবিচার করা হবে না।"

রাজা ধৈর্য ধরে শুনলেন জা'ফারের কথা। তারপর জানতে চাইলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে আসা বাণীর কিছু অংশ তিনি শোনাতে পারবেন কি না। সূরা মারইয়ামের শুরুর দিকের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান জা'ফার (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তিলাওয়াত শুনে কাঁদতে কাঁদতে রাজার দাড়ি ভিজে যায়। যাজকরাও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। রাজা বলেন, "আরে এ যে সেই একই ঐশী রশ্মি, যা ঈসা নিয়ে এসেছিলেন!"

তারপর কুরাইশ প্রতিনিধিদের দিকে ফিরে রাজা বলেন, "আপনারা যেতে পারেন। আল্লাহর কসম! আমি ওদের না আপনাদের হাতে তুলে দেবো আর না তাদের প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার করব।"

প্রতিনিধিদ্বয় এতে দমে যাওয়ার পাত্র নয়। তারা কৌশল পরিবর্তন করে। মুসলিমদের প্রতি রাজার মনে বিদ্বেষ তৈরি করার মোক্ষম অস্ত্রটি ছিল তাদের হাতে। পরদিন রাজদরবারে আবার দেখা করে আমর বলেন, "মহারাজ, একটা বিষয় তো বলাই হয়নি। এই লোকগুলো ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে নিয়ে এত জঘন্য কথা বলে, যা আপনার সামনে উচ্চারণ করতেও লজ্জা হয়।"

পুনরায় ডাকা হয় মুসলিমদের। ঈসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে তাঁদের কী বিশ্বাস, তা জানতে চাইলেন রাজা। জা'ফার ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) অকপটে উত্তর দেন,

"আমরা তা-ই বলি, যা আমাদের নবিজি ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন। ঈসা (আলাইহিস সালাম) একজন মানুষ এবং আল্লাহর নবি। তিনি পবিত্র কুমারী মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর মাঝে আল্লাহর দেওয়া রূহ ও কালাম।"

রাজা মাটিতে পড়ে থাকা একটি খড়কুটো তুলে নেন। তারপর বলেন,

"আল্লাহর কসম! আপনি যা বললেন, মারইয়াম-তনয় ঈসা তার চেয়ে এই খড়কুটো পরিমাণও বেশি কিছু ছিলেন না। যান, আমার রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বাস করুন। আপনাদের প্রতি দুর্ব্যবহারকারীরা শাস্তি পাবে। আমি আপনাদের কোনও ক্ষতি হতে দেবো না, পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়েও না।"

কুরাইশদের আনা সব উপঢৌকন ফেরত দিয়ে দেওয়ার আদেশ করেন তিনি। প্রতিনিধিদলটি ব্যর্থতার গ্লানি আর চরম অপমান নিয়ে ফিরে যায় মক্কায়। গিয়ে বলে, মুসলমানেরা উত্তম একটি রাষ্ট্রে উত্তম তত্ত্বাবধানে বসবাস করছে।[১৪৪]

---

[১৪৪] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৩৩৪, ৩৩৮।

দেশে-বিদেশে পরাজিত মুশরিকপক্ষের পেরেশানি

ঘরে-বাইরে একের পর এক পরাজয়ে মুশরিকদের মরিয়া ভাব বাড়তে থাকে। বিদেশের মাটিতে রাজদরবারে তাদের গোত্রের নাম ডুবেছে স্রেফ একটি ছোট্ট শরণার্থীদলের কারণে। এ অপমান মেনে নেওয়া যায় না। রক্তের মাধ্যমে হলেও তারা মুসলিমদের কাছ থেকে এর মূল্য বুঝে পেতে বদ্ধপরিকর হয়।

কিন্তু কী করে? আবূ তালিব এখনও ভাতিজার সমর্থনে বটবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে। কোনও ছল-চাতুরিতেই তাঁকে টলানো যাচ্ছে না। চাচার নিরাপত্তাবলয়ে মুহাম্মাদ ﷺ অবাধে নিজের মিশন চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত নির্যাতন, হত্যাচেষ্টা, ঘুষ, তর্ক, এমনকি সমঝোতার মাধ্যমেও কোনও ফলাফল আসেনি।

নবিজি ﷺ-এর প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি ও হত্যার প্রচেষ্টা

আবিসিনিয়ার দরবারে পরাজয়ের রাগ কুরাইশরা স্বভাবতই হাতের কাছে থাকা মুসলমানদের ওপর প্রকাশ করতে লাগল।

নবিজি ﷺ-এর মেয়ে উম্মু কুলসূম (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে তালাক দেওয়া সেই উতাইবা ইবনু আবী লাহাব এবার নবিজি ﷺ-এর কাছে এল। সূরা নাজমের এই আয়াতটি:

﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾

> "অতঃপর নিকটবর্তী হলো ও ঝুলে গেল। তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম।"[১৪৫]

উদ্ধৃত করে বলল, "এই কথা যে বানিয়েছে, আমি তাকে অবিশ্বাস করি।" কুরাইশদের ওই সাজদার ঘটনার জ্বালা প্রশমন করতেই মূলত জোর করে এই কথা বলা।

ধীরে ধীরে এই উতাইবা লোকটা নবিজি ﷺ-এর জন্য বিরতিহীন বিরক্তির উৎসে পরিণত হতে শুরু করে। একবার সে এমনকি নবিজির জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলে এবং মুখে থুতু মেরে বসে। আল্লাহর রাসূল জবাবে বদদুআ করেন, "হে আল্লাহ, আপনার একটি কুকুরকে এর ওপর লেলিয়ে দিন।"

এর অল্প কিছুকাল পরের ঘটনা। এক কাফেলার সাথে সিরিয়ায় যায় উতাইবা। 'যারকা'

---

[১৪৫] সূরা নাজম, ৫৩ : ৭-৮।

নামক স্থানে যাত্রাবিরতির সময়ে একটি সিংহ এসে কাফেলার চারপাশে ঘুরতে থাকে। আতঙ্কিত উতাইবা চিৎকার করে ওঠে, "ইয়া আল্লাহ, এটা নিশ্চিত আমাকে খাওয়ার জন্য এসেছে! মুহাম্মাদের প্রার্থনা দেখি সত্যি হয়ে গেল! মক্কায় বসে সে আমাকে সিরিয়ায় খুন করে ফেলছে!"

রাতে ঘুমানোর সময় কাফেলার লোকেরা উতাইবাকে একদম মাঝখানে শুতে দিল। তা সত্ত্বেও সিংহটি সব উট আর মানুষকে পাশ কাটিয়ে উতাইবার গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। থাবা দিয়ে মাথা ছিঁড়ে ফেলে ওই দুরাত্মাটির ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়।[১৪৬]

মক্কার ঘরে ঘরে নবি ﷺ-এর শত্রু। আগে একবার সাজদারত নবিজির ঘাড়ে উটের নাড়িভুঁড়ি তুলে দেওয়া উকবা ইবনু আবী মু'আইত আবারও হাজির হলো সালাতের সময়ে। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সাজদায় গেলে তাঁর ঘাড়ে পা রেখে সে এত জোরে চাপ দেয় যে, নবিজির চোখ ফেটে যাবার উপক্রম হয়।[১৪৭]

অবশেষে যখন কিছুতেই নবি ﷺ-কে ঠেকানো গেল না, তখন মুশরিকরা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিল। গোত্রকেন্দ্রিক সমাজে এ ধরনের হত্যা অল্পতে শেষ হয়ে যায় না। একটি হত্যাকাণ্ডের জের ধরে বিশাল রক্তপাত হয়। বহুদিন ধরে চলতে থাকে এর গরম হাওয়া। তবু তাদের আর তর সইছিল না। আবূ জাহল কুরাইশদের মাঝে ঘোষণা করল,

"দেখতেই তো পাচ্ছেন, মুহাম্মাদ কতটা বেপরোয়া হয়ে তার মতো সে কাজ করেই যাচ্ছে। পূর্বপুরুষদের অস্বীকার করছে, তাদের পথভ্রষ্ট বলে অপমানিত করছে, আমাদের মূর্খ বলে ডাকছে, আর দেব-দেবীদের বিরুদ্ধকথা প্রচার করেই চলেছে সে। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি। একদিন আমি ভারী একটি পাথর নিয়ে অপেক্ষায় থাকব। সে সাজদায় যাওয়ামাত্রই ওটা দিয়ে ওর মাথা গুঁড়িয়ে দেবো। এরপর তোমরা বানূ আবদি মানাফের আক্রোশ থেকে চাইলে আমাকে বাঁচাতেও পারো, অথবা চাইলে ওদের হাতে তুলেও দিতে পারো।"

লোকজন আশ্বস্ত করল, "চিন্তা করবেন না। আল্লাহর কসম! আমরা কখনও আপনাকে ছেড়ে যাব না। যা চান, তা-ই করুন।"

সমর্থকদের উৎসাহ পেয়ে আবূ জাহলও দেরি করল না। পরদিন ঠিকই ভারী একটি পাথর নিয়ে অপেক্ষায় রইল। নবি ﷺ যথারীতি কা'বায় এসে সালাতে দাঁড়ালেন।

[১৪৬] ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, ৮/১৩৮; বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ২/৩৩৯।

[১৪৭] শাইখ আবদুল্লাহ, মুখতাসারুস-সীরাহ, ১১৩।

কা'বার চারপাশে জায়গায় জায়গায় জটলা পাকিয়ে বসে ছিল কুরাইশরা। আবূ জাহল কী করে, তা দেখতে সবাই অপেক্ষমাণ। আবূ জাহল কার্যসমাধা করতে এগিয়ে গেল ঠিকই। কিন্তু পরক্ষণেই পেছনে ঘুরে দিল দৌড়। চেহারা ফ্যাকাসে, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত, হাতে তখনো শক্ত করে ধরা সেই পাথর। কুরাইশরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাকে ধরে শান্ত করল। জিজ্ঞেস করল, "আবুল হাকাম, হঠাৎ কী হলো?"

সে বলল "আমি তো কথামতো কাজ করতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে একটা উট এসে হাজির। আল্লাহর কসম! এত বড় মাথা, গলা আর দাঁতওয়ালা উট আমি জীবনেও দেখিনি। আমাকে খেয়ে ফেলতে আসছিল ওটা।"

নবি ﷺ পরে বলেছিলেন, "সেটা আসলে জিবরীল ছিল। যদি সে আমার নিকটবর্তী হতো তাহলে সে তাকে ধরে ফেলত।"[১৪৮]

তবে এতকিছুর পরও অন্যান্য কুরাইশ নেতারা আবূ জাহলের অভিজ্ঞতা থেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি। একদিন নবিজি ﷺ কা'বা তওয়াফ করছিলেন। আশপাশে থাকা কুরাইশরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে টিটকারি মারতে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যত বিরক্ত হন, তাদের টিটকারি-মশকরা তত বাড়ে। অবশেষে আল্লাহর রাসূল থেমে তাদের মুখের ওপর বললেন, "হে কুরাইশের লোকসকল, তোমরা কি শুনছ? যেই সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! আমি তোমাদের হত্যা ও যবাই করার আদেশ নিয়ে এসেছি!"[১৪৯]

নবিজির মুখে এমন কথা শুনে মশকরাকারীদের বুক ধক করে ওঠে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারা নরম-সরম কথা বলে মুহাম্মাদ ﷺ-কে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে।

পরদিন আবার ওই একই লোকেরা নতুন করে সাহস সঞ্চয় করে কা'বায় আসে। বলাবলি করতে থাকে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে। একটু পর নবিজি ﷺ হাজির হতেই তেড়েফুঁড়ে এল তারা। নবিজির জামা টানতে টানতে বলল, "তুই-ই তো সেই লোক না, যে আমাদের বাপ-দাদাদের দেবতাদের ভুলে যেতে বলে?"

নবি ﷺ একটুও ভয় না পেয়ে বলেন, "হ্যাঁ। আমিই সেই লোক।"

উন্মাদ হয়ে থাকা জটলাটার কেউ তাঁকে ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে, কেউ ছোটায় গালির তুবড়ি। নবিজির গলার কাপড় টেনে ধরে উকবা ইবনু আবী মু'আইত তাঁর শ্বাসরোধ

[১৪৮] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/২৯৮-২৯৯।
[১৪৯] ইবনু হিব্বান, ৬৫৬৭; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১১/২০৩।

করে ফেলার জোগাড় করে। কোলাহল শুনে দৌড়ে আসেন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। উকবার কাঁধে সজোরে টান দিয়ে তার কাছ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-কে ছাড়িয়ে নেন। তারপর প্রতিটা ব্যক্তিকে টেনেটুনে নবিজির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকেন। বলেন, "ওরে হতাভাগার দল! তোমাদের জন্য আফসোস! একজন মানুষ আল্লাহকে নিজের রব বলছে দেখেই বুঝি তোমরা তাকে মেরে ফেলতে চাও?"

উত্তেজিত মুশরিকরা এবার নবিজি ﷺ-কে ছেড়ে দিয়ে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ধরল। নবিজিকে নিরাপদ রাখতে তিনি জীবন দিতেও প্রস্তুত। সেদিন আবূ বকরকে এত মারা হয় যে, তাঁর চেহারা থেকে নাক আলাদা করে বোঝা যাচ্ছিল না। তাঁর গোত্র বানূ তাইমের লোকেরা তাঁকে পরে জড়াজড়ি করে ঘরে পৌঁছে দেয়। সবাই ধরেই নিয়েছিল যে, তিনি পরেরদিন পর্যন্ত আর বাঁচবেন না।

কিন্তু আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেদিন সন্ধ্যায়ই কথা বলতে আরম্ভ করেন। সন্ধ্যায় জ্ঞান ফেরার পর প্রথমেই জানতে চান মুহাম্মাদ ﷺ কেমন আছেন। এত প্রাণপণ ভক্তি দেখে প্রচণ্ড তিরস্কার করে গোত্রের লোকেরা। নিজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা তো দূরের কথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার আগে তিনি সেদিন খাবার-পানিও ছুঁয়ে দেখেননি। ওই আঁধারের মাঝেই তাঁকে দারুল আরকামে নিয়ে যাওয়া হয়। নবিজিকে জীবিত ও সুস্থ দেখে তারপরেই তিনি খাবার-পানীয় গ্রহণ করেন।[১৫০]

হিজরতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগ পর্যন্ত আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) মুহুর্মুহু নির্যাতনের শিকার হন। অবশেষে একদিন আবিসিনিয়ার উদ্দেশে মক্কা ছেড়ে রওনা দেন তিনি। পথে 'বারক গিমাদ' নামক একটি জায়গা পড়ে। সেখানে দেখা হয় মালিক ইবনুদ দাগিনার সাথে। তিনি বিখ্যাত 'কারা' ও 'আহাবীশ' গোত্রের নেতা। আবূ বকরের মক্কাত্যাগের কারণ জানতে চান মালিক। সব শুনে নাখোশ হয়ে বলেন,

"আপনি অভাবীদের কত সাহায্য করেন, পরিবারের সাথে ভালো আচরণ করেন, অভাগাদের বোঝা বয়ে নেন, মেহমানের কদর করেন, সত্যের জন্য কষ্ট সহ্য করা মানুষদেরও আশ্রয় দেন। আপনার মতো মানুষকে আবার বহিষ্কার করে কীভাবে? এক কাজ করুন। আপনি আমার সাথে চলুন। নিজের শহরেই নিজের রবের উপাসনা করবেন, আসুন।"

মালিকের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি মেনে নেন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। দু'জনে একসাথে ফিরে যান মক্কায়। মালিক ঘোষণা করে দেন যে, তিনি আবূ বকরকে নিরাপত্তা

[১৫০] বুখারি, ৩৮৫৬; ইবনু হিশাম, ১/২৮৯-২৯০; সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ৫/৬৫৫।

দিয়েছেন। তবে শর্ত হলো যে, তিনি শুধু ঘরের ভেতর লোকচক্ষুর আড়ালে সালাত আদায় করবেন। পৌত্তলিকরা কিছুটা হলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। ইসলামের প্রকাশ্য প্রচারণা দেখে তাদের নারী, শিশু এবং সরল মানুষেরা কখন বিগড়ে যায়, এ নিয়ে তারা বেশ ভয়েই থাকত।

আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) কিছুদিন সে শর্ত মেনে চলেন। পরে একদিন বারান্দায় সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত করতে শুরু করেন। ফলে আবারও মানুষজন তাঁকে ইবাদাতরত অবস্থায় দেখতে পায়। ইবনুদ দাগিনা সে খবর পেয়ে তাঁকে নিরাপত্তার শর্তের কথা মনে করিয়ে দেন। আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ভেবেচিন্তে অবশেষে ইবনুদ দাগিনার প্রতিশ্রুতি বাতিল করে ফেলেন। তিনি বলেন, "আমার রবের দেওয়া নিরাপত্তা পেয়েই আমি খুশি।"

আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই ভক্তি কোনও লোকদেখানো বিষয় নয়। তাঁর অন্তর ছিল সত্যিই কোমল। তিনি অত্যধিক কান্নাকাটি করতেন। আল্লাহর পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি, শাস্তির হুমকি, সৃষ্টিজগতের বর্ণনা, আগেকার নবিদের ঘটনা কুরআনে পড়তে পড়তে অশ্রুসজল হয়ে উঠত তাঁর চোখ। কুরআনের প্রতি এই আবেগ দেখে মুশরিকদের নারী ও শিশুরা তাঁর আশপাশে ভিড় জমাত, তাঁকে কাঁদতে দেখে তারাও কাঁদত এবং তন্ময় হয়ে শুনত। গোঁয়ার মুশরিকদের কাছে এই জিনিস আবার অসহনীয় হয়ে উঠতে থাকে। এর কারণেও তারা আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে কষ্ট দিত।[১৫১]

কিন্তু ইসলামের প্রতি এই কঠোর অবস্থান সকল মক্কাবাসীর বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিছু মানুষ ছিলেন পৌত্তলিক সমাজে স্তম্ভের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নবিজির বার্তা নিয়ে একান্তে ভাবতে গেলে এদের অন্তরের পাথর ঠিকই গলতে শুরু করত। গোটা কুরাইশদের বিরোধিতার মুখেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অটল সাহস ও অবিচল ধৈর্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন তাঁরা। এ-রকম কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম গ্রহণ করেন হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব এবং উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)। ইসলামের ইতিহাসে এ দু'জনের মুসলিম হওয়ার ঘটনা এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এদের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের শক্তি কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল।

হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণ

একবার সাফা পর্বতের কাছেই নবিজি ﷺ-এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল আবূ জাহল। তাঁকে দেখতে পেয়ে বিশ্রীভাবে অপমান করে বসল সে। কিছু সূত্রে আরও জানা যায় যে,

[১৫১] বুখারি, ৩৯০৫।

একটি পাথর ছুড়ে সে নবিজির মাথা রক্তাক্তও করে দিয়েছিল। চিরধৈর্যশীল রাসূলুল্লাহ ﷺ এবারও কোনও প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। আবূ জাহল খুশিমনে কা'বা প্রাঙ্গণে গিয়ে কুরাইশদের এক বৈঠকের সাথে বসল। ওদিকে আবদুল্লাহ ইবনু জুদআনের এক দাসী দেখে ফেলেছে এই অপ্রীতিকর ও অমানবিক আচরণ।

এর কিছুক্ষণ পরের ঘটনা। শিকার শেষে ধনুক হাতে ঘরে ফিরলেন নবিজির চাচা হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব। কথায় কথায় নবিজির সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি তাঁকে বলে দিল সেই দাসী। হামযা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আবূ জাহলকে গিয়ে বললেন, "এই হতভাগা, তোর এত বড় সাহস! আমার ভাতিজাকে গালি দিয়েছিস আবার তাঁকে মেরেছিস! জানিস না, আমিও ওর ধর্মের অনুসারী?" এই বলে ধনুক দিয়ে বাড়ি মেরে আবূ জাহলের মাথা ফাটিয়ে দিলেন তিনি। আবূ জাহলের গোত্র বানূ মাখযূম আর হামযার গোত্র বানূ হাশিম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল এ ঘটনায়। আবূ জাহল তার স্বগোত্রীয়দের এই বলে শান্ত করল, "থাক, বাদ দাও। আবূ আম্মারাকে (হামযার উপনাম) যেতে দাও। আসলেই আমি তার ভাতিজাকে খুব খারাপ গালি দিয়েছিলাম।"[১৫২]

হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই আচমকা ধর্মান্তর অবশ্য পারিবারিক মর্যাদাবোধের কারণে চলে আসা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। অথচ এই ঘটনাটির আগে নবিজি ﷺ-এর ছয় বছরের দাওয়াতি কার্যক্রম একবারও হামযার মনে কোনও দোলা দেয়নি। কিন্তু ক্রমেই তাঁর মনে ইসলামের প্রতি ভালোবাসার শক্ত শেকড় গাড়তে থাকে। একসময় হামযা অবাক বিস্ময়ে দেখলেন যে, দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা তাঁর বংশীয় জাত্যাভিমানকেও ছাড়িয়ে গেছে। নিছক আত্মীয়তার টান ছাপিয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান তাঁর অন্তরে এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, ইসলামে তাঁর অবদানে তিনি আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) উপাধি লাভ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন নুবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের যুল-হিজ্জাহ মাসে।

উমর ইবনুল খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ

উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুসলিম হওয়ার ঘটনা ইসলমি ইতিহাসের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়গুলোর একটি। দীর্ঘদেহী ও বলবান এই মানুষটি পরিচিত ছিলেন কড়া মেজাজি ও কবিতাপ্রেমী হিসেবে। সেই সাথে ইসলামের সাথে ছিল তার মারাত্মক শত্রুতা। হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাত্র তিন দিন পরেই উমর ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

[১৫২] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/২৯১-২৯২।

কা'বায় নবিজি ﷺ-এর তিলাওয়াত করা কিছু আয়াত মাঝেমাঝে উমরের কানেও এসেছিল। মনেও একটু নাড়া পড়েছিল সে আয়াতগুলো শুনে। কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় তাঁর হৃদয় তখনো ইসলাম ও নবি ﷺ-এর শত্রুতায় বদ্ধপরিকর। এমনকি একদিন এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, তিনি তরবারি নিয়ে পুরোপুরি প্রস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার জন্য। সৌভাগ্যবশত, ওই তৎপরতাকে কাজে রূপ দিতে পারেননি তিনি।

মুষ্টিতে তলোয়ার আর অন্তরে বিদ্বেষ নিয়ে চলছেন উদ্দেশ্য পূরণ করতে। মাঝপথে নুআইম ইবনু আবদিল্লাহর সাথে দেখা। নুআইম বললেন, "কোথায় যাচ্ছেন?"

"মুহাম্মাদকে যবাই করে ফেলব", উমরের জবাব।

"বানূ হাশিম আর বানূ যুহরা যদি প্রতিশোধ নিতে আসে?"

কথাটা যেন উমরের কাছে চ্যালেঞ্জের মতো লাগল। রাগত স্বরে বললেন, "আপনিও বিধর্মী হয়ে গেছেন নাকি?"

নুআইম পাল্টা বললেন "আমার কথা ছাড়ুন। আপনার বোন আর বোন-জামাই-ই তো নিজ ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে।"

রাগের চোটে উমর ভুলেই যান নবিজি ﷺ-এর কথা। ছুটে যান বোন ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে। ঠিক সেই সময় খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত (রদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন ফাতিমার ঘরে, সূরা ত্ব-হা শেখাচ্ছিলেন তাদের। উমরের আসার শব্দ পেয়েই খাব্বাব লুকিয়ে পড়েন। সূরা লেখা পাতাগুলোও দ্রুত লুকিয়ে ফেলেন ফাতিমা।

"কী বিড়বিড় করছিলি তোরা?" সশস্ত্র উমরের জিজ্ঞাসা।

"কই? কিছু না তো! এমনি কথা বলছিলাম।"

"তোরা দু'জনই বিধর্মী হয়ে গেছিস, না?"

উমরের বোন-জামাই এবার বললেন, "আচ্ছা উমর, আপনিই বলুন। আপনার ধর্ম যদি সত্য থেকে বহু দূরে থাকে, তাহলে আর কীই-বা করার আছে?" কথা শেষ না হতেই উমর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে প্রহার করতে থাকেন। ফাতিমা বাধা দিতে এলে তাঁর মুখেও আঘাত করে রক্তাক্ত করে ফেলেন। কিন্তু উমরের বোন তখন সত্য উচ্চারণে আর ভীত নন। স্বামীর সাথে গলা মিলিয়ে তিনিও উমরের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুললেন, "উমর, সত্য যদি তোমার ধর্ম থেকে বহু দূরে থাকে, তাহলে কী করবে?"

তারপর ভাইকে শুনিয়ে দিলেন কালিমা শাহাদাত, জানিয়ে দিলেন নিজের ঈমান গ্রহণের কথা, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

বোনের এই দৃপ্ত ঘোষণা উমরকে লজ্জায় ফেলে দেয়। এবার একটু নরম হয়ে বললেন, "আচ্ছা, কী যেন পড়ছিলে, ওইটা একটু দেখি?"

বোন এবার কড়া স্বরে বললেন, "তুমি তো নাপাক। পাক-পবিত্র না হয়ে কেউ এটা ছুঁতে পারে না। যাও, পবিত্র হয়ে এসো।"

অনুশোচনায় দগ্ধ উমর গোসল করে এলেন। সূরা ত্ব-হা লেখা পাতাগুলো নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। অতঃপর যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন—

﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾﴾

> "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। অতএব, আমারই উপাসনা করো এবং আমার স্মরণে সালাত প্রতিষ্ঠা করো।"[১৫৩]

তখন বলতে লাগলেন, "এ তো অনেক উত্তম ও বড় সম্মানিত কালাম। আমাকে মুহাম্মাদের ঠিকানা বলে দাও।"

এ কথা শুনে খাব্বাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) লুকানো স্থান থেকে বেরিয়ে আসেন। বলেন, "উমর, সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আমার ধারণা নবি ﷺ-এর দুআ আপনার ব্যাপারে কবুল হয়েছে। গত জুমুআ রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করেছেন, 'ইয়া আল্লাহ, উমর ইবনুল খাত্তাব এবং আবূ জাহল ইবনু হিশামের মধ্যে যে আপনার নিকট বেশি প্রিয় তার মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।'"

এরপর তিনি বলে দিলেন, নবিজি ﷺ সাফা পর্বতের পাশে আরকামের ঘরে অবস্থান করছেন। জানতে পেরে উমর সেখানে ছুটে যান। দরজায় টোকা শুনে একজন সাহাবি দরজার ফাঁক দিয়ে উমরকে দেখতে পান, উত্তেজিত দেহভঙ্গি, হাতে তরবারি! পড়িমড়ি করে ভেতরে ছুটে গিয়ে তিনি সবাইকে সতর্ক করে দেন।

"ব্যাপার কী?" হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন।

"দরজায় উমর দাঁড়িয়ে আছে।" ভীত কণ্ঠে সেই সাহাবির অনুযোগ।

---

[১৫৩] সূরা ত্বহা, ২০ : ১৪।

হামযা বললেন, "ওহ! এই ব্যাপার? যদি সে ভালো উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তাহলে তো ভালোই। আর তা না হলে ওর তরবারি দিয়েই আজ ওকে শেষ করে দেবো।"

ঠিক সেই সময় মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর ওহি অবতীর্ণ হচ্ছিল। ওহি অবতরণ শেষে বসার ঘরে এলেন তিনি। এসেই দেখেন উমর সেখানে বসা। নিজেই এগিয়ে গিয়ে উমরের কাপড় ধরে ঝাঁকি দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "ওহে উমর, কেন ফিরে আসতে দেরি করছ? ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাকে আল্লাহ যেভাবে শায়েস্তা করেছেন, সে-রকম কিছুর অপেক্ষায় আছ? হে আল্লাহ, এই হলো উমর ইবনুল খাত্তাব! ওর মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী ও গৌরবান্বিত করুন!"

নবিজি ﷺ-এর দুআ শেষ হতেই উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনও উপাস্য নেই। আর আপনি আল্লাহর রাসূল।"

উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম উঁচু স্বরে "আল্লাহু আকবার!" বলে উঠলেন। যার ধ্বনি কা'বা প্রাঙ্গণ থেকেও শোনা গিয়েছিল।[১৫৪]

উমর ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণে মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া

গায়ে-গতরে আর মন-মেজাজে উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সমকক্ষ কেউ নেই। মুসলিম হওয়ার পর তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল নবিজি ﷺ-এর শত্রুদের কাছে নিজের পরিবর্তনের খবরটা পৌঁছে দেওয়া। সেই দুর্ভাগাদের মাঝে স্বাভাবিকভাবেই আবূ জাহল নির্বাচিত হলো একদম প্রথম ব্যক্তি হিসেবে।

আবূ জাহলের বাড়ির দরজায় করাঘাত করলেন উমর। দরজা খুলে হাসিমুখে অভিবাদন জানাল সে, "আহলান ওয়া সাহলান! কী উদ্দেশ্যে আগমন?"

উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) জবাব দিলেন, "এলাম একটি সংবাদ দিতে—আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের ধর্ম মেনে নিয়েছি।"

আবূ জাহলের মাথায় যেন বাজ পড়ল। সাথে সাথে দরজা লাগিয়ে দিতে দিতে বলল, "আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুক এবং তুমি যা কিছু নিয়ে এসেছ তারও অমঙ্গল হোক।"[১৫৫]

এরপর উমর গেলেন তাঁর মামা আসি ইবনু হিশামের ওখানে। দুঃসংবাদখানা শুনেই সে

---

[১৫৪] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৩৪৩-৩৪৬; ইবনুল জাওযি, তারীখু উমর ইবনিল খাত্তাব, ৭-১১।

[১৫৫] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৩৪৯-৩৫০।

ঘরে ঢুকে দরজা আটকে গা ঢাকা দিল।[১৫৬]

উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর তৃতীয় নিশানা জামীল ইবনু মুআম্মার জুমাহি। এই লোকটি কোনও মজার খবর পেলে মুহূর্তে তা রাষ্ট্র করে দিতে ওস্তাদ। উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা শোনামাত্র কাজে নেমে পড়ল জামীল। চিৎকার করে বলতে লাগল, "খাত্তাবের ছেলে বিধর্মী হয়ে গেছে! খাত্তাবের ছেলে বিধর্মী হয়ে গেছে!"

উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) সংশোধন করে বললেন, "এ মিথ্যে বলছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি!"

জামীলের চিৎকার শুনে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল মানুষজন। কেউ কেউ এসে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে মারতে লাগল। উমরও কম যান না। তিনিও তাদের পাল্টা মার দিতে আরম্ভ করলেন। এভাবে দুপুর পর্যন্ত মারামারি চলল। অবশেষে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন।[১৫৭]

হতবিহ্বল মুশরিকরা বলাবলি করতে লাগল কী করা যায়। সিদ্ধান্ত নিল উমরের বাসায় গিয়ে আজ মেরেই ফেলবে তাঁকে। সে উদ্দেশ্যেই দল বেঁধে রওনাও দিল সবাই।

ওদিকে আস ইবনু ওয়াইল সাহমির সাথে কথা বলছেন উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। এই আসের বংশ বানূ সাহমের সাথে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বংশ বানূ আদির সম্পর্ক বেশ ভালো।

"আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এই কারণে তোমার সম্প্রদায় আমাকে মেরে ফেলতে চায়", আসকে বললেন উমর।

"অসম্ভব!" এটুকু বলতেই আস দেখলেন উত্তেজিত জনতা এদিকেই ধেয়ে আসছে।

আস ইবনু ওয়াইল তাদের পথরোধ করে বললেন, "দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছো?"

উত্তেজিত জনতা জবাব দিল, "আপনি শোনেননি, খাত্তাবের ছেলে তো বিধর্মী হয়ে গিয়েছে।"

আস ইবনু ওয়াইল বললেন "তার কাছে যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই!" থতমত খেয়ে তাঁর দিকে তাকাল জনতা। সমীহ উদ্রেককারী গড়ন, আর পরনে ডোরাকাটা ইয়েমেনি পোশাক। কথাটার মাঝে সুপ্ত হুমকি বুঝতে পেরে সবাই নিজ নিজ বাড়ির পথ ধরল।[১৫৮]

---

[১৫৬] ইবনুল জাওযি, তারীখু উমর, ৮।

[১৫৭] তাবারানি, আওসাত, ২/১৭২, ইবনু হিব্বান, ৯/১৬; ইবনু হিশাম, ১/৩৪৮-৩৪৯।

[১৫৮] বুখারি, ৩৮৬৪।

উমর ﷺ-এর কারণে মুসলমান ও ইসলামের শক্তিবৃদ্ধি

এতদিন মুসলিমরা সালাত আদায় করেছে গোপনে। প্রকাশ্যে এ কাজ করা মানেই গালাগাল ও মারধরের ঝুঁকি। কিন্তু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) উপলব্ধি করলেন, এখন দিনবদলের সময় এসেছে। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, বাঁচি বা মরি, সত্য কি আমাদের পক্ষে না? জবাব দিলেন, "অবশ্যই।"

"তাহলে আমরা লুকিয়ে থাকছি কেন? আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আমরা আর গোপন থাকব না, বেরিয়ে আসব।"

উমরের কথাই বাস্তব হলো। সিদ্ধান্ত হলো যে, এখন আর কোনও গোপনীয়তা না। নবি ﷺ-এর পেছন পেছন দুই সারিতে আবদ্ধ হয়ে দিনদুপুরে কা'বার দিকে হেঁটে চললেন সাহাবিরা। একটি সারির পুরোভাগে হামযা, আরেকটিতে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)। মক্কাবাসীরা স্রেফ চেয়ে চেয়ে দেখল নবিজি ﷺ-এর ইমামতিতে সাহাবিদের প্রকাশ্যে সালাত আদায়ের দৃশ্যটি। এর বেশি তাদের কিছুই করার ছিল না। সেদিন থেকে উমরের উপাধি হলো 'ফারূক', সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী।[১৫৯]

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "উমর যেদিন ইসলাম গ্রহণ করলেন, সেদিন আমরা শক্তি ও সম্মান দুই-ই অর্জন করলাম...উমরের ইসলাম গ্রহণের আগে আমরা কখনোই কা'বায় প্রকাশ্যে সালাত আদায় করতে পারিনি।"[১৬০]

আরেক সাহাবি সুহাইব (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "উমর যেদিন ইসলাম গ্রহণ করলেন, ইসলাম সেদিন প্রকাশ পায়। আমরা খোলাখুলি দাওয়াত দেওয়া, কা'বায় জামাআতে সালাত পড়া ও তওয়াফ করতে শুরু করলাম। আমাদের নির্যাতন করা প্রতিটা ব্যক্তির ওপর সে প্রতিশোধ নিত এবং তাদের জুলুম-অত্যাচারের জবাব দিত।"[১৬১]

লোভনীয় প্রস্তাব

উমর এবং হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ইসলাম গ্রহণে দৃশ্যপট বেশ পাল্টে গেছে। কুরাইশরা ইসলামের শক্তিবৃদ্ধি দেখে সমঝোতা-পরিকল্পনার দিকে পা বাড়ায়। যা করার দ্রুত করতে হবে। পায়ের তলার মাটি যে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, তা বুঝতে

[১৫৯] ইবনুল জাওযি, তারীখু উমর, ৬-৭।

[১৬০] বুখারি, ৩৬৮৪।

[১৬১] ইবনুল জাওযি, তারীখু উমর, ১৩।

আর বাকি নেই তাদের।

বানূ আবদি শামসের এক ব্যক্তি উতবা ইবনু রবীআ। আপন গোত্রের নেতা সে। মক্কায় বেশ সম্মানিত ব্যক্তিও বটে। শহরের অন্যান্য হোমরাচোমরা ব্যক্তিদের সাথে বৈঠকে বসেছে সে। আলোচনার বিষয়বস্তু মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর ক্রমবর্ধমান অনুসারীগণ। উতবা বলল, "আচ্ছা, মুহাম্মাদের সাথে কথা-টথা বলে একটু দর কষাকষি করলে কেমন হয়? সে তো মেনেও নিতে পারে। তাহলেই এই উটকো ঝামেলা থেকে আমরা বেঁচে গেলাম।"

সভায় প্রস্তাবটি পাশ হলো। উতবার কাঁধেই দেওয়া হলো নবিজি ﷺ-এর সাথে কথা বলার দায়িত্বটি। সে এমন এক প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো, যা কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কা'বায় মুহাম্মাদ ﷺ-কে একা বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এল উতবা। বলল,

"ভাতিজা, কী খবর? আচ্ছা একটু কথা বলি। শহরে তো তোমার মান-সম্মান ভালোই। বংশের দিক দিয়েও তুমি আমাদের মধ্যে সেরা। এখন তুমি কিন্তু মারাত্মক এক জিনিস নিয়ে এসেছ। তোমার আপন মানুষদের মধ্যেই কী রকম বিভেদ হয়ে যাচ্ছে, দেখছই তো। তাচ্ছিল্য করা, ওদের দেব-দেবী আর ধর্মকে অপমান করা, বাপ-দাদাদের মূর্খ-বিধর্মী বলা, তাদের কৃষ্টি-কালচার ত্যাগ করা, কিছুই বাদ রাখোনি। তাই বলছিলাম কী, আমার কিছু পরামর্শ আছে। শুনে দেখো, হয়তো ভালোও লাগতে পারে।"

নবি ﷺ জবাব দিলেন "বলুন, আবুল ওয়ালীদ, আমি শুনছি।"

"ভাতিজা, তুমি আসলে এসব করে চাচ্ছটা কী? আমাদের বলো, ব্যবস্থা করে দেবো। যদি সম্পদ লাগে, বলো। সবাই মিলে তোমাকে এত সম্পদ জোগাড় করে দেবো যে, তোমার চেয়ে বড়লোক আর কেউ থাকবে না। মান-মর্যাদা লাগবে? বলো। তোমাকে নেতা বানিয়ে দেবো, সব সিদ্ধান্ত আর ফায়সালা তুমিই দেবে। রাজা হতে চাও? বলো। আমরা তোমাকে আমাদের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দেবো। নাকি সুন্দরী নারী লাগবে? লাগলে সেটাও বলো। কুরাইশের যেকোনও মেয়ে বেছে নাও। আমরা অমন আরও দশ জনকে বিয়ে করিয়ে দেবো তোমার সাথে। আর যদি জিনের আছর হয়ে থাকে, তাহলে তাও নির্ভয়ে বলো। আমরা সবচেয়ে দক্ষ ওঝা ডাকিয়ে যত খরচ লাগে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবো।"

নবি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?"

উতবার জবাব, "হ্যাঁ শেষ।"

"তাহলে এবার আমার কথা শুনুন।"

"ঠিক আছে বলো, শুনছি।"

রাসূল ﷺ তখন সূরা ফুসসিলাতের শুরুর দিকের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতে শুরু করেন,

> حم ﴿١﴾ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴿٥﴾

> "হা-মীম। এটি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা আয়াত-সংবলিত এক কিতাব। আরবি ভাষায় কুরআনরূপে, বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেদের জন্য। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। অথচ তাদের বেশির ভাগই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শোনেও না। তারা বলে, 'তুমি যা গ্রহণ করতে বলছ, তা থেকে আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত, কান বধির, তোমার ও আমাদের মাঝে রয়েছে পর্দা। তুমি তোমার কাজ করে যাও, আমরা আমাদের।"[১৬২]

নবিজি ﷺ তিলাওয়াত করে চললেন। উতবাও শুনতে লাগল। একসময় রাসূল ﷺ এই আয়াতে এলেন,

> فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿٣١﴾

> "তারা বিমুখ হলে বলে দিও, 'আদ এবং সামূদের প্রতি যেমন বজ্রাঘাত এসেছিল, তেমনই এক বজ্রাঘাতের ব্যাপারে তোমাদের সতর্ক করে দিলাম।"[১৬৩]

আবেগাপ্লুত উতবা মুহাম্মাদ ﷺ-এর মুখে হাত রেখে অনুনয় করতে লাগল, যেন সেই ভয়ংকর শাস্তি নিয়ে না আসা হয়। সাজদার একটি আয়াত এলে নবি ﷺ সাজদা দিলেন। তারপর তিলাওয়াত শেষ করে বললেন, "আবুল ওয়ালীদ, শুনলেন তো?"

---

[১৬২] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১-৫।

[১৬৩] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১৩।

উতবার জবাব, "হ্যাঁ, আমি শুনেছি।"

"এবার সিদ্ধান্ত আপনার।"

উতবা উঠে সোজা চলে গেল তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে। দূর থেকেই সবাই খেয়াল করল যে, উতবার চেহারায় অদ্ভুত এক আবেগ। কাছে এসে সে বলল, "আল্লাহর কসম! উতবা ওই চেহারা নিয়ে ফেরেনি যেই চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল।" এরপর সে তাদের মাঝে বসে পড়ল এবং পুরো ঘটনা বর্ণনা করে বলল,

"এ রকম বাণী আমি আমার জিন্দেগিতে শুনিনি। আল্লাহর কসম! কুরাইশ, এটা কবিতাও না, জাদুটোনার প্রভাবও না। লোকটাকে তার নিজের মতো থাকতে দাও। আল্লাহর কসম! যা শুনলাম, তার চেয়েও অবাক করা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এখন আরবরা যদি ওকে মেরেই ফেলে, তাহলে তো তোমাদের আর কিছু করা লাগল না। আর যদি এই লোক সারা আরবকে তোমাদের অধীনে নিয়ে আসে, তাহলে ওর রাজত্ব তো তোমাদেরই রাজত্ব। ওর সম্মান মানে তোমাদেরও সম্মান। আখেরে তোমাদের জন্য ভালোই হবে।"

শ্রোতাদের সন্দেহ বেড়ে গেল, "আপনিও দেখি তার কথার জাদুতে আটকে গেছেন!"

উতবার জবাব, "আমার যা বলার বলে দিয়েছি, এখন তোমাদের যা খুশি করো।"[১৬৪]

সমঝোতা চেষ্টা

মুশরিকরা ভাবল, মুহাম্মাদকে নাহয় ওর ধর্ম ত্যাগ করানো গেল না। কিন্তু বলে-কয়ে একটু সমঝোতা তো করা যায়।

যেই ভাবা সেই কাজ। মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে একদল লোক এসে বোঝাতে লাগল কীভাবে উভয়পক্ষকেই খুশি রাখা যায়। "এইবার এমন এক প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, যা সব সমস্যা নিমেষেই সমাধা করে ফেলবে।" সগর্বে দাবি করল তারা।

নবি ﷺ জানতে চাইলেন, "আচ্ছা! কী সেটা?"

তারা বলল, "আপনি এক বছর আমাদের দেব-দেবীর উপাসনা করবেন, আর আমরা এক বছর আপনার উপাস্যের উপাসনা করব। যদি আমাদের ধর্ম সত্য হয়, তাহলে আপনিও পুণ্যের একটা অংশ পেলেন। আর যদি আপনারটা সত্য হয়, তাহলে আমরাও পুণ্য পেলাম।"

---

[১৬৪] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/২৯৪।

কুরাইশদের এ প্রস্তাবের জবাবে নাযিল হলো সূরা কাফিরূন:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿٦﴾

"বলে দিন, হে অবিশ্বাসীরা, তোমরা যার উপাসনা করো, আমি তার উপাসনা করি না। তোমরাও তার উপাসনা করো না, যার উপাসনা আমি করি। আমি কিছুতেই তার উপাসক হব না, যার উপাসক তোমরা। তোমরাও তার উপাসক হবে না, যার উপাসক আমি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমারটা আমার।"[১৬৫]

তাওহীদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা আরও নাযিল করেন,

قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُوْنِّيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾

"বলে দিন, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করতে বলছ, হে অজ্ঞের দল!"[১৬৬]

এ আয়াতটিও কুরাইশদের এ প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ। এখানে কথাটি আরও স্পষ্ট করা হয়েছে:

قُلْ إِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ

"বলে দিন, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যার দাসত্ব করো, তার দাসত্ব করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।"[১৬৭]

পৌত্তলিকরা তখনো আশায় আছে যে, নবিজি ﷺ-কে একটু হলেও টলানো যাবে। তাই তারা নবিজির প্রতিটি কথা মানবে বলে ইঙ্গিত দেয়। তাঁর প্রতি নরম হয়। তবে একটি বাড়তি শর্ত আরোপ করে,

ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ

---

[১৬৫] সূরা কাফিরূন, ১০৯ : ১-৬।
[১৬৬] সূরা যুমার, ৩৯ : ৬৪।
[১৬৭] সূরা আনআম, ৬ : ৫৬।

> “তাহলে এটার বদলে অন্য একটা কুরআন নিয়ে আসুন। অথবা এখনকারটাতে কিছু কথা পরিবর্তন করে দিন।”[১৬৮]

প্রত্যুত্তরে নবিজি ﷺ-কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানিয়ে দেন,

> قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥١﴾

> “আপনি ওদের বলে দিন, ‘একে ইচ্ছেমতো নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করার অধিকার আমি রাখি না। আমি সে নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালককে অমান্য করি, তাহলে কিয়ামাতের দিন এক ভয়ংকর শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার ভয় করি।”[১৬৯]

এভাবে আরও বেশ কিছু আয়াতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় যে, মুশরিকদের সাথে দরকষাকষি করাটা নবি ﷺ-এর দায়িত্ব নয়; বরং তাঁর কাজ হলো ওহির বার্তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ও যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

> وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٣٧﴾ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٤٧﴾ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٥٧﴾

> “আমি আপনার কাছে যা অবতীর্ণ করেছি, আর একটু হলে তারা আপনাকে তা থেকে টলিয়েই ফেলত। আমার নামে মিথ্যে রচনা করাতে চেয়েছিল তারা। তারা সফল হলে আপনাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করত। আমি যদি আপনাকে অটল না রাখতাম, তবে আপনিও তাদের দিকে একটুখানি ঝুঁকে পড়তেন। আর আপনি অমনটা করলে আমি আপনাকে এই জীবনে দ্বিগুণ এবং মৃত্যুর পরও দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। আর আমার বিরুদ্ধে আপনি খুঁজে পেতেন না কোনও সাহায্যকারীকেই।”[১৭০]

---

[১৬৮] সূরা ইউনুস, ১০ : ১৫।

[১৬৯] সূরা ইউনুস, ১০ : ১৫।

[১৭০] সূরা ইসরা, ১৭ : ৭৩-৭৫।

অবশেষে মূর্তিপূজকদের বুঝে এল যে, মুহাম্মাদ ﷺ কোনও ভণ্ড ধর্মপ্রচারক নন। সমঝোতা করে তাঁকে টলানো যাবে না। তাই এবার তারা খুঁজে বের করতে চাইল যে, তিনি আসলেই নবি, নাকি এমনিই নিজেকে নবি ভেবে ভুল করছেন।

সেটা পরীক্ষা করতে ইয়াহূদি ধর্মগুরুদের কাছে ধরনা দিল তারা। ইয়াহূদি পণ্ডিতরা তাদের বলে দিলেন মুহাম্মাদ ﷺ-কে তিনটি প্রশ্ন করে দেখতে। সঠিক জবাব পেলে বোঝা যাবে যে, তিনি আসলেই নবি। আর ভুল করলে বোঝা যাবে, তিনি বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট।

আগের আসমানি কিতাবে কয়েকজন তরুণকে নিয়ে একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন—ওই ঘটনাটি কী, তা জিজ্ঞেস করা। দ্বিতীয় প্রশ্ন—পূর্ব-পশ্চিমে ভ্রমণ করা এক ব্যক্তি সম্পর্কে। আর তৃতীয় প্রশ্নটি থাকবে—আত্মা সম্পর্কে।

কুরাইশ গোত্রপতিরা নবিজি ﷺ-এর কাছে এ প্রশ্নগুলো উত্থাপন করলে আল্লাহ তাআলা সূরা কাহফ নাযিল করেন। এ সূরায় একদল যুবকের ঘটনা বলা হয়, যারা স্বজাতীয় পৌত্তলিকদের নির্যাতন থেকে বাঁচতে একটি গুহায় আশ্রয় নেন। আল্লাহ তাঁদের অলৌকিকভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। তারপর কয়েক শ বছর পর তাঁদের জীবিতাবস্থায় জাগিয়ে তোলেন কিয়ামাতের নিদর্শন হিসেবে। একই সূরায় বর্ণিত হয় বিশ্বজয়ী সম্রাট যুলকারনাইনের ঘটনাও। আর তৃতীয় ও শেষ প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হয় সূরা ইসরায়,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

"তারা আপনাকে রূহ (আত্মা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, 'রূহ হলো আমার প্রতিপালকের আদেশ। এ ব্যাপারে তোমাদের সামান্যই জানানো হয়েছে।"[১৭১]

তিনটি প্রশ্নেরই জবাব নাযিল করে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নুবুওয়াত-সংক্রান্ত সব সন্দেহের মূল উপড়ে ফেলেন আল্লাহ তাআলা। এবার কুরাইশদের ঘাড়ে আসে কঠিন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার। তারা তখনো এত কষ্ট করে ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। এবার তাদের আবদার, তাদের যেন মুসলিম হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়, তবে সেটা হতে হবে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম। ওই গরিব-অসহায় সাহাবিদের সাথে এক সারিতে দাঁড়াতে রুচিতে বাধছে এসব গণ্যমান্য লোকদের।

---

[১৭১] সূরা ইসরা, ১৭ : ৮৫।

নবিজি ﷺ-এর সাথে দেখা করে তারা কথাটা পাড়ল। আসলে সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী লোকদেরও দরকার আছে ইসলামের উপকারার্থে। এই লোকগুলোকে তাই মুসলিম হিসেবে পেতে রাসূল ﷺ আগ্রহীও ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের ওই আবদারের পথ রুদ্ধ করে দেন,

> وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

> "যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির আশায় সকাল-সাঁঝে তাঁকে ডাকে, তাদের দূরে ঠেলে দেবেন না। আপনাকেও তাদের জন্য বিন্দুমাত্র জবাবদিহি করতে হবে না, তাদেরও আপনার জন্য বিন্দুমাত্র জবাবদিহি করতে হবে না। যদি এদের দূরে সরিয়ে দেন, তাহলে আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।"[১৭২]

সম্পদ আর বংশ বিবেচনায় কাউকে 'বিশেষ মুসলিম' উপাধি দেওয়া থেকে এভাবেই নবি ﷺ-কে নিষেধ করে দেওয়া হলো। মুসলিমদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হয়ে রইল ঈমান ও সৎকর্ম।

শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া

মানুষ ক্রমাগত সত্য অস্বীকার করতে থাকলে আল্লাহর পক্ষ থেকে চরম শাস্তি আসবে। এ ব্যাপারে সতর্ক করাও নবিজি ﷺ-এর একটি দায়িত্ব। এ সতর্কবাণী শুনেও কুরাইশরা অপেক্ষা করতে থাকে পানি কোন দিকে গড়ায়। কিছুই হচ্ছে না দেখে বাড়তে থাকে তাদের অহংকার। নবি ﷺ-কে চ্যালেঞ্জ করে বলে, পারলে শাস্তি এখনই নিয়ে আসুন। আল্লাহ এর জবাব দেন,

> وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾

> "ওরা বলছে তাড়াতাড়ি শাস্তি নিয়ে আসতে! অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকের এক দিন তোমাদের

---

[১৭২] সূরা আনআম, ৬ : ৫২।

গণনার হাজার বছরের সমতুল্য।"[১৭৩]

﴿يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ﴿٥٤﴾

"তারা আপনাকে দ্রুত আযাব নিয়ে আসতে বলে। ঠিকই একদিন কাফিরদের ঘিরে ধরবে জাহান্নাম।"[১৭৪]

أَفَأَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَّخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٧﴾

"ষড়যন্ত্রকারীরা কি এই ভয় করে না যে, আল্লাহ তাদের ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন? অথবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আযাব আসবে, যা তাদের ধারণাতীত। কিংবা চলাফেরার মধ্যেই তাদের পাকড়াও করবে, তারা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। কিংবা ভীতি প্রদর্শনের পর তাদের পাকড়াও করবেন? আসলে তোমাদের প্রতিপালক বড়ই মেহেরবান ও দয়ালু।"[১৭৫]

এবারও মক্কাবাসীরা সত্যকে পাশ কাটানোর একটা অজুহাত খুঁজে নিল। বলল, মুহাম্মাদ ﷺ সত্যিই নবি হয়ে থাকলে যেন অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখান। এভাবে কখনও সমঝোতা, কখনও অবাস্তব দাবি নিয়ে তারা আগ-পিছ করতে থাকে। অনেকেরই মনে হতে থাকে যে, তরবারি ছাড়া আর কোনও সমাধান বাকি নেই। আরেকদল আবার রক্তপাত-পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় সেটা নাকচ করে দেয়।

আবূ তালিবকে তারা আগেও অনুরোধ করেছিল, যেন মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করতে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাহ্যত তাদের হুমকির প্রতি ভীতি প্রকাশ না করলেও কুরাইশদের গোপন ষড়যন্ত্র নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তায় থাকতেন বটে। আর এর কারণও আছে। তাই আবূ তালিব দ্রুত পদক্ষেপ নিলেন। কা'বা প্রাঙ্গণে জড়ো হতে বললেন বানূ হাশিম ও বানুল মুত্তালিবের লোকজনকে। সবার থেকে দৃঢ় শপথ নিলেন, যেন তারা যেকোনও মূল্যে স্বগোত্রীয় ভাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতিরক্ষা করেন। নবিজির চাচা, ইসলামের স্বঘোষিত শত্রু আবূ লাহাব শুধু শপথ নিতে অস্বীকৃতি জানায়। কুরাইশদের

---

[১৭৩] সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪৭।
[১৭৪] সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৫৪।
[১৭৫] সূরা নাহল, ১৬ : ৪৫-৪৭।

প্রতি সে তার সমর্থন অটুট রাখার ঘোষণা দেয়।[১৭৬]

পূর্ণ বয়কট

মুশরিকরা আবূ তালিবের সাথে কূটনীতিতে হারতে নারাজ। খাইফু বানী কিনানায় সভা বসল পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে। একসময় সামাজিক বয়কটের প্রস্তাবনা উঠল। এখন থেকে বানূ হাশিম ও বানুল মুত্তালিবকে সমাজচ্যুত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। যতদিন না তারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যার জন্য মুশরিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে, ততদিন অন্য গোত্ররা এদের সাথে মেয়েদের বিয়ে দেবে না এবং তাদের মেয়েদেরও বিয়ে করবে না, তাদের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনে যাবে না, সঙ্গ দেবে না, তাদের সাথে কথাও বলবে না, এমনকি তাদের শান্তিচুক্তিও গ্রহণ করবে না।

সবাই একমত হওয়ার পর বাগীদ ইবনু আমির ইবনি হাশিম এই সিদ্ধান্তগুলো চামড়ার একটি টুকরোর ওপর লিখে দেয়। তারপর তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কা'বার দেয়ালে। এ কাজ করার জন্য নবি ﷺ তার জন্য বদদুআ করেন। ফলে বাগীদের পুরা হাত, কিংবা কয়েকটি আঙুল বিকল হয়ে যায়।[১৭৭]

বয়কট করার এই সিদ্ধান্তের ফল হয় মারাত্মক। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বানূ হাশিম ও বানুল মুত্তালিবের সকল সদস্যকে মক্কা ত্যাগ করে শিআবু আবী তালিব নামক উপত্যকায় থাকতে বাধ্য করা হয়। এই বয়কটের আওতার বাইরে থাকা একমাত্র সদস্য আবূ লাহাব। তাদের কাছে খাবার বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানায় মক্কাবাসীরা। ফলে তারা বাধ্য হন গাছের পাতা ও শেকড় খেতে। অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় যে, ক্ষুধার্ত নারী-শিশুর কান্না প্রতিধ্বনিত হতে থাকে উপত্যকাজুড়ে। গুটিকয়েক সমব্যথীদের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছিল না শাস্তির ভয় উপেক্ষা করে খাবার পৌঁছে দিতে। তবে হাকিম ইবনু হিযাম কোনোরকমে তার খালা খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে কিছু গম পাঠাতে সক্ষম হন।

নির্বাসিত গোত্রগুলোর সামনে দিয়ে গিরিপথ ধরে অনেক ব্যবসায়িক কাফেলাই পার হয়ে যায়। কিন্তু শরণার্থীরা বেরিয়ে এসে তাদের সাথে দেখা করতে পারে শুধু পবিত্র চারটি মাসে। যুল-কা'দা, যুল-হিজ্জাহ, মুহাররম ও রজব—এ মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল বলে নির্যাতিত হওয়ার ভয় ছিল না। কিন্তু মক্কাবাসীরা কাফেলাগুলো থেকে চড়া দামে পণ্য কিনতে থাকে, যাতে শরণার্থীরা প্রতিযোগিতায় পেরে না উঠে এবং দাম

---

[১৭৬] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/২৬৯।

[১৭৭] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ২/৪৬; বুখারি, ১০৯০।

খুব বেশি পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়, যাতে তারা কিছু ক্রয়ও করতে না পারে।

এত অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যেও রাসূল ﷺ অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো থামাননি। বিশেষ করে হাজ্জ মৌসুমে তাঁর তৎপরতা বেড়ে যেত। আরবের নানা প্রান্ত থেকে আসা গোত্রগুলোর সাথে দেখা করতে যেতেন তিনি এ সময়টিতে।

চুক্তিপত্রের বিনাশ ও বয়কটের সমাপ্তি

তিন বছরের অনাহার ও কষ্টের পর বানূ হাশিম ও বানুল মুত্তালিব হতাশার চরম সীমায় পৌঁছে যায়। এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের অন্তর নরম করে চলেছিলেন পাঁচ জন সম্ভ্রান্ত আশরাফ ব্যক্তির মাধ্যমে। এরাই শুধু শরণার্থীদের নিয়ে কিছুটা ভাবতেন। প্রথমজন হলেন হিশাম ইবনু আমর ইবনিল হারিস, কুরাইশদের মাঝে অতি-সম্মানিত এক ব্যক্তি। নির্বাসিতদের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে চিন্তা করে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হন। এরা সবাই আত্মীয়। আত্মীয়দের সাথে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো অকল্পনীয় অমানবিক কাজ করে বসেছে কুরাইশরা। একদিকে মক্কায় সবাই সচ্ছলতায় ভাসছে, ওদিকে শিআবু আবী তালিবে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে তাদেরই আপনজন। এই তিন বছরেও কারও ভ্রুকুঞ্চিত হয়নি এসব ভেবে। অবশেষে হিশাম ইবনু আমর এই অবিচারের বিরুদ্ধে তৎপর হলেন। একে একে দেখা করলেন বাকি চার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে।

প্রথমেই গিয়ে ধরলেন যুহাইর ইবনু আবী উমাইয়া মাখযূমিকে। ইনি নবিজি ﷺ-এর জ্ঞাতিভাই। তারপর যথাক্রমে মুত'ইম ইবনু আদি, আবুল বুখতারি ইবনু হিশাম এবং যামআ ইবনু আসওয়াদের সাথে পরামর্শ করলেন। আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই অন্যায় তারা চলতে দিতে চান কি না। সকলেই একমত হলেন যে, কা'বায় ঝুলতে থাকা ওই শর্তনামাটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা উচিত।

পরদিন সকাল। কা'বা প্রাঙ্গণে তারা অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রতিদিনের ন্যায় কুরাইশদের জড়ো হওয়ার জন্য। এরপর সবাই এসে জড়ো হলে, তওয়াফ শেষ করে যুহাইর দাঁড়িয়ে বললেন, "মক্কার জনগণ, শুনুন! এদিকে আমরা পেটপুরে খাচ্ছি, পান করছি। আর ওদিকে বানূ হাশিম অনাহারে মরছে। আল্লাহর কসম! এই নিষ্ঠুর আর অন্যায় চুক্তিনামা ছিঁড়ে কুচিকুচি না করা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না।"

আবূ জাহল খ্যাঁকিয়ে উঠল, "কী যা-তা বলছেন? আল্লাহর কসম! কেউ ছিঁড়তে পারবে না ওটা।"

যামআ প্রতিবাদ করে বললেন, "আল্লাহর কসম! যা-তা কথা তো আপনি বলছেন। এটা লেখার সময়ও আমাদের কোনও সম্মতি নেওয়া হয়নি।"

আবুল বুখতারি তার কথাকে সমর্থন করে বলে উঠলেন, "যামআ সঠিক কথা বলেছে। আমরা এই সিদ্ধান্তের সাথে কোনোকালেই একমত ছিলাম না।"

এবার মুত'ইম ইবনু আদিও বললেন, "আমারও একই কথা। এই শর্তনামার বিরোধিতা করলে কী এমন পাপ হয়ে যাবে? বরং এই দলীল এবং তাতে যা লেখা আছে, তা থেকে আমরা দায়মুক্ত। আল্লাহ যেন এটার জন্য আমাদের না ধরেন।" এ কথা শুনে হিশামও সায় জানালেন।

এই অকস্মাৎ বিদ্রোহ দেখে আবু জাহলের মনে সন্দেহ ঢুকে গেল। সে বলল, "মনে হচ্ছে যেন জিনিসটা আগে থেকে পরিকল্পিত। আপনারা অন্য কোথাও এই ব্যাপারে আগেই পরামর্শ করে এসেছেন।"

সুবর্ণ সুযোগটি লুফে নিলেন আবূ তালিব। তিনি নবি ﷺ-এর নিকট থেকে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ওহির কথা জেনেছেন একটু আগেই। সেটা বলার জন্যই এসেছিলেন কা'বার প্রাঙ্গণে। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মুহাম্মাদ আমাকে বলেছে যে, সে ওই চুক্তিনামাটির ব্যাপারে একটি ওহি পেয়েছে—পুরো পাতাটি উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে। শুধু অবশিষ্ট আছে 'বিসমিকাল্লাহুম্মা (আপনার নামে, হে আল্লাহ)' লেখা অংশটা। যাও, গিয়ে দেখো। ওর কথা যদি ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে আমি আর তোমাদের ও তার মাঝে বাধা হয়ে থাকব না। কিন্তু যদি দেখা যায় ওর কথা ঠিক, তাহলে কিন্তু এক্ষুনি এই বয়কট তুলে নিতে হবে!" কুরাইশরা আবূ তালিবের চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করল। মুত'ইম ইবনু আদি উঠে গিয়ে শর্তনামাটি নিয়ে আসতেই দেখা গেল মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাবি অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে।

কুরাইশদের আরও একটি নিদর্শন দেখিয়ে দিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তবুও তারা তাদের ভ্রান্তবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ইসলামের উজ্জ্বল আলোতে আসতে নারাজ। শুধু বয়কট তুলে দেওয়ার ব্যাপারেই সম্মত হলো তারা। পর্বতগিরি থেকে বেরিয়ে মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর অনুসারীরা। ফিরে এলেন মক্কায়।

আবূ তালিবের কাছে কুরাইশদের প্রতিনিধিদল

বয়কট উঠিয়ে নেওয়ার পর মাত্র কয়েকটি মাস পেরিয়েছে। অশীতিপর আবূ তালিব

অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাঁচার আশা খুব একটা নেই। পৌত্তলিকদের কাছে যদিও এটা খুশির খবর হওয়ার কথা, কিন্তু আসলে এতে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে পড়ে। চাচার মৃত্যুর পর মুহাম্মাদকে অরক্ষিত পেয়ে যদি কুরাইশরা তাঁর কোনও ক্ষতি করে, তাহলে তাদের এই কাপুরুষতার জন্য সারা আরবে ছি ছি শুরু হয়ে যাবে। এরচেয়ে বরং মৃত্যুর আগে আবূ তালিবের কাছে ছোট্ট একটি প্রস্তাব মঞ্জুর করানোই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। প্রস্তাবটি এমন, "আপনার ভাতিজাকে বলুন, এবার অন্তত আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের ব্যাপারে চুপ হয়ে যেতে। তাহলে আমরাও ওর ধর্মের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করব।"

আবূ তালিবও আসন্ন মৃত্যুর ব্যাপারে একরকম নিশ্চিত। তাই তিনিও চাচ্ছিলেন ভাতিজার নিরাপত্তার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে যেতে। প্রিয় ভাতিজাকে ডেকে শোনালেন কুরাইশদের প্রস্তাবখানা। সব শুনে নবিজি ﷺ বললেন, "চাচাজান, এখন ওদের কাছে আমার একটাই চাওয়া। ওই একটি জিনিস মেনে নিলেই গোটা আরব তাদের অধীনে চলে আসবে। আর অনারবরা তাদের অনুগত হয়ে থাকবে।"

কুরাইশরা জিজ্ঞেস করল "মাত্র একটি? আপনি বললে আমরা অমন দশটি জিনিসও মেনে নিতে রাজি আছি। বলুন, কী চান।"

নবি ﷺ বললেন, "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ—আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই।"

"কী?! আবারও ওই এক কথা? সব দেব-দেবী বাদ দিয়ে এক আল্লাহ? না! এ অদ্ভুত দাবি মানা সম্ভব নয়।"[১৭৮]

﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾﴾

"সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।"[১৭৯]

দুঃখবর্ষ

একই বছরে নবি ﷺ-এর মাথার ওপর থেকে দুটি ছায়া সরে যায়। মৃত্যু হয় তাঁর সবচেয়ে বড় দু'জন শুভাকাঙ্ক্ষীর। এরই জের ধরে মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি কুরাইশদের

[১৭৮] তিরমিযি, ৩২৩২; ইবনু হিশাম, ১/৪১৭-৪১৯।
[১৭৯] সূরা সাদ, ৩৮ : ৫।

আচরণও আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। ইসলামের ইতিহাসে এই বছরটি তাই (عَامُ الْحُزْنِ) বা 'দুঃখের বছর' নামে পরিচিত।

আবূ তালিবের মৃত্যু

আবূ তালিবের স্বাস্থ্যের অবনতি হলো। তার মৃত্যুশয্যায় নবিজি এসে পাশে বসলেন। দেখলেন উটকো ঝামেলার মতো আবূ জাহল এবং আবদুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়া সেখানে আগেই হাজির। তাদের উপস্থিতি উপেক্ষা করেই প্রিয় চাচাকে বললেন, "চাচাজান, একটি বারের জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন। তাহলে এর ভিত্তিতে আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য নাজাতের অনুনয় করার অধিকার পেয়ে যাব।"

পৌত্তলিক লোকদুটো চুপ থাকতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল, "আবূ তালিব, এই শেষ বেলায় এসে বুঝি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ছেড়ে দেবেন?"

এভাবে তারা বকবক করতেই থাকল। অবশেষে আবূ তালিবের জীবনে উচ্চারিত শেষ বাক্যটি হলো, "...আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর।"

আশার শেষ আলোকবিন্দুটি ধরে রেখে নবি ﷺ প্রতিজ্ঞা করলেন, "আমাকে মানা করার আগ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে আপনার জন্য মাগফিরাত চেয়ে যাব।" অনতিবিলম্বে অবতীর্ণ হলো আল্লাহর বাণী,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِيْ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾

"কোনও পৌত্তলিকের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা নবি ও মুমিনদের জন্য শোভনীয় নয়। এমনকি তারা আপন আত্মীয় হলেও, এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামি।"[১৮০]

আরেক আয়াতে বলা হয়,

إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

"নিজের ভালোবাসার পাত্র বলেই কাউকে আপনি সুপথে নিয়ে আসতে পারবেন না; বরং আল্লাহ যাকে চান, তাকেই সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

---

[১৮০] সূরা তাওবা, ৯ : ১১৩।

আর সুপথপ্রাপ্তদের তিনি ভালো করেই চেনেন।"[১৮১]

আবূ তালিবের মৃত্যু হয় নুবুওয়াতের দশম বছরের রজব কিংবা রমাদান মাসে। বয়কট সমাপ্তির ছয় বা আট মাস পরে। বুক চিতিয়ে ইসলামের নবিকে নিরাপত্তা দেওয়া মানুষটি নিজে মারা যান বাপ-দাদার ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আঁকড়ে থেকেই।

নবিজি ﷺ-এর আরেক চাচা আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) একবার নবিজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আবূ তালিব মানুষটা আমৃত্যু তোমাকে সমর্থন জুগিয়ে গেল। শত্রুদের বিরোধিতাও করল তোমার খাতিরে। তোমার উসিলায় কি সে কিছুই পাবে না?"

নবি ﷺ বলেন, "উনার স্থান হবে জাহান্নামের অগভীর একটি স্থানে। আমি না থাকলে তাঁকেও জাহান্নামের গভীর কোনও গর্তেই যেতে হতো।"[১৮২]

খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর মৃত্যু

নুবুওয়াতের দশম বছরের রমাদান মাস। আবূ তালিবের মৃত্যুর পর মাত্র দু-মাস তিন দিন অতিবাহিত হয়েছে। এমন সময় বিদায় নিলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রিয়তমা সঙ্গিনী, বিশ্বস্ত উপদেষ্টা, দুঃসময়ের সাথি ও বিশ্বাসীদের মা খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)।[১৮৩] স্ত্রীর ব্যাপারে নবি ﷺ একবার বলেছিলেন,

> "যখন সবাই আমায় অবিশ্বাস করেছে, তখন খাদীজা আমার প্রতি ঈমান এনেছে। যখন সবাই আমাকে মিথ্যুক বলেছে, তখন সে আমার সত্যবাদিতার স্বীকৃতি দিয়েছে। আর মানুষ যখন আমাকে অভাবে ফেলতে চেয়েছে, সে আমাকে তার সম্পদের অংশীদার বানিয়েছে। আমার স্ত্রীদের মাঝে একমাত্র তার মাধ্যমেই আল্লাহ আমাকে সন্তান দিয়েছেন।"[১৮৪]

নবি ﷺ একবার ওহি লাভের মাঝপথে থাকা অবস্থায় খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসেন। ঠিক সেই সময় জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, ওই যে খাদীজা একটি পাত্র নিয়ে আপনার কাছে আসছেন। আপনার প্রতিপালক তাঁকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং জান্নাতে তাঁর জন্য মুক্তার একটি

---

[১৮১] সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৬; বুখারি, ১৩৬০, ৪৬৭৫, ৪৭৭২।

[১৮২] বুখারি, ৩৮৮৩।

[১৮৩] ইবনুল জাওযি, তালকীহ, ৭।

[১৮৪] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬/১১৮।

প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, যাতে রয়েছে কেবলই শান্তি ও আরাম।”[১৮৫]

তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও এবং পরে একাধিক বিয়ে করা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ কখনও খাদীজাকে ভুলে যাননি। প্রায়ই তাঁর ব্যাপারে কথা বলতেন এবং আল্লাহর কাছে দুআ করতেন তাঁর মাগফিরাত ও উচ্চ মর্যাদার জন্য। কান্নাও করতেন তাঁর কথা ভেবে। কখনও কোনও উট কিংবা ভেড়া যবাই করলে খাদীজার বান্ধবীদের নিকট গোশতের একটি অংশ পাঠিয়ে দিতেন।

দুঃখের ওপরে দুঃখ

আবূ তালিব ও খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর মৃত্যুর পর বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকে মুশরিক সমাজ। জনসম্মুখে নবিজিকে অপমান করা আরম্ভ হয়। প্রতিটি আঘাত যেন আগের চেয়েও তীব্র ব্যথা নিয়ে তেড়ে আসে।

সাহস পেয়ে যাওয়া এ-রকম এক কুরাইশি লোক নবিজি ﷺ-এর মাথায় মাটি ছুড়ে মারে। তাঁর কোনও এক কন্যা এসে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বাবার মাথা পরিষ্কার করে দিতে থাকেন। সান্ত্বনা দিয়ে নবিজি বলেন, “কেঁদো না, আম্মু! আল্লাহই তোমার বাবাকে রক্ষা করবেন।”[১৮৬]

এ সময়ই নবি ﷺ বলেছেন, “আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত কুরাইশরা আমার সাথে কষ্টদায়ক কোনও আচরণ করেনি।”[১৮৭]

সাওদা ও আয়িশার সাথে নবিজির বিবাহ

খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর মৃত্যুর প্রায় এক মাস পর নুবুওয়াতের দশম বছরে রাসূল ﷺ বিয়ে করেন সাওদা বিনতু যামআ (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে। তখন শাওয়াল মাস। এর আগে সাওদার বিয়ে হয়েছিল তাঁরই জ্ঞাতিভাই সাকরান ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবিদের মাঝে এই দম্পতিও ছিলেন। মক্কায় ফিরে আসার পর সাকরান মারা যান। ইদ্দতের সময় শেষ হলে নবিজি ﷺ-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। কয়েক বছর পর তিনি নিজ পালা-বণ্টন আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে দিয়ে দিয়েছিলেন।[১৮৮]

---

[১৮৫] বুখারি, ৩৮২০।

[১৮৬] যাহাবি, তারীখুল ইসলাম, ১/২৩৫।

[১৮৭] ইবনু হিশাম, ১/৪১৬।

[১৮৮] বুখারি, ২৫৯৩।

এর এক বছর পর ১১তম বছরে শাওয়াল মাসেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিয়ে হয় আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর। মক্কায় সম্পন্ন হয় এই বিবাহ। বাগদানকালে আয়িশার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। তিন বছর পর হিজরি প্রথম বর্ষে বধূবেশে নবিজির ঘর আলোকিত করেন তিনি।[১৮৯] জীবিত স্ত্রীদের মাঝে তিনিই ছিলেন নবিজির সবচেয়ে বেশি প্রিয়। সেই সাথে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠতম একজন আলিমা। স্বামী হিসেবে রাসূলুল্লাহর ভূমিকা এবং প্রেমময়তার কথা এই উম্মাত জানতে পেরেছে মূলত আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণনা থেকেই।

নবিজি ﷺ-এর তায়িফ গমন

এই অবস্থায় নবি ﷺ তায়িফে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই ভাবনায় যে, হয়তো তারা ইসলামের দাওয়াত কবুল করবেন, তাঁকে সাহায্য করবেন, আশ্রয় দেবেন। ফলে তিনি মক্কা থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত তায়িফে পায়ে হেঁটে রওনা দিলেন। সফরসঙ্গী হিসেবে তাঁর প্রাক্তন দাস যাইদ ইবনু হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

পথে যেতে যত গোত্রের সাথে দেখা হয়, সবাইকে ইসলামের আহ্বান করেন নবিজি ﷺ। অবশেষে তায়িফে পৌঁছে দেখা করেন সেখানকার তিন গোত্রপতির সাথে। তিন জনই সাকীফ গোত্রের এবং তারা পরস্পর সহোদর। নবিজি ﷺ-এর আহ্বানের জবাবে তাদের আচরণ ছিল ভয়াবহ ও অমানবিক।

গোত্রপতিদের কাছ থেকে নেতিবাচক সাড়া পাওয়ার পর মুহাম্মাদ ﷺ অন্য কাউকে খোঁজ করেন। দশ দিন ধরে তিনি হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ান অন্তত একজনকে, যে আল্লাহর বাণীর প্রতি হৃদয় উন্মুক্ত করে দেবে। কিন্তু সে-রকম একজনেরও দেখা মিলল না। প্রতিটি গোত্রনেতাই অহংকারী ও অবন্ধুসুলভ আচরণ করে। এই শহর থেকে বের হয়ে যেখান থেকে এসেছেন, সেখানে ফিরে যেতে তাড়া দেয়। এমনকি এলাকার বাচ্চাকাচ্চা, দাস এবং মাস্তানদের লেলিয়ে দেয় তাঁর ওপর। শহর থেকে বের হতে-না-হতেই একদল বখাটে তাঁর পিছু নেয়। সমানে গালাগাল এবং পাথর ছুড়ে তার মন ও শরীর উভয়কে ক্ষতবিক্ষত করে। পাথরের আঘাতে একসময় নবিজি ﷺ-এর পা ফেটে রক্ত পড়তে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাঁচাতে গিয়ে মাথায় একাধিক আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত হন যাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

রবীআর দুই ছেলে উতবা এবং শাইবা। তায়িফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি

[১৮৯] বুখারি, ৩৮৯৪।

ফলবাগানের মালিক তারা। উচ্ছৃঙ্খলদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে নবি ﷺ ও যাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) আশ্রয় নেন সেই বাগানে। ক্লান্ত-শ্রান্ত রাসূল বিশ্রাম নিতে বসেন এক দেয়ালের ছায়ায়। আঙুরের থোকায় ছেয়ে আছে দেয়ালটি। সেখানে বসে তিনি সশব্দে দুআ করেন, যা 'দুআউল মুস্‌তাদআফীন' (دُعَاءُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ) নির্যাতিতের প্রার্থনা নামে প্রসিদ্ধ।

اَللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوْ ضَعْفَ قُوَّتِيْ، وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ، وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ... أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وَأَنْتَ رَبِّيْ... إِلٰى مَنْ تَكِلُنِيْ؟ إِلٰى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ أَمْ إِلٰى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِيْ. إِنْ لَّمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِيْ، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِيْ.. أَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَنْ يَّحِلَّ عَلَيَّ غَضَبُكَ، أَوْ أَنْ يَّنْزِلَ بِيْ سَخَطُكَ. لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে নিজের দুর্বলতা ও মানুষের সামনে অপমানিত হওয়ার ব্যাপারে অনুযোগ করছি। আপনি পরম করুণাময়, দুর্বলদের প্রতিপালক এবং আমারও প্রতিপালক। আপনি আমায় কাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন? অবহেলাকারীদের হাতে? আমার শত্রুদের কি বানিয়েছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক? আপনি যতক্ষণ আমার প্রতি রাগান্বিত নন, ততক্ষণ আমি কোনোকিছুর পরোয়া করি না। আপনার দয়া আমার জন্য যথেষ্ট। আপনার চেহারার আলোয় আমি আশ্রয় চাই, যার মাধ্যমে সকল আঁধার দূরীভূত হয় এবং দুনিয়া-আখিরাতের সকল কার্য সমাধা হয়। আপনার ক্রোধ বা অসন্তুষ্টি আপতিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। চাই আপনার খুশি ও সন্তুষ্টি। আপনি ছাড়া আর কারও কোনও ক্ষমতা ও শক্তি নেই।"

রবীআর পুত্রদ্বয় দূর থেকে দৃশ্যখানা দেখে বেশ আপ্লুত হয়। দেখেই বোঝা যাচ্ছে শ্রান্ত এক পথিক তাদের বাগানে বিশ্রামরত, যার সামনে এখনও বহুদূরের পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। তাদের এক খ্রিষ্টান দাস আদ্দাসকে ডাক দেয়। এক থোকা আঙুরসহ তাকে পাঠায় পথিকটির কাছে। আদ্দাসের হাত থেকে থোকাটি নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে খেতে শুরু করেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। ছোট্ট এই বিষয়টিই আদ্দাসকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

"এখানকার মানুষদের তো কখনও এ-রকম কথা বলতে শুনিনি", নবিজি ﷺ-কে বলল সে।

নবিজি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন "তাই নাকি? তোমার বাড়ি কোথায়? তুমি কোন ধর্ম পালন করো?"

"আমি খ্রিষ্টান। নিনাওয়ার বাসিন্দা।"

"ও মহাপুরুষ ইউনুস ইবনুল মাত্তার সেই গ্রাম?"

"আশ্চর্য! উনাকে আপনি চেনেন কীভাবে?"

"তিনি তো আমারই ভাই। তিনিও নবি, আমিও নবি।"

এই বলে ইউনুস (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা-সংবলিত কুরআনের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ ﷺ।[১৯০]

বলা হয় যে, অভিভূত আদ্দাস কবুল করে নেন ইসলামের দাওয়াত। ঘরের উঠোনে হেঁটে আসা যেই সৌভাগ্য তায়িফের গোত্রনেতারা পেল না, তা লুফে নিল দূরদেশের এক দাস।

মক্কায় ফিরতি পথ ধরলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। মনে একরাশ হতাশা। 'কারনুল মানাযিল' নামক স্থানে মেঘের ওপরে করে ভেসে আসেন জিবরীল (আলাইহিস সালাম)। দেখা দেন নবিজি ﷺ-এর সামনে। তাঁর সাথে আরও একজন ফেরেশতা।

জিবরীল বললেন, "ইনি পাহাড়ের ফেরেশতা। আল্লাহ তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। যা ইচ্ছা আদেশ করেন, আপনার কথামতো কাজ করবেন উনি।"

পাহাড়ের ফেরেশতা বললেন, "মুহাম্মাদ, আমি আপনার নির্দেশমতো কাজ করতে এসেছি। যদি বলেন, তাহলে তায়িফের লোকদের আমি দুই পাহাড়ের মাঝে পিষিয়ে মেরে ফেলব। এখন সিদ্ধান্ত আপনার।"

নবিজির মনে তখনো প্রতিশোধের কোনও আগুন নেই। তিনি বললেন,

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

"না; বরং আমি আশা করি তাদের থেকেই আল্লাহ একদিন এমন প্রজন্ম বের করে আনবেন, যারা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।"[১৯১]

---

[১৯০] ইবনু হিশাম, ১/৪১৯-৪২১।

[১৯১] বুখারি, ৩২৩১; মুসলিম, ১৭৯০।

জিবরীলের এই সাক্ষাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মানসিকভাবে প্রশান্তি দেয়। একাকিত্বের পাথর নেমে যায় বুক থেকে। মাঝে 'নাখলা'য় দুদিনের যাত্রাবিরতি করেন। আর এ জায়গাতেই তাঁকে ঘিরে ঘটে যায় বিস্ময়কর এক ঘটনা। কুরআনে ঘটনাটি বর্ণিত হওয়ার আগে আল্লাহর রাসূল নিজেই সে ব্যাপারে জানতেন না।

নবি ﷺ ফজরের সালাত আদায় করছেন। তাঁর তিলাওয়াত শুনতে পায় জিনদের একটি দল। খুব আগ্রহ নিয়ে তারা তা শেষ পর্যন্ত শোনে। তারপর স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে জানায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বার্তাবাহক পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও সচেতন করে দেয় অন্যদের। নবিজির সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ না করলেও জিনদের সে দলটি সেদিনই ইসলাম কবুল করে নেয়। পরে সূরা আহকাফ ও সূরা জিনে ঘটনাটি বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে নবিজিকে অবহিত করেন।[১৯২]

কয়েকদিন পর নবিজি নাখলা ছেড়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হন। একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় মক্কায় না ঢুকে তিনি একটু প্রস্তুতি নেন। তায়িফের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হোক তিনি তা চান না।

হেরা পর্বতের কাছে থেমে তিনি এক লোককে আখনাস ইবনু শারীকের কাছে পাঠান। অনুরোধ করেন তাঁকে নিরাপত্তা-প্রতিশ্রুতি দিতে। কিন্তু আখনাস অক্ষমতা প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নেন। কুরাইশের সাথে মিত্রতা থাকায় তার পক্ষে অনুরোধটি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তারপর নবিজি একই অনুরোধ পাঠান সুহাইল ইবনু আমরের কাছে। নবি ﷺ-কে শত্রু ঘোষণাকারী গোত্র বানূ আমির ইবনি লুআইয়ের সদস্য হওয়ায় সুহাইলও সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।

নবিজি ﷺ এরপর অনুরোধ পাঠান মুত'ইম ইবনু আদির কাছে। মুত'ইমের দাদা নাওফাল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বপুরুষ হাশিম ইবনু আবদি মানাফ ছিলেন সহোদর। কুরাইশের সবচেয়ে সম্মানিত শাখাগোত্রও এই বানূ আবদি মানাফ।

আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি সম্মান জানিয়ে মুত'ইম নবি ﷺ-কে নিরাপত্তা দিতে রাজি হন। তিনি ও তাঁর ছেলেরা সশস্ত্র হয়ে নবিজিকে এগিয়ে নিয়ে আসেন। মুহাম্মাদ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেই সোজা কা'বায় চলে যান। তওয়াফ ও সংক্ষিপ্ত সালাত আদায় শেষে ঘরে যান। পুরোটা সময় তাঁকে পাহারা দেন মুত'ইম ও তাঁর পুত্ররা। মুত'ইম তারপর মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি তাঁর নিরাপত্তা-প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করে দেন।

---

[১৯২] বুখারি, ৭৭৩।

ফলে কুরাইশরা সে নিরাপত্তা-প্রতিশ্রুতিকে মেনে নেয়।[১৯৩]

মুশরিকদের মু'জিযা-অলৌকিক কিছু দেখানোর দাবি

মুহাম্মাদ ﷺ-এর সত্যবাদিতার বহু নিদর্শন দেখেও মক্কার পৌত্তলিকরা তা অস্বীকার করে এসেছে। তার ওপর একসময় তারা অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর দাবি জানিয়ে বসে। কিন্তু সত্যকে চিনে ইসলাম গ্রহণ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল জনসম্মুখে নবিজিকে বিব্রত করা।

একদিন কা'বা প্রাঙ্গণে বসে পৌত্তলিকরা নবি ﷺ-কে ডেকে পাঠায়। তারা ইসলাম কবুল করতে চায় ভেবে তাড়াহুড়া করে এসে হাজির হন আল্লাহর রাসূল ﷺ। তিনি এসে বসলে তারা ওই পুরোনো আবদার আবার করে বসে, "মুহাম্মাদ, আপনি তো বলেছিলেন, নবিরা নাকি অনেক নিদর্শন দেখান। মূসার ছিল অলৌকিক লাঠি, সালিহের উট, আর ঈসা তো মৃতকেই জাগিয়ে তুলতেন। তো দেখছি আগেকার সব নবি একদম সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। তা আপনার সে-রকম কী আছে, একটু দেখান দেখি। তাহলে আমরাও নিশ্চিত হতাম যে আপনি উনাদেরই মতো একজন নবি।"

কুরাইশরা ভেবেছিল নবিগণ চাইলেই নিজের ইচ্ছায় অলৌকিক কাজ করে দেখাতে পারেন। সহজ এই বিষয়টি তারা ধরতে পারে না যে, আল্লাহই মূলত নবিদের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটান।

তারা চায় চোখ-ধাঁধানো জাদুর খেলা। অথচ সৃষ্টিজগৎ ও স্বয়ং কুরআনে তারা অহর্নিশি কত নিদর্শন দেখেও না দেখার ভান করছে। কুরআনে যথার্থই এদের বলা হয়েছে বধির, মূক ও অন্ধ। এককেবার তাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে তারা একেক জিনিসের আবদার নিয়ে আসে। কখনও বলে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণের পাহাড় বানিয়ে দিতে, কখনও পাহাড়গুলোকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে পুরো এলাকাকে বিস্তীর্ণ করে ফেলতে, কখনও পানির ঝরনা বের করে দেখাতে, কখনও-বা মৃত পূর্বপুরুষদের পুনর্জীবিত করে তাদের মুখ থেকে তাঁর নুবুওয়াতের সত্যায়ন করাতে।

---

[১৯৩] ইবনু হিশাম, ১/৩৮১; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ২/৪৬-৪৭।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাদের কথা উদ্ধৃত করে বলেন,

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ

"তারা বলে, আপনি জমীন থেকে ঝরনা বের করে না দেখালে কিছুতেই আপনাকে বিশ্বাস করব না। অথবা আঙুর-খেজুরের বিরাট বাগান নিয়ে আসুন, অথবা সেগুলোর মাঝ দিয়ে নদী প্রবাহিত করুন। আর না হলে যেমনটা দাবি করেন, সে অনুযায়ী আমাদের ওপর আকাশের একটি টুকরো আছড়ে ফেলুন। কিংবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের নিয়ে এসে আমাদের সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎ করান। বা জাঁকজমকপূর্ণ একটা ঘরের মালিক হয়ে দেখান। পারলে ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করুন। না, আপনার সেই ঊর্ধারোহণও বিশ্বাস করব না, যদি না আমাদের পাঠোপযোগী একটি কিতাব এনে দেখাতে পারেন।"[১৯৪]

পৌত্তলিকদের দাবি, নবি ﷺ এগুলোর কোনও একটা করে দেখালেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। এই প্রতিজ্ঞা কুরআনেও উদ্ধৃত হয়েছে,

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا

"তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে দৃঢ় স্বরে বলে যে, নিদর্শন দেখালেই নাকি তারা ঈমান আনবে।"[১৯৫]

নবি ﷺ অবশেষে আল্লাহর কাছে দুআ করেন তাদের আকাঙ্ক্ষিত কোনও একটি মু'জিযা দেখিয়ে দিতে। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) দুটি বিকল্প নিয়ে নবিজির কাছে উপস্থিত হন। হয় তাদের চাওয়া অনুযায়ী নিদর্শন দেখিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু এরপর কুফরি করলে তৎক্ষণাৎ চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া হবে। আর নয়তো মু'জিযা দেখানো থেকে বঞ্চিত রেখে তাওবা ও রহমতের দরজা খোলা রাখা হবে। প্রাজ্ঞ নবি মুহাম্মাদ ﷺ যথার্থই দ্বিতীয়টি বেছে নেন।[১৯৬]

---

[১৯৪] সূরা ইসরা, ১৭ : ৯০-৯৩।

[১৯৫] সূরা আনআম, ৬ : ১০৯।

[১৯৬] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১/২৪২, ৩৪৫।

নবিজির প্রদেয় জবাব কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে,

﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٣﴾

"বলে দিন, পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা। আমি তো কেবলই বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরিত একজন মানুষ!"[১৯৭]

এ আয়াত থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অন্যান্য নবিদের মতো মুহাম্মাদ ﷺ-ও অলৌকিক ক্ষমতাবিহীন একজন সাধারণ মানুষ। চাইলেই যখন-তখন তিনি মু'জিযা দেখাতে পারেন না। আল্লাহই নির্ধারণ করেন কখন, কোথায়, কীভাবে তাঁর নিদর্শন উন্মোচিত হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٩﴾

"বলুন, 'নিদর্শনের সব ক্ষমতা শুধুই আল্লাহর অধিকারে।' কিন্তু নিদর্শন দেখলেও যে তারা ঈমান আনবে না, তা কি আপনারা এখনও উপলব্ধি করেননি?"[১৯৮]

﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾

"যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতাও পাঠাই, বা মৃতরা তাদের সাথে মুখোমুখি কথা বলে, আর তাদের চোখের সামনেই সবকিছু জড়ো করে দেখাই, তবুও তারা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে ঈমান আনবে না। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্যকে এড়িয়ে যায়।"[১৯৯]

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا

"যদি কোনও কুরআন এমন হতো, যার মাধ্যমে পাহাড় চলমান হয় বা জমীন খণ্ডিত হয়, অথবা মৃতরা কথা বলে, তবে কী হতো? বরং সব কাজ তো আল্লাহর হাতে। ঈমানদাররা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, যদি আল্লাহ

---

[১৯৭] সূরা ইসরা ১৭ : ৯৩।

[১৯৮] সূরা আনআম, ৬ : ১০৯।

[১৯৯] সূরা আনআম, ৬ : ১১১।

চাইতেন, তবে সব মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতেন?[২০০]

নিজেদের ঈমানের পক্ষে সাফাই গাইতে এভাবেই নিষেধ করা হয় নবি ﷺ ও মুমিনদের; বরং ইসলামের দিকে আসার ঠ্যাকা কাফিরদেরই। যেই আল্লাহর হাতে হিদায়াতের ক্ষমতা, তিনি না চাইলে কী করে তারা ঈমান আনবে?

টুকরো হলো চাঁদ

অতিপ্রাকৃতিক কিছু ঘটতে না দেখে কুরাইশরা ভেবে বসল যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর দুর্বলতার জায়গাটা তারা পেয়ে গেছে। এবার তারা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার মতো স্বরে বলতে লাগল, অন্তত ছোটখাটো কোনও একটা নিদর্শন হলেও দেখাতে। ভেবেছিল এভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-কে মিথ্যে নবি প্রমাণ করে চুপ করিয়ে দেওয়া যাবে।

নবি ﷺ দুআ করলেন, যেন কুরাইশদের একটি মু'জিযা দেখানো হয়। অবশেষে আল্লাহ তাআলা উন্মোচিত করলেন স্পষ্ট এক মু'জিযা: চাঁদকে আধাআধি টুকরো করে এমন দূরত্বে স্থাপন করলেন যে, দুটি টুকরো হেরা পর্বতের দুই পাশে চলে গেল। একটি টুকরা জাবালু আবী কুবাইসের ওপর আর একটি তার নিচে চলে গেল। এমনকি লোকজন হেরা পর্বতকে চাঁদের দুই টুকরার মাঝে দেখছিল। নবি ﷺ তখন বললেন, "সাক্ষী থেকো সবাই।"[২০১]

প্রথমে নিজেদের চোখকেই পৌত্তলিকরা বিশ্বাস করতে পারল না। আস্ত চাঁদ তাদের চোখের সামনে দুই ভাগ হয়ে গেছে। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার পর তারা অজুহাত বের করল যে, এটা আবূ কাবশার নাতির কোনও তুকতাকের ফল, "মনে হয় সে আমাদের চোখের ওপর জাদু করেছে। মক্কার বাইরে থেকে কোনও পথিক আসুক, ওদের জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে তারাও এ ঘটনা দেখেছে কি না।" বাইরে থেকে আসা প্রথম মুসাফির দলটিকেই তারা এ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করল। দ্বিখণ্ডিত চাঁদ দেখার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা স্বীকার করল তারাও।[২০২]

কুরাইশদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু তবু অন্তর থেকে কুফর বের হলো না।

---

[২০০] সূরা রা'দ, ১৩ : ৩১।

[২০১] বুখারি, ৪৮৬৪।

[২০২] তাবারি, তাফসীর,২৭/১১২; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৪/৩৩৪।

ঊর্ধ্বাকাশে রাত্রিভ্রমণ—ইসরা ও মি'রাজ

নবিজীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঘটনা ইসরা ও মি'রাজ। এক রাতের কিছু অংশে নবিজি ﷺ-কে আল্লাহ্ তাআলা মক্কার কা'বা থেকে বাইতুল মাকদিসে ভ্রমণ করান। এটাকে বলা হয় ইসরা বা রাতের ভ্রমণ। আর আকসা থেকে নবিজিকে ঊর্ধ্বাকাশে তুলে নেওয়া হয়। একে বলা হয় মি'রাজ বা ঊর্ধ্বগমন। কুরআনে ইসরা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١﴾

"সুমহান সেই সত্তা, যিনি তাঁর দাসকে রাতের একাংশে মাসজিদুল হারাম (কা'বা) থেকে মাসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করিয়েছেন, যার চারপাশের ভূমিকে তিনি করেছেন বরকতময়। যাতে আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদর্শী।"[২০৩]

আর মি'রাজের কথা সূরা নাজমের সপ্তম থেকে অষ্টাদশ আয়াতে বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো দ্বারা মি'রাজ উদ্দেশ্য নয়।

ইসরা-মি'রাজ কোন বছরে হয়েছিল, তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। সবগুলো মত নিচে উল্লেখ করা হলো,[২০৪]

১. নুবুওয়াতের প্রথম বছরে

২. পঞ্চম বছরে

৩. দশম বছরের ২৭ রজব

৪. দ্বাদশ বছরের ১৭ রমাদান

৫. ত্রয়োদশ বছরের মুহাররম বা রবীউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখ।

ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা যেমন চমকপ্রদ, তেমনি শিক্ষণীয়। বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে ঘটনাটির সারসংক্ষেপ হলো—জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কা'বায় এসে উপস্থিত হন। সাথে ছিল বুরাক নামক একটি বাহন, খচ্চরের চেয়ে খানিক বড় আর গাধার

---

[২০৩] সূরা ইসরা, ১৭ : ১।

[২০৪] এগুলোর সাথে আরও মত রয়েছে। দেখুন, ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ৭/২৪২; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ২/৪৯।

চেয়ে খানিক ছোট এক প্রাণী। এর প্রতিটি পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়ে পড়ে। নবি ﷺ ও জিবরীল বুরাকে চড়ে ফিলিস্তিনের আল-আকসায় বাইতুল মাকদিসে পৌঁছান। মাসজিদের বাইরে যেখানটায় আগেকার নবিগণ তাঁদের বাহনের রশি বাঁধতেন, সেখানেই বুরাককে বেঁধে রাখেন।

মাসজিদে ঢুকে মুহাম্মাদ ﷺ দেখেন যে, অতীতের সকল নবি সেখানে উপস্থিত। এরপর তিনি দুই রাকাআত সালাতে তাঁদের ইমামতি করেন। জিবরীল তাঁর কাছে তিনটি পাত্র নিয়ে আসেন। একটিতে মদ, একটিতে দুধ আর একটিতে মধু।[২০৫] যেকোনও একটি বেছে নিতে বলা হলে নবিজি দ্বিতীয়টি বেছে নেন। জিবরীল এ ব্যাপারে জানান,

"আপনার স্বভাবের পবিত্রতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জিনিসটিই বেছে নিয়েছেন। তাই আপনি ও আপনার অনুসারীরা লাভ করেছে সঠিক পথের দিশা। যদি মদ বেছে নিতেন, তাহলে আপনার অনুসারীরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।"

এরপর নবি ﷺ-কে বাইতুল মাকদিস থেকে নেওয়া হয় প্রথম আসমানে। জিবরীল দরজা খোলার অনুরোধ করেন। সেখানে ঢুকে আল্লাহর রাসূল দেখা পান প্রথম মানব ও নবি আদম (আলাইহিস সালাম)-এর। দু'জনে সালাম বিনিময়ের পর আদম (আলাইহিস সালাম) মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহর নবি বলে সাক্ষ্য দেন। আদম তাঁর ডান দিকে তাকিয়ে হাসেন, তারপর বামে তাকিয়ে কাঁদেন। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দৃষ্টির অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখলেন ডানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুমিনগণ, আর বামদিকে কাফিররা।

একইভাবে দ্বিতীয় আসমানে গিয়ে দেখা হয় দুই জ্ঞাতিভাই ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া ও ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিমুস সালাম)-এর সাথে। তৃতীয় আসমানে ইউসুফ, চতুর্থ আসমানে ইদরীস এবং পঞ্চম আসমানে হারূন (আলাইহিমুস সালাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। একইভাবে সালাম বিনিময় হয় ও সবাই নবি ﷺ-এর নুবুওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

ষষ্ঠ আসমানে ছিলেন মূসা (আলাইহিস সালাম)। যথারীতি সালাম বিনিময় ও সাক্ষ্য প্রদান শেষে মূসা হঠাৎ কাঁদতে শুরু করেন। কারণ, জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন, "কাঁদছি, কারণ আমার চেয়ে তরুণ এক ব্যক্তিকে আমার পরে নবি মনোনীত করা হয়েছে। অথচ জান্নাতে আমার অনুসারীদের চেয়ে তাঁর অনুসারীর সংখ্যাই বেশি হবে।"

সপ্তম আসমানে গিয়ে দেখা মেলে বাইতুল মা'মূরে হেলান দিয়ে থাকা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে। আসমানি ওই মাসজিদে প্রতিদিন সত্তর হাজার

[২০৫] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/২০৮।

ফেরেশতা তওয়াফ করেন, কিয়ামাতের আগে তারা আর দ্বিতীয়বার তওয়াফের সুযোগ পাবেন না। বংশধরের সাথে একইভাবে সালাম বিনিময় ও সাক্ষ্য প্রদান করেন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)।

এরপর মুহাম্মাদ ﷺ-কে নিয়ে যাওয়া হয় সিদরাতুল মুনতাহায়। জান্নাতি এই গাছটির একেকটি পাতা হাতির কানের সমান, আর ফলগুলো কলসের সমান বড়। স্বর্ণালি আলোকপতঙ্গে ঘেরা গাছটির সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

এরপর নবিজি ﷺ-কে নেওয়া হয় স্বয়ং মহান প্রতিপালক আল্লাহর সান্নিধ্যে। মানুষের পার্থিব চোখ আল্লাহর সুমহান সত্তাকে ধারণ করতে অক্ষম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা, নবি ﷺ সেখানে আল্লাহ তাআলার বিশেষ সান্নিধ্যে অবস্থান করেছেন, যে সৌভাগ্য আর কারও হয়নি। আল্লাহ তাআলা উম্মাতে মুহাম্মাদের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের বিধান সেখানেই প্রদান করেন। ফিরে যাবার পথে মূসা (আলাইহিস সালাম) মুহাম্মাদ ﷺ-কে থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন আল্লাহ তাআলা কী আদেশ করেছেন? পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের কথা শুনে পরামর্শ দেন, "আপনার অনুসারীরা অনেক দুর্বল। ওরা এত পারবে না। আপনি প্রতিপালকের কাছে গিয়ে আরেকটু হালকা করিয়ে আনুন।"

এভাবে বারকয়েক আসা-যাওয়া করে ফরজ সালাতের সংখ্যা পাঁচে নামিয়ে আনা হয়। তারপরও মূসা (আলাইহিস সালাম) বলেন, "না, তাও বেশি হয়ে যাচ্ছে। বানী ইসরাঈলের ওপর এর চেয়ে কম দায়িত্ব ছিল। সেটাও তারা করতে পারেনি।" কিন্তু এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমার এখন আল্লাহ তাআলার কাছে যেতে লজ্জা হচ্ছে; বরং এতেই আমি সন্তুষ্ট এবং অনুগত।" একটি কণ্ঠ থেকে ঘোষিত হয়, "আমি বান্দাদের প্রতি আমার আদেশ হালকা করে দিয়েছি। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেই তারা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান প্রতিদান পাবে। আমার আদেশ পরিবর্তিত হয় না।"[২০৬]

ওই রাতেই মক্কায় ফিরে আসেন নবি ﷺ। পরদিন সকালে এই অলৌকিক যাত্রার কথা বলেন সবাইকে। মুশরিকরা যথারীতি উড়িয়েই দিল কথাটা। কেউ ছুটে গেল আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে। ভাবল, মুহাম্মাদের প্রতি আবূ বকরের দৃঢ় বিশ্বাসকে এবার নাড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু সব শুনে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "যদি তিনি তা-ই বলে থাকেন, তবে তা নিশ্চয়ই সত্য।" আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই উক্তি প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম জুড়ে মুসলিমদের অনুপ্রেরণার খোরাক। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নবি বলে যাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, কেন

---

[২০৬] বুখারি, ৩৪৯।

তিনি স্থান-কালের সীমানা পেরিয়ে ভ্রমণ করতে পারবেন না? সেদিন থেকে আবূ বকরের উপাধি হয় 'সিদ্দীক' বিশ্বাসী।[২০৭]

আল-আকসা ও সেখানকার মাসজিদ সম্পর্কে জানাশোনা থাকা মুশরিকরা এ বিষয়ে নবিজি ﷺ-কে মুহুর্মুহু প্রশ্ন করতে লাগল তাঁকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করার মাতাল নেশায়। নবি ﷺ সবকিছুর এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করলেন যে, তাতে কয়টি দরজা, কয়টি জানালা, সেগুলো পর্যন্ত বলে দিলেন। কিন্তু কেউ তাতে কোনও ভুল ধরতে পারল না।[২০৮]

শুধু তা-ই না। জেরুসালেম (আল-আকসা) থেকে মক্কা অভিমুখী একটি কাফেলার উটসংখ্যা, অবস্থা, মক্কায় পৌঁছানোর সময়ও বলে দেন নবিজি ﷺ। পরে ঠিকই সেই কাফেলা নবিজির বলে দেওয়া সময়ে মক্কায় এসে হাজির হয়। সবকিছুই নবিজির বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায়।[২০৯]

পৌত্তলিকরা তবু আপন ভ্রান্তিতে অনড় থাকে। গোমরাহির অতলে পড়ে থাকে।

সেদিন সকালেই জিবরীল (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করে নবিজি ﷺ-কে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের নিয়মকানুন শেখান। সেদিন থেকে সকাল-সন্ধ্যা দু-বেলার পরিবর্তে দিনে পাঁচবার সালাত আদায় শুরু হয়।

গোত্রে গোত্রে ইসলামের দাওয়াত

প্রতি বছর আরবের তিন জায়গায় তিনটি বিরাট মেলা বসত—উকায, মাজিন্না ও যুল মাজায। সারা আরব থেকে মানুষের ঢল নামত এ জায়গাগুলোতে। নাখলা ও তায়িফের মাঝখানে অবস্থিত উকায গ্রাম। যুল-কা'দা মাসের বিশ দিন জুড়ে সেখানে মেলা চলত। তারপর সেখান থেকে লোকজন চলে যেত মাজিন্নায়। বসাত বাহারি পণ্যের দোকান। যুল-কা'দের বাকি দশদিন সেখানে মেলা থাকত। মাজিন্না হলো মক্কা থেকে একটু নিচে মাররুয যাহরান উপত্যকায়। আরাফার ময়দানে জাবালে রহমতের পেছনেই অবস্থিত যুল মাজায। যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম আট দিন সেখানকার মেলায় হতো রমরমা বেচাকেনা আর অসংখ্য মানুষের ভিড়। ওখান থেকেই পরে লোকজন এসে হাজ্জের

[২০৭] ইবনু হিশাম, ১/৩৪৯।

[২০৮] বুখারি, ৩৮৮৬।

[২০৯] ইবনু হিশাম, ১/৪০২।

আনুষ্ঠানিকতা আরম্ভ করত।

মক্কার বাইরের বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের দাওয়াহ পৌঁছানোর জন্য এ সময়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ। একে একে ইসলামের আহ্বান শুনতে পায় বানূ আমির ইবনু সা'সাআ, বানূ মুহারিব, বানূ ফাযারা, গাসসান ও মুররা, বানূ হানীফা, বানূ সুলাইম, বানূ আব্স, বানূ নাসর, বানুল বুকা, কিন্দা ও কাল্ব, বানুল হারিস ইবনি কা'ব, উযরা এবং হাদারামা। এই গোত্রগুলোর কোনওটিই নবিজি ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দেয়নি।[২১০] কিন্তু এদের একেকটির জবাব ছিল একেক ধরনের। কেউ বিনীতভাবে নাকচ করে। কেউ ক্ষমতার গন্ধ পেয়ে বায়না ধরে যে, নবিজির মৃত্যুর পর যেন তাদের এ কাজের উত্তরসূরি বানিয়ে দেওয়া হয়। কেউ কেউ অজুহাত দেয় যে, রাসূলুল্লাহর স্বগোত্রীয় ও আত্মীয়দের বেশির ভাগই তো তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি। আবার কেউ কেউ সরাসরি অপমান করে বসে। বিশেষ করে বানূ হানীফার আচরণ ছিল মাত্রাতিরিক্ত কুৎসিত। পরে একসময় নিজেকে নবি বলে দাবি করা মিথ্যুক মুসাইলিমা এ গোত্রেরই সদস্য ছিল।[২১১]

মক্কার বাইরে ছড়ানো ঈমানের বীজ

কথায় আছে, "মক্কার মানুষ হাজ্জ পায় না।" মক্কার ভেতরের বিপুলসংখ্যক পৌত্তলিক যদিও নবিজি ﷺ-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু মক্কার বাইরের কিছু মানুষ ঠিকই ইসলাম কবুল করে নেন। যেমন:

সুওয়াইদ ইবনু সামিত

তৎকালীন ইয়াসরিব (বর্তমান মদীনা) শহরের কবি সুওয়াইদ মক্কায় এসেছিলেন হাজ্জ করতে। নবিজি প্রথম তাঁকে দাওয়াত দিলে তিনি স্বরচিত কিছু পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে শোনান। জবাবে মুহাম্মাদ ﷺ শোনান কুরআনের কিছু আয়াত। "এমন মহিমান্বিত বাণী আমি জীবনেও শুনিনি!" এই স্বীকৃতি দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করেন সুওয়াইদ ইবনু সামিত (রদিয়াল্লাহু আনহু)। ইয়াসরিবের দুই গোত্র আওস ও খাযরাজের মধ্যকার এক যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়ে যান।[২১২]

---

[২১০] ইবনু সা'দ, তবাকাত, ১/২১৬।
[২১১] ইবনু হিশাম, ১/৪২৪-৪২৫।
[২১২] ইবনু আবদিল বার, আল-ইসতীআব, ২/৬৭৭; ইবনুল আসীর, উসদুল গাবাহ, ২/৩৩৭।

ইয়াস ইবনু মুআয

তিনিও ইয়াসরিবের অধিবাসী। একটি প্রতিনিধিদলসহ তিনি মক্কায় এসেছিলেন নুবুওয়াতের একাদশ বছরে। আওস গোত্রের নেতৃস্থানীয় এই ব্যক্তিটির উদ্দেশ্য ছিল মূলত প্রতিদ্বন্দ্বী খাযরাজের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক সহযোগিতা আদায়। নবি ﷺ ইয়াসকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে কুরআনের কিছু আয়াত শোনান। তা শুনে তিনি সহচরদের বলেন, "আল্লাহর কসম! যে জিনিসের খোঁজে এখানে এসেছিলাম, এ দেখছি তারচেয়েও উত্তম।" তাঁর স্বগোত্রীয় আরেক ব্যক্তি আবুল হুসাইর তাঁর গায়ে নুড়িপাথর ছুড়ে মেরে বলে, "আরে বাদ দাও। আমরা এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছি তা ভুলে যেয়ো না।" তখনকার মতো ইয়াস চুপ হয়ে যান। ইয়াসরিবে ফিরে যাবার অল্পকাল পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। মৃত্যুর আগে আল্লাহর যিক্‌র ও তাস্‌বীহ পাঠ করা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি মনে মনে ইসলাম কবুল করেছিলেন।[২১৩]

আবূ যার গিফারি

এই ব্যক্তিটি সুওয়াইদ ও ইয়াসের মাধ্যমে নবিজি ﷺ-এর ব্যাপারে জানতে পারেন। কৌতূহলী আবূ যার তাঁর এক ভাইকে মক্কায় পাঠান নবিজি ﷺ-এর চরিত্র সম্পর্কে আরও তথ্য বের করতে। ভাই ফিরে এসে যে তথ্য দেন, তা আবূ যারের মনঃপূত হয় না। ফলে নিজেই রওনা হন মক্কায়। কিন্তু শহরে ঢুকে প্রাণভয়ে কাউকে তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার সাহস পেলেন না। কয়েকদিন পরে আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে নবিজির কাছে নিয়ে যান। সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে শোনেন ইসলামের মূল বিষয়াদি। সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেন ইসলাম।

এবার আবূ যারের হৃদয় ঈমান ও সাহসে পরিপূর্ণ। সোজা কা'বায় চলে গিয়ে খোলাখুলি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। কুরাইশরা এর জবাব দেয় তাঁকে মারধর করার মাধ্যমে। নবিজির চাচা আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বহু কষ্টে তাঁকে ছাড়িয়ে আনেন। পরের দিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়।[২১৪] এবারে আবূ যার তাঁর গোত্র বানূ গিফারে ফিরে যান। মদিনায় হিজরত করার আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকেন।

তুফাইল ইবনু আমর দাউসি

ইয়েমেনের শহরতলিতে বাস করত দাউস গোত্র। এখানকার গোত্রনেতা তুফাইল

---

[২১৩] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/৪২৭।
[২১৪] বুখারি, ৩৫২২।

একজন প্রখ্যাত কবি। নুবুওয়াতের একাদশ বছরে মক্কায় এসে কুরাইশদের সতর্কবাণীর মুখোমুখি হন। এ শহরে নাকি এক লোক আছে, যে কথা দিয়ে সবাইকে জাদু করে ফেলে! কা'বায় যাওয়ার আগে সতর্কতাবশত তাই তিনি কানে তুলো গুঁজে নেন। গিয়ে দেখলেন অদূরেই নবি ﷺ সালাত পড়ছেন। কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে তিনি নবিজির তিলাওয়াত শুনতে লাগলেন। ভাবলেন, "আমি কবি মানুষ। কান আমার বহুকালের দক্ষ। মানুষটি সত্য বলছেন নাকি মিথ্যা, তা আমি ঠিকই বুঝতে পারব। শুনেই দেখি না!"

তিলাওয়াত শুনে অভিভূত তুফাইল নবিজি ﷺ-এর পেছন পেছন তাঁর ঘর পর্যন্ত যান। অনুরোধ করেন ইসলামের ব্যাপারে আরও জানাতে। নবি ﷺ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে দিলে তুফাইল ইসলাম কবুল করে নেন। নবিজিকে জানান যে, গোত্রের লোকদের কাছে তার কথার ওজন আছে। তিনি গিয়ে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে পারবেন। শুধু নবিজি যেন তাকে কোনও একটি নিদর্শন দিয়ে দেন, যা দেখে মানুষ তার কথার সত্যতা বুঝতে পারবে। নবিজি ﷺ দুআ করে দেন এ ব্যাপারে। তুফাইল যখন আপন এলাকায় ফিরলেন, তখন তাঁর চেহারা থেকে একধরনের আলো ঠিকরে বেরোতে থাকে। স্বগোত্রীয়রা তেমন কেউ তখনই ইসলাম গ্রহণে আগ্রহ দেখায়নি। তুফাইলের বাবা ও স্ত্রী শুধু তৎক্ষণাৎ মুসলিম হন। কিন্তু বছর কয়েকের মাঝে পুরো গোত্রের প্রায় সত্তর-আশিটি পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে নেয় এবং তুফাইলের সাথে মদিনায় হিজরতও করে।[২১৫]

দিমাদ আযদি

ইয়েমেনের আযদ শানওয়া গোত্রের এই ব্যক্তিটি একজন দক্ষ ওঝা। মক্কায় এসে গুজব শোনেন যে, মুহাম্মাদ নামের একটি লোক নাকি পাগল। নবিজি ﷺ-কে খুঁজে বের করে তাঁকে চিকিৎসা করার প্রস্তাব দেন। দাওয়াহর এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নবি ﷺ বলেন,

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ : أَمَّا بَعْدُ

"সব প্রশংসা আল্লাহর। তাঁরই মাহাত্ম্য ঘোষণা করি, সাহায্যও চাই তাঁরই

[২১৫] ইবনু হিশাম, ১/৩৮২-৩৮৫।

কাছে। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোনও শরীক নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও বার্তাবাহী।"

নবিজির বক্তব্যে দিমাদ এত মুগ্ধ হন যে, নিজে নিজে তার তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর বলেন, "জাদুকর, গণক, কবি সবার কথাই আমার শোনা হয়েছে। কিন্তু এ-রকম কোনও কথা আমি কস্মিনকালেও শুনিনি।" নবিজির বাড়িয়ে দেওয়া হাতে হাত রেখে তখনই তিনি আনুগত্য ও অনুসরণের শপথ নেন।[২১৬]

[২১৬] মুসলিম, ৮৬৮।

তৃতীয় অধ্যায়

মদীনায় হিজরত
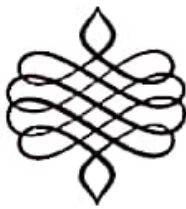
মদীনায় ইসলামের হাওয়া

নুবুওয়াতের একাদশ বছরেও যথারীতি হাজ্জের আনুষ্ঠানিকতা চলতে থাকে। হাজীদের ভিড়ে ছিলেন খাযরাজ গোত্রের ছয় ব্যক্তি আসআদ ইবনু যুরারা, আওফ ইবনুল হারিস, রাফি' ইবনু মালিক, কুতবা ইবনু আমির, উকবা ইবনু আমির এবং জাবির ইবনু আবদিল্লাহ।

আরবদের পাশাপাশি অল্প কিছু ইয়াহূদি গোত্রের বাসস্থানও এই ইয়াসরিব। প্রায়ই সেখানে তাদের সাথে আরবদের জাতিগত দ্বন্দ্ব-কলহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। ইয়াহূদি সংখ্যালঘুরা এই বলে হুমকি দিত যে, শীঘ্রই তাদের মাঝে একজন নবি আবির্ভূত হবেন। আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি ইয়াহূদিদের নেতৃত্ব দেবেন। তখন পূর্বেকার আদ এবং ইরাম জাতির মতো কচুকাটা হবে আরবরা।[২১৭]

তাই ইয়াসরিববাসী আরবরা নবি আগমনের ব্যাপারটির সাথে কিছুটা হলেও পরিচিত ছিল।

ওই ছয় জন হাজী এক রাতে মিনায় অবস্থান করছিলেন। মক্কার ঠিক বাইরেই অবস্থিত এ জায়গাটি। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দেখে এগিয়ে এলেন নবি ﷺ। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কোন গোত্রের?"

তারা জবাব দিলেন, "খাযরাজ।"

"অর্থাৎ ইয়াহূদিদের মিত্র?"

"জি।"

"চলুন, কোথাও বসে কথা বলি।"

"ঠিক আছে, চলুন।"

নবিজি ﷺ তাঁদের ইসলামের ব্যাপারে জানালেন, কুরআনের আয়াত শোনালেন এবং আহ্বান করলেন অদ্বিতীয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি ঈমান আনতে।

লোকগুলো নিজেদের মাঝে বলাবলি করলেন, "আরে! ইয়াহূদিরা আমাদের যার কথা বলে হুমকি দেয়, ওনাকে সেই ব্যক্তি বলেই মনে হচ্ছে! চলো, ওনার কাছে আনুগত্যের

[২১৭] ইবনুল কাইয়িম, যাদু মাআদ, ২/৫০।

শপথ করে ফেলি।" সকলেই ইসলাম কবুল করে নিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুযোগ করলেন, "আমাদের ওখানে পরিস্থিতি খুবই বাজে। আল্লাহ যদি আপনার মাধ্যমে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে দেন, তাহলে আপনাকে আমাদের জাতির লোকেরা কত যে সম্মান করবে!" এই নব-মুসলিমেরা কথা দিলেন যে, দেশে ফিরে তারা স্বজাতিকে ইসলামের দাওয়াত দেবেন। পরের হাজ্জ মৌসুমে নবি ﷺ-এর সাথে পুনর্বার দেখা করার প্রতিশ্রুতিও দিলেন।[২১৮]

আকাবার প্রথম বাইআত

পরের বছর ঠিকই তাঁদের মধ্যকার পাঁচ জন এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাথে করে নিয়ে আসেন নতুন আরও সাত জন মুসলিমকে, পাঁচ জন খাযরাজের এবং দু'জন আওসের। খাযরাজ গোত্রের পাঁচ জন হলেন মুআয ইবনুল হারিস, যাকওয়ান ইবনু আবদিল কাইস, উবাদা ইবনুস সামিত, ইয়াযিদ ইবনু সা'লাবা এবং আব্বাস ইবনু উবাদা। আর আওস গোত্রের দু'জনের নাম আবুল হাইসাম ইবনুত তাইহান এবং উওয়াইম ইবনু সায়িদা। রদিয়াল্লাহু আনহুম।[২১৯]

এবারকার সাক্ষাৎও হলো মিনায়। নবিজি ﷺ এখানে তাদের ইসলামের আরও কিছু বিষয় বুঝিয়ে দেন এবং বাইআত (আনুগত্যের শপথ) নিতে বলেন। ইতিহাসে এটি আকাবার প্রথম বাইআত নামে পরিচিত। এই বাইআত মূলত আল্লাহ ও মানুষের মাঝে একটি চুক্তি। চুক্তির শর্তগুলো হলো: আল্লাহর সাথে কোনও কিছুকে শরীক না করা, চুরি না করা, ব্যভিচার না করা, সন্তানদের হত্যা না করা, অপবাদ না দেওয়া এবং নবি ﷺ-এর আদেশ অমান্য না করা। এসব শর্ত যারা মেনে চলবে, তারা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করবে। আর যারা এর কোনও শর্ত ভঙ্গ করবে, অপরাধ প্রমাণিত হলে পৃথিবীতে এর শাস্তির প্রতিবিধান হবে। তবে আল্লাহ কারও পাপাচার গোপন রাখলে তিনি নিজেই তার বিচার করবেন। ক্ষমা করা ও শাস্তিপ্রদান উভয় অধিকারই রাখেন তিনি।[২২০]

---

[২১৮] ইবনু হিশাম, ১/৪২৮-৪৩০।
[২১৯] ইবনু হিশাম, ১/৪৩১-৪৩৩।
[২২০] বুখারি, ৩৮৯৩।

ইয়াসরিবে ইসলামের দাওয়াত

বাইআত গ্রহণকারীরা হাজ্জ শেষে ইয়াসরিবে ফিরে যান। নবিজি তাদের সাথে পাঠান আরেক সাহাবি মুসআব ইবনু উমাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে। উদ্দেশ্য, নব-মুসলিমদের কুরআন শেখানো। ইয়াসরিবে আবূ উমামা আসাআদ ইবনু যুরারা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘরে থাকেন মুসআব। দু'জনে মিলে পালন করেন অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াহ পৌঁছানোর মহান দায়িত্ব। একদিন মুসআব ও আবূ উমামা একটি বাগানে বসে ছিলেন। দূর থেকে তাদের খেয়াল করেন সা'দ ইবনু মুআয। তিনি আওস গোত্রের নেতা। জ্ঞাতিভাই উসাইদ ইবনু হুদাইরকে ডেকে বললেন, "গিয়ে ওদের একটা ধমকি দিয়ে আসুন তো! এরা আমাদের দুর্বল লোকদের বিভ্রান্ত করে চলেছে।" অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসতে লাগলেন উসাইদ। মুসআবকে সতর্ক করে দিয়ে আসআদ বললেন, "আপনার নিকট নিজ গোত্রপ্রধান আসছে, তাকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিন।!"

উসাইদ এসে তাদের বললেন, "তোমরা দু'জন এখানে কী জন্য এসেছ? তোমরা বোকাসোকা লোকদের ফুসলাতে এসেছ? জানের মায়া থাকলে এখনই এখান থেকে চলে যাও!"

মুসআব ভয় না পেয়ে বললেন, "আপনিও নাহয় বসে একটু শুনুন আমাদের কথা। পছন্দ হলে মানবেন, না হলে মানবেন না!"

উসাইদ সতর্ক স্বরে বললেন, "ঠিক আছে, মন্দ বলোনি।" অস্ত্র রেখে বসে পড়লেন তিনি। মুসআব তার কাছে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি ব্যাখ্যা করলেন। তিলাওয়াত করে শোনালেন কুরআনের কিছু আয়াত। উসাইদ দেখলেন যে, কথাগুলোর সাথে দ্বিমত করার কিছু নেই। ফলে তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নেন।

বদলে যাওয়া উসাইদ ফিরে আসেন সা'দ ইবনু মুআযের কাছে। ভাবলেন কীভাবে তাকেও তাদের কাছে নেওয়া যায়। ভেবে-চিন্তে বলেন, "কথা বললাম লোকগুলোর সাথে। খারাপ কিছু তো পেলাম না ওদের কথায়। তারপরও বলে দিয়েছি আর কারও সাথে যেন এসব কথা না বলে। আচ্ছা, বাদ দিন। শুনলাম আসআদ আপনার জ্ঞাতিভাই বলে বানূ হারিসা নাকি তাকে মেরে ফেলার ধান্দা করছে? আপনার সাথে কৃত চুক্তি ভেঙে ফেলতে চায় তারা?

উসাইদের বুদ্ধি কাজে দিল। সা'দ রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে মুসআব ও আসআদের কাছে

আসেন। মুসআব (রদিয়াল্লাহু আনহু) সুযোগ পেয়ে তাকেও একইভাবে ইসলামের দাওয়াত দেন। ওই বৈঠকেই ইসলাম গ্রহণ করেন সা'দ ইবনু মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু)। নবিজি ﷺ-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং দৃঢ় ঈমানের জন্য এই সাহাবি বিশেষভাবে খ্যাত।

ঈমানে টইটম্বুর অন্তর নিয়ে সা'দ ফিরে যান স্বজাতির লোকদের কাছে। বলেন, "বানূ আবদিল আশহাল, শোনো! তোমরা আমাকে কেমন লোক বলে জানো?"

তারা সমস্বরে জবাব দেয়, "আপনি শুধু আমাদের নেতাই নন, সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিও বটে।"

সা'দ বললেন, "বেশ। তাহলে শুনে রাখো। যারা আল্লাহ ও তাঁর নবির প্রতি বিশ্বাস করো না, তাদের পরিবারের সাথে আজ থেকে আমার কথা বলা বন্ধ।" ফলে সেই গোত্রের প্রতিটি নারী-পুরুষ মুসলিম হয়ে যান। বাদ থাকেন শুধু উসাইরিম। তিনি ইসলাম কবুল করেন উহুদ যুদ্ধের সময়। মুসলিম হওয়ার পর কোনও সালাতের ওয়াক্ত আসার আগেই উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন উসাইরিম (রদিয়াল্লাহু আনহু)। ইসলামের অন্য কোনও আ'মাল না করেই তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেন এবং জান্নাতের অধিকারী হন।[২২১]

পরবর্তী হাজ্জের আগেই মুসআব (রদিয়াল্লাহু আনহু) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। আল্লাহ তাআলা কীভাবে ইয়াসরিবের লোকদের ইসলামের দিকে পথ দেখাচ্ছেন, এই খোশখবর নবিজি ﷺ-কে দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর নিকট যাওয়ার প্রবল আগ্রহবোধ করেন।[২২২]

আকাবার দ্বিতীয় বাইআত

নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে ইয়াসরিব থেকে মুসলিম-মুশরিক নির্বিশেষে অনেকেই হাজ্জ করতে আসে। মুসলিমরা চাচ্ছিলেন নবি ﷺ-এর সাথে দেখা করে তাঁকে ইয়াসরিবে চলে আসার অনুরোধ করতে। তিনি ও তাঁর সাহাবিরা যে মক্কায় এত হয়রানি, গালমন্দ ও ভীতির শিকার হচ্ছেন, তা ইয়াসরিবের মুসলিমদের হৃদয়কে দুঃখ-ভারাক্রান্ত করে তোলে। তারা চাচ্ছিলেন আল্লাহর রাসূলকে ইয়াসরিবে নিয়ে

[২২১] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৩৬৩৪; আবূ নুআইম, মা'রিফাতুস সাহাবা, ১০৬৯।
[২২২] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ২/৫১; ইবনু হিশাম, ১/৪৩৫-৪৩৮।

তাঁকে নিরাপত্তা ও আনুগত্যে পূর্ণ একটি পরিবেশ উপহার দিতে। হাজ্জের পর আকাবা পর্বতগিরির কাছে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একটি রাত্রিকালীন গোপন সাক্ষাতের আয়োজন করেন।

তিয়াত্তর জন মুসলিমের সবাই একসাথে বেরোলে মক্কার পৌত্তলিকদের চোখে পড়বার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তারা আকাবায় কেউ একাকী, কেউ জোড়ায় জোড়ায় আলাদা হয়ে বের হতে থাকেন। আসন্ন ঘটনাটি পরিচিত হতে চলেছে আকাবার দ্বিতীয় বাইআত নামে। এই তিয়াত্তর জনের এগারো জন আওস গোত্রের, বাকি বাষট্টি জন খাযরাজের। এবার দু'জন নারীও আছেন তাদের সাথে। বানূ নাজ্জার গোত্রের নুসাইবা বিনতু কা'ব এবং বানূ সালামা গোত্রের আসমা বিনতু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)। সে রাতে নবিজি ﷺ-কে সঙ্গ দেন তাঁর চাচা আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব। তিনি তখনো মুসলমান হননি। কিন্তু অন্তরে ঠিকই ভাতিজার জন্য কল্যাণকামনা ছিল।

সমাবেশে আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব ঘোষণা করেন, "শুনুন সবাই। মক্কায় মুহাম্মাদ নিরাপত্তা ও সম্মান উভয়ের অধিকারী। আপনারা যদি ইয়াসরিবে তাঁর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে না পারেন, তাহলে তাঁকে মক্কাতেই থাকতে দিন।"

ইয়াসরিবের মুসলিমদের মুখপাত্র হিসেবে বারা ইবনু মা'রূর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমরা নবিজির আনুগত্য করতে বদ্ধপরিকর। তাঁর জন্য জীবনও দিয়ে দিতেও রাজি আছি। আর আমরা এ ব্যাপারে শপথ করতেও প্রস্তুত। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আলোচনা করুন এবং যা ইচ্ছা হয় শর্ত প্রয়োগ করুন।"[২২৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত শেষে ইয়াসরিববাসীদের থেকে এই শপথ গ্রহণ করেন,

"তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা করবে না, কস্মিনকালেও তাঁর সাথে কোনও শরীক নির্ধারণ করবে না। তোমরা নবির পূর্ণ আনুগত্য করবে। সচ্ছলতা ও দরিদ্রতা উভয় অবস্থায় নিজেদের সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে। ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। মানুষ অসন্তুষ্ট হলেও তোমরা আল্লাহর দাসত্বে অটল থাকবে। নিজেদের নারী-শিশু-পরিবারকে যেভাবে রক্ষা করো, আমাকেও সেভাবে রক্ষা করবে। যদি তোমরা করো তাহলে এসবের বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের জন্য জান্নাত বরাদ্দ রেখেছেন।"[২২৪]

---

[২২৩] ইবনু হিশাম, ১/৪৪০-৪৪২।

[২২৪] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩২২/৩; বাইহাকি, কুবরা, ৯/৯; ইবনু হিব্বান, ১০/৪৭৫।

উবাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনামতে, কর্তৃত্বশীলদের অবাধ্যতা না করার শপথও করা হয়েছিল। বারা ইবনু মা'রূর নবি ﷺ-এর হাত ধরে বলেন, "যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর নামে শপথ করে বলছি। নিজ পরিবারের যেভাবে প্রতিরক্ষা করি, ঠিক সেভাবেই আমরা আপনার প্রতিরক্ষা করব। আল্লাহর শপথ! আমরা যুদ্ধপ্রিয় সন্তান আর অস্ত্র আমাদের খেলনা। এ স্বভাব আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি।"

এরপর আবুল হাইসাম ইবনুত তাইহান (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা স্বজাতির সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু পুরোনো সব বন্ধন ভেঙে ফেলতে চলেছি। যদি সাফল্য ধরা দেয়, আর আপনি মক্কা বিজয় করে নেন, তাহলে কি আমাদের একা ফেলে আবার মক্কায় ফিরে যাবেন?

নবি ﷺ সহাস্যে বললেন, "মোটেও না! তোমাদের রক্ত তো আমারই রক্ত, তোমাদের কষ্ট মানে আমারও কষ্ট। আমি তোমাদের, তোমরা আমার। তোমাদের সাথে যাদের যুদ্ধ, তাদের সাথে আমারও যুদ্ধ। যাদের সাথে তোমাদের শান্তি-চুক্তি, আমারও তাদের সাথে শান্তি-চুক্তি।"

আব্বাস ইবনু উবাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) সতর্ক করলেন "ভালো করে বুঝে নিন, আপনারা কিন্তু রীতিমতো যুদ্ধের অঙ্গীকার করছেন। ধরুন আপনাদের সব সহায়-সম্পত্তি হারিয়ে গেল, নেতারা সবাই মারা গেল। তখন আবার নবিজিকে ফেলে পালাবেন না তো? অমন হলে তাঁকে মক্কাতেই থাকতে দিন। ওভাবে ছেড়ে চলে গেলে আপনারা ইহকালে এবং পরকালে চরমভাবে লাঞ্ছিত হবেন। কিন্তু যদি ঝড়ের মুখেও তাঁকে সঙ্গ দেন, তাহলে ইহকাল-পরকাল উভয় জগতেই পাবেন পরম পুরস্কার।"

আব্বাস ইবনু উবাদার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে ইয়াসরিববাসীরা কথা দেয়, যেকোনও মূল্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সহযোগিতা করে যাওয়ার। কেউ একজন বলেন, "নবিজি, এত কিছুর বিনিময়ে আমরা কী পাব?"

"জান্নাত", নবিজির সংক্ষিপ্ত ও সহজ জবাব।

ইয়াসরিববাসীরা সাগ্রহে বলে উঠলেন, "আপনার হাত এগিয়ে দিন। শপথ নিই।"

আসআদ ইবনু যুরারা (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবি ﷺ-এর হাতে হাত রেখে উপস্থিত লোকদের বললেন,

“হে ইয়াসরিববাসীগণ! দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজ আমরা আল্লাহর নবিকে খুঁজে পেয়েছি। তাঁর হাত ধরা মানে সমগ্র আরবের শত্রুতা ডেকে আনা। তাঁর সুরক্ষার জন্য নিজেদের নেতাদের মৃত্যু মেনে নেওয়া। তরবারির কান ফাটানো ঝনঝনানির জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা। যদি প্রস্তুত থাকেন, তবেই নবিজির হাত ধরুন। প্রতিদান তো আল্লাহর কাছে। কিন্তু যদি দোটানায় থাকেন, তবে এখনই পিছু হটুন। আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়া সহজ হবে।”

সমবেত জনতা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন, “আসআদ, হাত উঠান, আমাদের তাঁর হাতে হাত রাখতে দিন।”

এর পর একে একে সকলে নবিজি ﷺ-এর হাতে বাইআত নেন।[২২৫]

সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতানুসারে, প্রথম শপথ গ্রহণকারী ছিলেন আসআদ ইবনু যুরারা। তবে এক বর্ণনায় আবুল হাইসাম ইবনুত তাইহান এবং আরেক বর্ণনায় বারা ইবনু মা'রূরের নাম এসেছে।[২২৬]

এদিকে উপস্থিত মহিলাদ্বয় হাত স্পর্শ করা ছাড়াই মৌখিকভাবে বাইআত গ্রহণ করেন।[২২৭]

বারো নেতা

সকলের বাইআত গ্রহণ শেষে নবি ﷺ বারো জন নেতা নির্ধারণ করতে বলেন সবাইকে। এরা এই মুসলিম সমাজের সার্বিক বিষয়-আশয় দেখাশোনা করবেন। খাযরাজ থেকে নয় জন এবং আওস গোত্র থেকে তিন জন নির্বাচিত হন।

খাযরাজ নেতৃবৃন্দ হলেন:

- সা'দ ইবনু উবাদা
- আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা
- আসআদ ইবনু যুরারা
- রাফি' ইবনু মালিক
- সা'দ ইবনু রবীআ
- বারা ইবনু মা'রূর
- আবদুল্লাহ ইবনু আমর
- উবাদা ইবনুস সামিত
- মুনযির ইবনু আমর।

---

[২২৫] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৩/৩২২।

[২২৬] ইবনু হিশাম, ১/৪৪২-৪৪৬।

[২২৭] মুসলিম, ৪৮৩৪।

আর আওস নেতৃবর্গ:

উসাইদ ইবনু হুদাইর,

সা'দ ইবনু খাইসামা এবং

রিফাআ ইবনু আবদিল মুনযির।[২২৮] রদিয়াল্লহু আনহুম আজমাঈন।

এই বারো জনকে রাসূল ﷺ বলেন, "ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর হাওয়ারিগণের মতো তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল, আর আমি আমার সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল।" তখন সবাই বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'[২২৯]

সমাবেশ সাঙ্গ হচ্ছে, এমন সময় কোথা থেকে যেন একটি কণ্ঠ ডেকে উঠল, "এই যে তাঁবুবাসীরা, তোমরা এখনও এই মুহাম্মাদ লোকটার একটা ব্যবস্থা করছ না কেন? বদদ্বীনি ছড়িয়ে পড়ছে। সে আর তার অনুসারীরা প্রস্তুতি নিচ্ছে তোমাদের সাথে লড়াই করার।" নবিজি ﷺ-এর বুঝতে বাকি রইল না যে, এ এক জিন শয়তান। তিনি পাল্টা জবাব দিলেন, "ওরে আল্লাহর শত্রু, আমি তোর জন্য শীঘ্রই অবসর হচ্ছি।" তারপর মুসলিমদের বললেন তাড়াতাড়ি যার যার শয়নকক্ষে ফিরে যেতে। ভোরের আলো ফুটতে আর বেশি দেরি নেই।

পরদিন সকালে কুরাইশরা আকাবার সমাবেশের ব্যাপারে কিছু কানকথা জানতে পারল। ইয়াসরিববাসীদের তাঁবুর দিকে ছুটে গেল প্রতিবাদ জানাতে। তারা যাকে সমাজচ্যুত ভাবে, একদল বিদেশি এসে তাঁকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার মতো স্পর্ধা তারা মেনে নিতে পারছে না। এদিকে ইয়াসরিবের মুশরিকরা তো সেই সমাবেশের ব্যাপারে কিছু জানেই না। তারা জোর গলায় বলতে লাগল যে, এ-রকম কোনও কিছুই ঘটেনি। আর মুসলিমরা একদম চুপটি করে থাকলেন। কুরাইশরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের ইয়াসরিবি দ্বীনি ভাইদের কথা মেনে নিয়ে নিরস্ত হলো।

পরে কুরাইশরা ঠিকই টের পেয়ে যায় যে, গুজবটি আসলেই সত্যি। ক্রুদ্ধ হয়ে একদল ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে দেয় ওই বাইআতে অংশগ্রহণকারীদের ধরে আনতে। 'আযখির' নামক স্থানে এসে সা'দ ইবনু উবাদা ও মুনযির ইবনু আমরকে ধরে ফেলে তারা। মুনযির পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও সা'দকে বন্দি করে মক্কায় আনা হয়। ইয়াসরিববাসীরা মক্কা আক্রমণ করে তাদের মুসলিম ভাইটিকে ছাড়িয়ে আনার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু তার আর

---

[২২৮] কিছু সূত্রে আবুল হাইসাম ইবনুত তাইহানের নামও আছে।

[২২৯] ইবনু হিশাম, ২/৪৪৩-৪৪৬।

প্রয়োজন হয়নি। সা'দের মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন মক্কার দুই প্রভাবশালী ব্যক্তি মুত'ইম ইবনু আদি এবং হারিস ইবনু হারব। কারণ, ইয়াসরিবে তাঁদের কাফেলাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন সা'দ। মুক্তি পেয়ে তিনি বাকিদের সাথে মিলিত হন। নিরাপদে বাড়ি ফেরে সবাই।[২৩০]

মুসলমানদের মদীনায় হিজরত

আকাবার দ্বিতীয় শপথের পর নাটকীয়ভাবে সমীকরণ পাল্টে যায়। ইয়াসরিবে এখন মুসলিমদের রয়েছে শক্ত ঘাঁটি। অনতিবিলম্বে স্বয়ং নবি ﷺ ইয়াসরিবে হিজরতের আদেশ পান ওহির মাধ্যমে। সাহাবিদের বলেন, "আমাকে জানানো হয়েছে যে, মক্কা থেকে একদিন আমরা খেজুরভর্তি একটি ভূমিতে দেশান্তরী হবো। আমার মনে হলো সেটা ইয়ামামা অথবা হাজার। কিন্তু না সে জায়গা হলো ইয়াসরিব (মদীনা)।"[২৩১]

আরেকবার বলেছিলেন, "তোমরা যে ভূমিতে হিজরত করবে, সেটা আমাকে দেখানো হয়েছে। জায়গাটা আগ্নেয়গিরির দুটি পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। হয় হাজার, নয়তো ইয়াসরিব।"[২৩২]

নিরাপদ ভূমির প্রতিশ্রুতি পেয়ে কয়েকজন মুসলিম বাইআতের পরপরই ইয়াসরিবে চলে যান। প্রথম মুহাজির আবূ সালামা মাখযূমি (রদিয়াল্লাহু আনহু) অবশ্য দ্বিতীয় বাইআতের এক বছর আগেই স্ত্রী-সন্তানসহ হিজরতের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উম্মু সালামাকে তার গোত্র বাধা দেয়, ফলে তিনি একাই ইয়াসরিবে যেতে বাধ্য হন তিনি। এক বছর পর উম্মু সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে স্বামীর কাছে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়।[২৩৩]

আবূ সালামার পর হিজরত করেন আমির ইবনু রবীআ ও তাঁর স্ত্রী লাইলা বিনতু আবী হাসমা এবং আবদুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূম (রদিয়াল্লাহু আনহুম)। মক্কা থেকে বের হওয়াটা বেশ কঠিন কাজ ছিল। কারণ, কুরাইশরা সারাক্ষণ তক্কেতক্কে আছে। তবে উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) দিন-দুপুরে সবার সামনে দিয়ে হিজরত করেন। একটা আঙুল তোলারও সাহস পায়নি কুরাইশরা। শুধু একা নন, সাথে করে

[২৩০] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৪৪৭-৪৫০; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ২/৫১-৫২।

[২৩১] বুখারি, ৩৬২২।

[২৩২] বুখারি, ২২৯৭।

[২৩৩] ইবনু হিশাম, ১/৪৬৮-৪৭০।

আরও বিশ জন মুসলিমকে নিয়ে গিয়েছিলেন উমর।[২৩৪]

ধীরে ধীরে প্রায় সকল মুসলিমই একসময় ইয়াসরিব চলে যান। এমনকি আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত সাহাবিগণও বাইআতের খবর শোনার পর ইয়াসরিবে এসে অন্যদের সাথে মিলিত হন। তবে হিজরতে অক্ষম কিছু মুসলিমের সাথে মক্কায় থেকে যান আবূ বকর, আলি, সুহাইব এবং যাইদ ইবনু হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহুম)। নবিজি ﷺ-ও মক্কায় অবস্থান করে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় থাকেন। আবূ বকরকে বলেন তাঁর সাথে অপেক্ষায় থাকতে। আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট দুটি দ্রুতগামী উট ছিল। তিনি সেগুলোকে নিয়মিত বাবলা পাতা খাইয়ে আরও তরতাজা করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ তাআলার আদেশ আসামাত্র দ্রুত বেরিয়ে পড়া যায়।[২৩৫]

দারুন নাদওয়ায় বৈঠকে কুরাইশ

আরব উপদ্বীপেই মুসলিম সমাজ বিকশিত হওয়ার জন্য একটি ভূমি পেয়ে গেছে, এটা কুরাইশদের কাছে অসহ্য মনে হলো। এমনকি উত্তর দিকের ব্যবসায়িক পথগুলো মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে মুশরিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যে লাল বাতি জ্বলবে। আশঙ্কাটি একেবারে অমূলক নয়। উত্তর আরব ও সিরিয়ার মাঝে চলাচলকারী ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোর ওপর মক্কাবাসীদের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল। আবার স্বয়ং মুহাম্মাদ ﷺ কবে ইয়াসরিবে পালিয়ে যান, সে দিকেও নজর রাখতে হচ্ছে। একবার গিয়ে অনুসারীদের সাথে মিলিত হতে পারলেই তিনি সেখানে গড়ে তুলবেন মুসলিমদের শক্ত ঘাঁটি। তাই যেকোনও মূল্যে তা এড়ানো দরকার। ঠেকানো দরকার।

দারুন নাদওয়া নামক সমাবেশকেন্দ্রে এ বিষয়ে আলোচনাসভার আয়োজন করা হলো। কুরাইশের বেশির ভাগ রুই-কাতলারা সেখানে হাজির হয়। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হলো, নাজদের সম্মানিত এক প্রবীণের রূপ ধরে সেখানে উপস্থিত হয়েছে স্বয়ং ইবলীস!

উদ্বোধনী বক্তব্যে আবুল আসওয়াদ বলল, "চলুন মুহাম্মাদকে আমরাই বের করে দিই। তাহলেই আমরা চিরতরে মুক্তি পেয়ে যাব সমস্যাটা থেকে।

---

[২৩৪] বুখারি, ৩৯২৫।

[২৩৫] বুখারি, ২২৯৭।

নাজদি প্রবীণের পছন্দ হলো না বুদ্ধিটা। বলল, “পাগল হয়েছেন? দেখেন না লোকটার কথায় কত মধু? কীভাবে সে মানুষের মন জয় করে নেয়! আপনারা ওকে নির্বাসনে পাঠালে সে আরেক জায়গায় গিয়ে অন্য কোনও গোত্রের মাথা খাবে। নতুন অনুসারী দল জুটিয়ে নেবে। তারপর আপনাদের শহর কব্জায় নিয়ে আপনাদের সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করবে। না, না! এ হতে পারে না। আপনারা অন্য কিছু ভাবুন।”

“যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলে কেমন হয়? আগেকার কবিরা যেভাবে মারা যেত, সেভাবেই মারা যাবে সে।” আবুল বুখতারির পরামর্শ।

আবারও বাধা দিল নাজদি প্রবীণ, “বন্দি করার এই খবর তো একসময় তার অনুসারীদের কানে যাবেই। কসম করে বলছি যে, ওই ব্যাটারা নিজের বাপ-দাদা-সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবাসে নিজেদের এই নেতাকে। যদি তারা আক্রমণ করে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন? ওখানেই কি শেষ? ধীরে ধীরে আরও মানুষ দলে টানবে। তারপর একদিন ফিরে এসে আপনাদেরই উচ্ছেদ করবে। তাই, অন্য কোনও পরিকল্পনা করুন।”

শয়তানিতে ইবলীসের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আবূ জাহল অবশেষে নিজের কথাটা পাড়ল, “আমার একটা বুদ্ধি আছে। কেউই দেখি এখনও কথাটা তুললেন না। প্রতিটা গোত্র থেকে একজন করে শক্তিশালী, চালাক-চতুর আর সম্ভ্রান্ত যুবককে বেছে নিন। প্রত্যেকের হাতে থাকবে ধারালো তলোয়ার। এরা সবাই একসাথে মুহাম্মাদকে আক্রমণ করবে, একসাথেই আঘাত হেনে হত্যা করে আপদ বিদায় করবে। যেহেতু হত্যার দায়ভার সব গোত্রের ঘাড়ে সমানভাবে পড়বে, তাই বানূ আবদি মানাফ সবার সাথে লড়াই করার সাহস পাবে না। বড়জোর রক্তপণ চাইবে আরকি। ওটা আমরা সহজেই দিয়ে দিতে পারব।”

এবার আনন্দে লাফিয়ে উঠল নাজদি প্রবীণ, “একদম কাজের কথা। এই যুবক যা বলেছে সেটাই হলো আসল কথা!”

অবশেষে এই সিদ্ধান্তই পাকাপোক্ত করে সভা শেষ করা হলো। ভালো একটা সমাধান পেয়ে সবার মনেই কিছুটা স্বস্তি। এখন কাজ হলো সেটার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ।[২৩৬]

---

[২৩৬] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৪৮০-৪৮২।

নবি ﷺ-এর হিজরত

কুরাইশদের সলা-পরামর্শ আর আল্লাহর কুদরতি পরিকল্পনা

এর মাঝেই নবিজি ﷺ-এর কাছে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) একটি আনন্দের সংবাদ নিয়ে এলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে হিজরত করার আদেশ দিয়েছেন। ঠিক কোন সময় রওনা দিতে হবে, সেটাও বলে দিলেন জিবরীল। আরও জানালেন তাঁকে হত্যা করার কুরাইশি কুপরিকল্পনার ব্যাপারে। উপদেশ দিলেন, "নিজের বিছানায় শোবেন না।"[২৩৭]

সেদিন দুপুরবেলা। সবাই ভাতঘুমে আচ্ছন্ন। নবি ﷺ সেই সুযোগে চলে গেলেন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘরে। জানালেন সদ্য পাওয়া সুসংবাদটি। দীর্ঘ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন সেই উট দুটিকে। গাইড হিসেবে ভাড়া করলেন আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিত লাইসিকে।[২৩৮] এই ব্যক্তিটি মক্কা থেকে ইয়াসরিবে যাওয়ার পথ খুব ভালো করে চেনেন। অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে গোপনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হন। তিন রাত পর সাওর পর্বতের কাছে আবদুল্লাহকে দেখা করতে বলেন নবিজি। মাঝখানের সময়টা তিনি স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজে এমনভাবে ব্যস্ত রইলেন যে, তাঁকে দেখে কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেল না তাঁর হিজরতের পরিকল্পনা।

নবি ﷺ সাধারণত ইশার সালাতের পরপরই ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর প্রায় মাঝরাতের দিকে জেগে তাহাজ্জুদে নিমগ্ন হন। যে রাতে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ার কথা, সে রাতে তিনি আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন তাঁর বিছানায় ঘুমাতে। তবে এও নিশ্চিত করলেন যে, আলির কোনও ক্ষতি হবে না।

অবশেষে রাতে নেমে এল মক্কায়। মানুষজন সবাই গভীর ঘুমে। ঠিক তখনই রাসূল ﷺ-এর বাসগৃহকে ঘিরে দাঁড়াল দুঃসাহসী খুনিরা। মুহাম্মাদ ﷺ-এর সবুজ কাঁথাটি মুড়ি দিয়ে তাঁরই বিছানায় কেউ একজন শুয়ে আছে। পরিকল্পনা ছিল যে, তারা বাইরেই অপেক্ষা করবে। নবি বেরিয়ে আসামাত্র একসাথে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু কুরাইশরা বুঝবে কী করে যে, তাদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে আল্লাহর পরিকল্পনা সূক্ষ্মতর?

---

[২৩৭] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৪৮২।
[২৩৮] বুখারি, ২১৩৮।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾

"অবিশ্বাসীরা আপনাকে বন্দি, হত্যা বা নির্বাসিত করার চক্রান্ত করেছিল, মনে আছে? তারা চক্রান্ত করে, কিন্তু আল্লাহও পরিকল্পনা করেন। আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।"[২৩৯]

নবিজি ﷺ গৃহত্যাগ করলেন যখন

বিছানায় আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) শোয়া থাকলেও নবি ﷺ তখনো ঘরের ভেতরে। এদিকে ঘরের চারপাশে ঘিরে আছে পৃথিবীর নিকৃষ্ট গুপ্তঘাতকেরা। নবিজি ﷺ বেরিয়ে এসে এক মুঠো মাটি হাতে নিলেন। সশস্ত্র যুবকদের মাথা অভিমুখে ছুড়ে দিয়ে তিলাওয়াত করলেন,

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

"আমি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে স্থাপন করেছি একটি প্রাচীর। অতঃপর তাদের আবৃত করে দিয়েছি। ফলে তারা দেখতে পায় না।"[২৪০]

যেই ব্যক্তিটিকে হত্যা করতে এসেছিল যুবকেরা, তিনিই বেরিয়ে গেলেন তাদের চোখের ঠিক সামনে দিয়ে। অথচ কেউ দেখতেই পেল না। নবি ﷺ দ্রুত চলে গেলেন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘরে। একসাথে যাত্রা শুরু করলেন তাঁরা। কিন্তু ইয়াসরিবের দিকে নয়; বরং তার বিপরীত দিকে ইয়েমেন-অভিমুখে! ভোরের আগে পাঁচ মাইল মতো দূরত্ব অতিক্রম করে দু'জনে সাওর পর্বতের এক গুহায় আশ্রয় নিলেন।[২৪১]

এদিকে হন্তারক যুবকেরা অপেক্ষায় বসে আছে তো আছেই। ভোরবেলা আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) জেগে উঠে বাইরে আসার পরেই কেবল তাদের ভুল ভাঙল। মুহাম্মাদ ﷺ কোথায় আছেন, সে ব্যাপারে আলিকে জেরা করা হলো। কিন্তু তিনি কোনও তথ্য জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন। টেনে-হিঁচড়ে তাঁকে কা'বায় নিয়ে বন্দি করে রাখা হলেও মুখ থেকে একটা শব্দও বের করেননি তিনি। এরপর তারা আবূ বকরের ঘরেও ছুটে গেল, আবারও ব্যর্থমনস্কাম। খুঁজে পেল শুধু তাঁর মেয়ে আসমা

---

[২৩৯] সূরা আনফাল, ৮ : ৩০।

[২৪০] সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৯।

[২৪১] ইবনু হিশাম, ১/৪৮৩।

(রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনিও কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান। আবূ জাহল তাঁর কানে এত জোরে চড় মারে যে, কানের দুল খুলে ছিটকে পড়ে।[২৪২]

তন্নতন্ন করে চারিদিকে খোঁজা শুরু করা হলো মুহাম্মাদ ﷺ ও আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে। দুই পলাতকের যেকোনও একজনকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়ে দিতে পারলে এক শ উট পুরস্কারের ঘোষণাও দেওয়া হয়।[২৪৩]

গুহায় তিন রাত

ওদিকে সাওর পর্বতের গুহায় আবূ বকর আগে প্রবেশ করলেন। নবিজি ﷺ কষ্ট পেতে পারেন, এমন কোনও জিনিস থাকলে আগেই যাতে সরিয়ে ফেলা যায়। কয়েকটি গর্ত দেখতে পেয়ে কাপড়ের টুকরো দিয়ে বন্ধ করে দিলেন সেগুলো। এরপর রাসূল ﷺ ভেতরে প্রবেশ করলেন। ক্লান্তি কাটাতে ঘুমিয়ে পড়লেন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঊরুতে মাথা রেখে। হঠাৎ তাঁর পায়ে কিছু একটা দংশন করল। বিষের তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু প্রিয় নবির ঘুম ভেঙে যাবে বলে একটু নড়লেনও না তিনি। একসময় ব্যথার তীব্রতা এত বেড়ে গেল যে, নিজের অজান্তেই চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এক ফোঁটা নবিজির মুখমণ্ডলে পড়ামাত্রই ঘুম ভেঙে যায় তাঁর। দেখলেন সফরসঙ্গী বিষের ব্যথায় নীল হয়ে আছেন। দংশিত জায়গাটিতে রাসূল ﷺ নিজের লালা লাগিয়ে দিতেই ব্যথা উধাও।

টানা তিন রাত গুহায় লুকিয়ে থাকলেন দু'জনে। এ-সময়টিতে আবূ বকরের ছেলে আবদুল্লাহ কাছেই এক জায়গায় রাত্রিযাপন করতেন। তারপর ভোরবেলা এমন সময় মক্কায় ফিরে যেতেন যে, কুরাইশরা টেরই পেত না, তিনি অন্য কোথাও রাত কাটিয়ে এসেছেন। চটপটে এই তরুণ প্রতিদিন মক্কায় কুরাইশদের অপতৎপরতা সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতেন। আর রাতের বেলা খবর পৌঁছে দিতেন নবি ﷺ ও আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে।[২৪৪]

আবূ বকরের দাস আমির ইবনু ফুহাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাতের একাংশ অতিবাহিত হলে পরে গুহার কাছেই মনিবের ছাগলগুলো নিয়ে চরাতেন। ফলে প্রতিদিন পুষ্টিকর দুধের জোগান পেতে থাকেন গুহাবাসীদ্বয়। পরদিন একদম সকাল সকাল ছাগলগুলোকে একই পথ ধরে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন আমির। ফলে

---

[২৪২] ইবনু হিশাম, ১/৪৮৭।

[২৪৩] তাবারি, আত-তারীখ, ২/৩৭৪।

[২৪৪] তিবরিযি, মিশকাতুল মাসাবীহ, ৬০২৫।

বালুতে থাকা আবূ বকরের ছেলের পায়ের চিহ্নও ঢাকা পড়ে যেত।[২৪৫]

এদিকে কুরাইশের অনুসন্ধানী দলগুলো মক্কা থেকে দক্ষিণের পুরো এলাকা খোঁজাখুঁজি করে উল্টে ফেলে। একবার তারা ওই গুহার একদম মুখের কাছে চলে এসেছিল। স্রেফ একবার কিনারে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালেই পেয়ে যেত শিকারদের। কুরাইশদের এত কাছে চলে আসতে দেখে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বেশ দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন এবং ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। নবি ﷺ আশ্বস্ত করে বলেন, "আবূ বকর, এমন দু'জনের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা যাদের তৃতীয়জন হলেন, আল্লাহ। চিন্তা কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।"[২৪৬]

মদীনার পথে

রবীউল আউয়াল মাস। সোমবার রাত। চারিদিকে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো। আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর উট দুটি নিয়ে সাওর গুহার কাছে এসে হাজির হন আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিত লাইসি। সাথে ছিলেন আমির ইবনু ফুহাইরা। পথপ্রদর্শক প্রথমে তাঁদের নিয়ে দক্ষিণে ইয়েমেনের দিকে কিছুদূর যান। তারপর পশ্চিমে লোহিত সাগর অভিমুখে চলেন। সাগরের একটু আগেই আবার ঘুরে যান উত্তর দিকে ইয়াসরিব বরাবর। এই ঘুরপথটিতে খুব বেশি মানুষজন চলাচল করে না।

সারা রাত ও পরের দিনের অর্ধকাল পর্যন্ত একটানা চলার পর যাত্রাবিরতি করেন তাঁরা। নবি ﷺ একটি পাথরের ছায়ায় বিশ্রাম নেন। এদিকে এক রাখালের অনুমতি নিয়ে ছাগলের দুধ সংগ্রহ করে আনেন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। রাসূলের ঘুম ভাঙলে তাঁকে তা পান করতে দেন। তৃপ্তিসহকারে পানাহার শেষে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করেন।[২৪৭]

সম্ভবত দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। মক্কা থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে মুশাল্লালের কাছে 'কাদীদ' শহরতলিতে উম্মু মা'বাদের তাঁবু অতিক্রম করেন আল্লাহর রাসূল ﷺ ও আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করেন, চার জন ক্লান্ত পথিকের জন্য কিছু আছে কি না। কিন্তু না কিছুই নেই। উম্মু মা'বাদের ছাগলের পালও তখন বহু দূরের মাঠে। যেই একটি ছোট ছাগী রয়ে গেছে, সেটি এতই দুর্বল যে বাকিদের সাথে যেতে পারেনি। সেটি এক ফোঁটা দুধ দিতেও সক্ষম নয়।

---

[২৪৫] বুখারি, ৩৯০৫।

[২৪৬] বুখারি, ৩৬৫৩।

[২৪৭] বুখারি, ৩৬১৫।

নবি ﷺ অনুমতি নিয়ে সেই দুর্বল ছোটো ছাগীটিরই দুধ দোহাতে থাকেন। মু'জিযাস্বরূপ সেই ছাগীর ওলান এমনভাবে দুধে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, বড় একটি পাত্র ভর্তি হয়ে যায়। চার পথিকই পেট পুরে দুধপান করেন। তারপর নবিজি আবারও দোহন করে আরও এক পাত্রভর্তি দুধ রেখে যান উম্মু মা'বাদের জন্য।

পথিকেরা চলে যাবার পর ফেরেন ঘরের কর্তা আবূ মা'বাদ। স্বামীর কাছে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিলেন স্ত্রী। নবিজি ﷺ-এর এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুনে আবূ মা'বাদ বলেন, "আরে! ইনি তো কুরাইশ বংশের সেই লোক, যার কথা কিছুদিন যাবৎ শুনে আসছি। কখনও সুযোগ পেলে অবশ্যই তাঁর অনুসারী হয়ে যাব।"

নবিজি ﷺ-এর মক্কাত্যাগের তৃতীয় দিনে এক অদৃশ্য কণ্ঠ মক্কায় ঘুরে ঘুরে কিছু কথা বলতে থাকে। এ মানুষের কণ্ঠ নয়; বরং একজন জিনের। সে বলছিল,

"মানবজাতির প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা ওই দুই পথচারীকে রহম করুন। তারা উম্মু মা'বাদের তাঁবু পার হয়েছে। নিরাপদ যাত্রাবিরতি শেষে নিরাপদেই আবার পথচলা শুরু করেছে। যে-ই মুহাম্মাদের বন্ধু হয়, সে-ই সাফল্য পায়। হে কুরাইশ, মুহাম্মাদকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমরা মর্যাদা আর ক্ষমতাকে দূরে ঠেলে দিলে। বানূ কা'বের কী সৌভাগ্য! তাদের এক নারীর তাঁবু স্বয়ং মুহাম্মাদের আশ্রয় হয়েছে। নারীটিকে জিজ্ঞেস করো তার দুর্বল ছাগী আর দুধের পাত্রের ব্যাপারে। এমনকি সেই ছাগীও জানিয়ে দেবে কী ঘটেছে তার সাথে।"[২৪৮]

নবি ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীরা 'কাদীদ' ছেড়ে বেরুনোর সময় সুরাকা ইবনু মালিক ইবনি জু'শুম মুদলিজি নামের এক ব্যক্তি তাঁদের দেখে ফেলেন। পলাতকদের ধরে মক্কায় নিয়ে গিয়ে পুরস্কার পাবার লোভ জেগে ওঠে তার মনে। ঘোড়া ছুটিয়ে একটু এগোনো-মাত্রই প্রাণীটি পা হড়কে মাটিতে পড়ে যায়। সেও নিচে আছড়ে পড়ে। আরবের কুসংস্কার অনুযায়ী একটি তির বের করে ভাগ্য পরীক্ষা করল সুরাকা। ফলাফল এল নেতিবাচক। কিন্তু পুরস্কারের লোভে কুলক্ষণকে পাত্তা না দিয়েই আবার ঘোড়ায় চেপে বসল সে। এবার ঘোড়াটি এত দূর নিরাপদে দৌড়ে গেল যে, নবিজি ﷺ-এর কুরআন তিলাওয়াত সুরাকার কানে আসতে থাকে। এদিকে আবূ বকর বারবার পেছনে তাকাচ্ছেন আর উসখুস করছেন। অথচ নবিজি একেবারে নির্লিপ্ত। একটু পরেই ঘোড়ার সামনের পা দুটো একেবারে বালুতে দেবে গেল। আবারও উল্টে পড়ল আরোহী।

ঘোড়াকে গালি দিতে দিতে কোনোরকমে তার পা মাটি থেকে বের করে আনল সুরাকা।

[২৪৮] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ২/৫৩-৫৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৩/৯-১০।

কিন্তু পেছনে তাকাতেই দেখল যে, ঘোড়ার পদচিহ্ন থেকে ধোঁয়ার মতো ওপরের দিকে উঠছে বালু। তাড়াতাড়ি আরেকটি তির বের করে এবারও ভাগ্যকে প্রতিকূলে পেল। অবশেষে তার মন মেনে নিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে বন্দি করা অসম্ভব। নিজে থেকেই নবিজিকে ডাক দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। খাবারও সাধে পথিকদের। তবে তাঁরা সেটা নেননি। তবে নবি ﷺ এতটুকু অনুরোধ রাখতে বললেন, যাতে কুরাইশদের তাঁদের অবস্থান না জানানো হয়। সুরাকা তাতে রাজি হয়। ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য সে একটি চুক্তিনামা লিখে দেওয়ার অনুরোধ করে। নবিজির নির্দেশে চামড়ার একটি টুকরায় চিঠিটি লিখে দেন আমির।

সুরাকা তারপর মক্কায় ফিরে যান। অনুসন্ধানী প্রতিটি দলকে এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, এই পুরো এলাকা তিনি ইতিমধ্যে খোঁজ করে ফেলেছেন, তাদের যে উদ্দেশ্য তা তিনিই সম্পূর্ণ করেছেন।[২৪৯]

চার পথিকে যাত্রা পুনরারম্ভ করেন। একটু পরেই নবিজি ﷺ-এর দেখা হয় বুরাইদা ইবনু হুসাইব আসলামি ও তার অনুসারী প্রায় সত্তর-আশিটি পরিবারের সাথে। তারা সবাই ইসলাম কবুল করে নবিজির পেছনে ইশার সালাত আদায় করেন। উহুদের যুদ্ধের পর মদীনায় হিজরত করেন বুরাইদা।[২৫০]

'আরজ' অঞ্চলে নবিজির সাথে আরও দেখা হয় আবূ তামিম আওস ইবনু হাজর আসলামির। একটি উট দুর্বল হয়ে পড়ায় তখন নবি ﷺ ও আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) একই উটের পিঠে ছিলেন। আবূ তামিম তাঁদের একটি উট দেন এবং মাসঊদ ইবনু হুনাইদা নামক এক দাসকেও সাথে পাঠিয়ে দেন। একেবারে ইয়াসরিব পর্যন্ত দাসটি তাঁদের সঙ্গ দেয়। আবূ তামিম মুসলিম হলেও হিজরত না করে নিজভূমে রয়ে যান। পরে উহুদের যুদ্ধের সময় মাসঊদের মাধ্যমে মক্কার খবরাখবর আগাম মদীনায় পাঠিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর বিরাট উপকার করেন তিনি।[২৫১]

রীম উপত্যকায় পৌঁছে নবি ﷺ যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দেখা পান। তিনি সিরিয়াফেরত একটি ব্যবসায়ী কাফেলাকে সঙ্গ দিচ্ছিলেন। কাফেলাটি মুসলিমদেরই। নবি ﷺ ও আবূ বকরকে তিনি সাদা রঙের কাপড় উপহার দেন।[২৫২]

---

[২৪৯] বুখারি, ৩৯০৬।

[২৫০] ইবনুল আসীর, উসদুল গাবাহ, ১/২০৯।

[২৫১] ইবনুল আসীর, উসদুল গাবাহ, ১/১৭৩; ইবনু হিশাম, ১/৪৯১।

[২৫২] বুখারি, ৩৯০৬।

কুবায় আগমন

নুবুওয়াত লাভের চৌদ্দ বছর পর এক সোমবারে ইয়াসরিবের প্রান্তে কুবা নামক স্থানে এসে পৌঁছান নবি ﷺ। এই ইয়াসরিবের নাম পাল্টেই পরবর্তী সময়ে রাখা হয় আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারা (আলোকিত শহর)।

মদীনাবাসীরা প্রতিদিন বেরিয়ে পড়ত হাররার উদ্দেশ্যে। দিবসের উত্তাপ অসহ্য হয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই নবিজির জন্য অপেক্ষায় থাকত তারা। তাদের এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সেই পরমাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি এসে হাজির হন তাদের মাঝে। সাদা পোশাক পরা এই অভিযাত্রী দলটি বেশ দূর থেকে নজর কাড়ে এক ইয়াহূদির। সে ডাক দিয়ে বলে, "এই যে আরবরা! তোমরা যার অপেক্ষায় ছিলে, সে চলে এসেছে!"

মুসলিমরা হুড়মুড় করে দৌড়ে আসেন নবিজি ﷺ-কে বরণ করে নিতে। সবাই একসাথে মরুভূমির দিকে দৌড়ে আসায় কিছুক্ষণের জন্য চরম হট্টগোল বেঁধে যায়। তারপর নবি ﷺ ডান দিকে অগ্রসর হয়ে কুবায় বানূ আমর ইবনি আওফ এলাকায় আসেন।

কুবায় পৌঁছে রাসূল ﷺ উট থেকে নেমে কিছুক্ষণ চুপচাপ বিশ্রাম নেন। মদীনাবাসী মুসলিমদের বলা হয় আনসার (সাহায্যকারী)। আনসারদের অনেকেই এর আগে কখনও নবিজিকে স্বচক্ষে দেখেননি। প্রথম দেখায় তারা আবূ বকরকে আল্লাহর রাসূল ভেবে বসেন। কারণ, আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর চুল-দাড়িতে কিছুটা পাক ধরে যাওয়ায় তাকেই বেশি বয়স্ক মনে হতো। কিন্তু যখন আনসাররা দেখলেন যে, বয়স্কদর্শন ব্যক্তিটি রৌদ্র থেকে বাঁচাতে অপরজনকে কাপড় দিয়ে ছায়া দিচ্ছেন, তখন তাদের ভুল ভাঙে। বুঝতে পারে যে, আল্লাহর রাসূল হলেন ওই ব্যক্তি।[২৫৩]

নবিজি ﷺ কুবায় থাকাকালীন কুলসূম ইবনু হাদামের ঘরে অবস্থান করেছিলেন। অন্য এক সূত্রমতে, তিনি সা'দ ইবনু খাইসামার ঘরে ছিলেন। চারদিনের এই সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালেই নবিজির হাতে স্থাপিত হয় মাসজিদুল কুবার ভিত্তি। শুক্রবারে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-সহ কুবা ত্যাগ করেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। তার আগে তিনি নানাবাড়ি বানূ নাজ্জারে খবর পাঠান। সেখান থেকে আত্মীয়রা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসে নবিজির সাথে মিলিত হন। এরপর সবাই একসাথে রওনা হন মদীনা অভিমুখে।[২৫৪]

---

[২৫৩] বুখারি, ৩৯০৬।
[২৫৪] বুখারি, ৩৯০৬।

যখন বানূ সালিম ইবনি আওফের বসতিতে পৌঁছেন তখন জুমুআর সালাতের সময় হয়ে যায়। নবি ﷺ সেখানকার উপত্যকায় জুমুআর সালাত পড়ান। যাতে এক শ জন মুসলিম অংশগ্রহণ করেছিল।[২৫৫]

মদীনায় নবিজি ﷺ-এর প্রবেশ

জুমুআ শেষে নবিজি ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা আবারও মদীনার পথ ধরেন। নারী, পুরুষ ও শিশুর উৎফুল্ল ভিড় তাঁকে স্বাগত জানাতে আসে। মদীনার অলিতে-গলিতে প্রতিধ্বনিত হয় তাদের হর্ষধ্বনি। নারী ও শিশুরা গজল গেয়ে স্বাগত জানায় নবিজিকে। আজও গজলটি মুসলিমদের মুখে মুখে ধ্বনিত হয় ওই দিনটির স্মরণে, যেদিন পূর্ণিমার চাঁদের মতো মানুষটি প্রথম পা রেখেছিলেন মদীনায়—

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ••• مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعْ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ••• مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعْ

أَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا••• جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعْ

"পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের ওপর উদিত হয়েছে
সানিয়্যাতুল ওয়াদা' থেকে,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের ওপর ওয়াজিব
যত দিন কেউ আল্লাহকে ডাকে,
ওহে আল্লাহর দূত, আপনি আমাদের মাঝে
নিয়ে এসেছেন যা মান্য হবে তা কথা আর কাজে।"

মদীনার পথ ধরে চলছে আল্লাহর রাসূলের উটনী, আর একেকজন এসে একেকবার ধরছে তার লাগাম। মনে আশা, উটনীটি হয়তো তার বাড়ির সামনেই থামবে আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সে ঘরকেই বানাবেন আপন বসত। নবি ﷺ বললেন "ওকে ওরমতো চলতে দাও, আল্লাহই ওকে পথ দেখাচ্ছেন।"[২৫৬] অবশেষে হাঁটু গেড়ে বসল উটনী। কিন্তু নবিজি ﷺ নামলেন না। একটু পর উটনীটি উঠে দাঁড়িয়ে অগোছালোভাবে কিছুদূর এগিয়ে গেল। তারপর ঘুরে এসে বসল আবার ওই আগের জায়গাতেই। আর ঠিক এই

---

[২৫৫] বুখারি, ৩৯১১।

[২৫৬] ইবনু হিশাম, ১/৪৯৪; ইবনুল কাইয়্যিম, যাদুল মাআদ, ২/৫৫।

জায়গাতেই নির্মিত হয়েছে মাসজিদুন নববি (নবির মাসজিদ)।

নবিজি ﷺ-এর স্বাগতিক হতে অনেকেই প্রতিযোগিতা করে। কিন্তু সেই সৌভাগ্য জোটে শুধু আবূ আইউব আনসারি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ভাগ্যে। দ্রুত এসে উটনীর জিন ধরে ফেলেন তিনি। টেনে নিয়ে চলেন নিজের বাড়ির দিকে। নবি ﷺ কৌতুকস্বরে বলেন, "বাহন যেদিকে যাচ্ছে, আরোহীকে তো সেদিকেই যেতে হবে!" এই বলে তিনিও চললেন আবূ আইউবের সাথে। ওদিকে উটের লাগামটি ধরেন আসআদ ইবনু যুরারা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তাই উটনীর যত্ন-আত্তির সুযোগটি যায় তাঁর ঝুলিতে।[২৫৭]

নবিজি ﷺ-এর খাতির-যত্নে প্রতিযোগিতা শুরু হয় আনসার গোত্রপতিদের মাঝে। প্রতিরাতে নবিজির কাছে কমপক্ষে তিন-চার থালা খাবার উপহার আসত। রাসূলুল্লাহ যে শত্রুবিহীন, বন্ধুঘেরা এক নিরাপদ আলয়ে এসেছেন, তা বুঝিয়ে দিতে কেউ কোনও চেষ্টাই বাদ রাখেনি।

আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হিজরত

নবি ﷺ-এর মক্কাত্যাগের পর তিনদিন যাবৎ মক্কায় অবস্থান করেন আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)। এ সময়টিতে আল্লাহর রাসূলের এর কাছে যার যত আমানত ছিল, সব তার প্রাপককে বুঝিয়ে দেন তিনি। কারণ, নবি ﷺ হিজরতের সময় তার কাছেই সব দিয়ে এসেছিলেন। এরপর আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) পায়ে হেঁটে রওনা দেন একই গন্তব্যের দিকে। কুবায় এসে মিলিত হন নবিজির সাথে। নবিজি সে সময় কুলসূম ইবনু হিদামের ঘরে অবস্থান করছিলেন।[২৫৮]

নবি-পরিবারের হিজরত

মদীনায় নবিজি ﷺ-এর পদার্পণের পর ছয় মাস পেরিয়ে গেছে। মোটামুটি গোছগাছ হয়ে সংসার সামলানোর মতো অবস্থা এসেছে। তখন যাইদ ইবনু হারিসা ও আবূ রাফি' (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে মক্কায় পাঠান মুহাম্মাদ ﷺ। দু'জনে ফিরে আসেন নবিজির পরিবারের সদস্যদের নিয়ে। ফাতিমা, উম্মু কুলসূম, সাওদা, উম্মু আইমান এবং উসামা ইবনু যাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহুম) সবাই হাজির। শুধু তা-ই না। সাথে ছিলেন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পুরো পরিবারও। আবদুল্লাহ ইবনু আবী বকর, উম্মু

---

[২৫৭] ইবনু হিশাম, ১/৪৯৪-৪৯৬; যাদুল মাআদ, ২/৫৫; বুখারি, ৩৯১১

[২৫৮] ইবনু হিশাম, ১/৪৯৩; যাদুল মাআদ, ২/৫৪।

রূমান, আয়িশা এবং আসমা (রদিয়াল্লাহু আনহুম)।[২৫৯]

সুহাইব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হিজরত

নবিজির মক্কাত্যাগের পর সাহাবিদের হিজরতের ঢল নামে। সুহাইব আবূ ইয়াহইয়া (রদিয়াল্লাহু আনহু) একজন ধনী সাহাবি। অনেকদিন ধরেই তিনি মদীনাগমনের কথা ভাবছিলেন। কুরাইশদের সতর্ক নজরদারির কারণে পেরে উঠছিলেন না। অবশেষে একদিন সুযোগ চলে আসে। কুরাইশরা অবশ্য সম্পদের এত বড় এক উৎসকে নিজেদের হাতছাড়া হতে বাধা দেয়। ফলে সুহাইব একটি দাম হাঁকিয়ে বসেন। বলেন যে, তাকে মদীনায় যেতে দিলে নিজের সমুদয় সহায়-সম্পদ তিনি কুরাইশদের হাতে দিয়ে যাবেন। কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি মদীনায় এসে নবিজি ﷺ-কে জানালেন কুরাইশদের হাত থেকে নিজের স্বাধীনতা কিনে নেবার কাহিনি। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "আবূ ইয়াহইয়া, এই লেনদেনে তুমিই লাভবান হয়েছ!"[২৬০]

মক্কায় দুর্বল মুসলিমগণ

এভাবে নিজেদের বন্দিদশা সমাপ্ত করার মতো গায়ের জোর, বংশের জোর বা সম্পদের জোর সব মুসলিমের ছিল না। সংখ্যায় কমে গিয়ে তাদের অসহায়ত্ব বরং আরও বেড়ে যায়। কুরাইশরা এতে বেশ খুশি ও তৎপর হয়ে ওঠে। ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ, আয়্যাশ ইবনু আবী রবীআ এবং হিশাম ইবনুল আস (রদিয়াল্লাহু আনহুম) হলেন এমনই কয়েকজন সাহাবি। ওদিকে মদীনায় নবি ﷺ নিয়মিত তাদের জন্য এবং তাদের ধরে রাখা কাফিরদের বিরুদ্ধে সালাতে দুআ করতেন। মুসলিমরা ধৈর্য ধরে থাকেন। পরে অনেকেই মদীনাবাসী দ্বীনি ভাইদের সহায়তায় বন্দিদশা থেকে মুক্তি পান।[২৬১]

মদীনার আবহাওয়া

পৌত্তলিকদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মুমিনগণ আনন্দিত বটে। কিন্তু মদীনার জীবনও পুষ্পশয্যা নয়। আপন ঘরবাড়ি-সম্পদ চিরতরে ফেলে এসে এখন শূন্য থেকে জীবন শুরু করতে হচ্ছে মুহাজিরদের। মক্কার লোকেরা সাধারণত ব্যবসায়ী, যেখানে মদীনার মূল পেশা খেজুর চাষ। তার ওপর নতুন আবহাওয়ায় সবাই অনভ্যস্ত। অনেকেই অল্প

---

[২৫৯] যাদুল মাআদ, ২/৫৫।

[২৬০] ইবনু হিশাম, ১/৪৭৭।

[২৬১] ইবনু হিশাম, ১/৪৭৪-৪৭৬।

কয়দিনের মাঝে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েন। মুহাজিরদের মাঝে স্থানচ্যুতির এই অস্বস্তি নবিজি ﷺ-এর অগোচরে ছিল না। নবিজি দুআ করেন,

> "হে আল্লাহ, মদীনাকে আমাদের কাছে মক্কার মতোই; বরং তারচেয়ে বেশি প্রিয় করে দিন। আর এর আবহাওয়াকে সহনীয় করে দিন। বরকত দিন এখানকার ফল ও শস্যে। এখানকার জ্বরকে আপনি জুহফায় পাঠিয়ে দিন।"

আল্লাহ তাআলা এ দুআ কবুল করেন। মুহাজিরদের স্বাস্থ্যও পুনরুদ্ধার হয়, হৃদয়েও জন্ম নেয় মদীনার প্রতি গভীর টান। নবগঠিত সমাজে নতুন করে সামাজিক ও মানসিক বন্ধন তৈরির কাজ চলতে থাকে পুরোদমে।[২৬২]

মদীনার জীবনে নবি ﷺ-এর কর্মধারা

মদীনায় আসার পরপরই রাসূল ﷺ শুরু করে দেন প্রথম মুসলিম নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্র নির্মাণের তোড়জোড়। এদিকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেওয়াও সমানভাবে অব্যাহত থাকে।

মাসজিদে নববি

রাষ্ট্রনির্মাণ কাজের শুরুটা হয় একটি মাসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে। তাঁর উটনীটি যেখানে বসেছিল, সে জায়গাটি কিনে নেন নির্মাণকাজের উদ্দেশ্যে। জায়গাটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় এক শ হাত করে। ওখানটায় মুশরিকদের কয়েকটি কবর ছিল, যা সরিয়ে নেওয়া হয়। আরও ছিল কিছু খেজুর গাছ। সেগুলো তুলে নিয়ে অন্যত্র রোপণ করা হয়।

মাটি আর কাঁচা ইট দিয়ে তৈরি হয় মাসজিদের দেয়াল। আর ছাদ বানানো হয় খেজুর গাছের পাতা দিয়ে। গাছের কাণ্ডগুলো ব্যবহৃত হয় খুঁটি হিসেবে। মেঝেতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বালু আর নুড়িপাথর। দরজা ছিল তিনটি। তখন মুসলিমদের কিবলা ছিল আল-আকসায় (জেরুসালেমে) অবস্থিত বাইতুল মাকদিস। তাই মিহরাব স্থাপন করা হয় সেদিকে মুখ করেই।

মুহাজির ও আনসারদের সাথে সশরীরে নির্মাণকাজে অংশ নেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। ইট, পাথর, আর গাছের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে যেতে যেতে কাজের তালে তালে কবিতা আবৃত্তি

[২৬২] বুখারি, ১৮৮৯।

করতেন সবাই। পরিশ্রমের ক্লান্তি এতে সহজ হয়ে আসে।

নবিজি ﷺ-এর দুই স্ত্রী সাওদা বিনতু যামআ এবং আয়িশা বিনতু আবী বকর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর জন্য তৈরি করা হয় দুটি কামরা। ওই সময় নবি ﷺ-এর এই দু'জন স্ত্রীই ছিল। কামরা দুটি পাথর, মাটি ও খেজুরগাছ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।[২৬৩]

আযান

অবশেষে মুসলিমরা পেলেন একান্তই নিজেদের এক প্রার্থনাস্থল। মক্কার মতো ভয়ে ভয়ে, লুকোচুরি করে সালাত পড়ার বেদনা আর রইল না। মদীনায় মুসলিমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই জামাআতের সাথে আদায় করা শুরু করেন। তবে এ-সময় একটি সমস্যা সামনে আসে। ঠিক কোন কোন সময়ে সালাতের জন্য এসে জড়ো হতে হবে, সেটা এখনও সবার আয়ত্ত হয়নি। সাহাবিদের কাছে এ সমস্যা সমাধানের পরামর্শ চাইলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। কেউ বললেন, সালাতের সময় শঙ্খ বাজাতে, কেউ বললেন, ঘণ্টার কথা। চিরস্পষ্টভাষী উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, একজনকে ডাকার এই কাজে নিয়োগ করে দিতে। সালাতের সময় হলে সে উঁচু স্বরে বলবে,

اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ "সালাত একত্রকারী!" প্রস্তাবটি নবি ﷺ-এর পছন্দ হলো। তিনি এটিকে বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ দিলেন।

পরে আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনি আবদি রব্বিহি আনসারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখলেন। সালাতের দিকে আহ্বানের কিছু সুন্দর বাক্য তাঁকে স্বপ্নে শোনানো হয়। নবিজি ﷺ-এর কাছে স্বপ্নটির কথা জানালেন তিনি। নবিজি বুঝলেন যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আদেশ। একে বাস্তবায়ন করতে হবে। আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিলেন বিলাল ইবনু রবাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বাক্যগুলো শিখিয়ে দিতে। বিলালের কণ্ঠ বেশ বলিষ্ঠ ও সুন্দর। বাক্যগুলো শিখে নিয়ে বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) আযান দিলেন:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

"আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান।

---

[২৬৩] যাদুল মাআদ, ২/৫৬।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।
সালাতের জন্য আসুন, সালাতের জন্য আসুন।
কল্যাণের দিকে আসুন, কল্যাণের দিকে আসুন।
আল্লাহ মহান! আল্লাহ মহান! আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই।"

উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এই আহ্বান শুনেই তড়িঘড়ি করে মাসজিদে এলেন। জানালেন, "আল্লাহর কসম! ঠিক এই বাক্যগুলো আমি আজকে স্বপ্নে শুনেছি।" সেদিন থেকে ফরজ সালাতের সময়গুলোতে এই আযান এভাবেই ঘোষিত হতে থাকে বিলালের কণ্ঠে।[২৬৪]

আনসার-মুহাজির ভাই-ভাই

নবাগত দ্বীনি ভাইদের জীবনকে সহজ ও সচ্ছল করতে আনসারগণ নিজেদের মাঝে রীতিমতো প্রতিযোগিতা করতেন। কুরআনে এরই স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে,

يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِي صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"তাদের কাছে শরণার্থী হয়ে আসা মানুষদের তারা ভালোবাসে। মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, এ নিয়ে তাদের অন্তরে কোনও হিংসা নেই। নিজেদের চাহিদা সত্ত্বেও তারা মুহাজিরদের প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দেয়।"[২৬৫]

পঁয়তাল্লিশ জন মুহাজির ও তাদের আতিথেয়তাকারী আনসারদের মাঝে দৃঢ় বন্ধন তৈরি করার একটি ব্যবস্থা করে দেন নবি ﷺ। প্রত্যেক মুহাজিরকে মদীনার একেকটি পরিবারের সাথে জুড়ে দেন তিনি। ফলে তারা ওই পরিবারের সদস্য হিসেবে গণ্য হন। পরস্পরের দুঃখ তো তারা ভাগাভাগি করবেনই, এমনকি সম্পদের উত্তরাধিকারও পাবেন। পরে অবশ্য উত্তরাধিকারের বিষয়টি কুরআনের একটি আয়াতের মাধ্যমে রহিত করে দেওয়া হয়। উত্তরাধিকার শুধু রক্ত-সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ থাকে।

[২৬৪] আবূ দাউদ, ৫০২; ইবনু মাজাহ, ৫৮৮; ইবনু হিব্বান, ১৬৮১।
[২৬৫] সূরা হাশর, ৫৯ : ৯।

আনসার-মুহাজিরের এ বন্ধন কোনও দায়সারা চুক্তি ছিল না। আল্লাহর রাসূল ﷺ হুকুম করেছেন বলেই যে সবাই তিক্তমনে হুকুম পালন করছে, বিষয়টি এমন নয়; বরং গভীর আত্মীয়তার এই নবরূপ আজকের যুগে অকল্পনীয়। মক্কা থেকে আগত ভাইদের জন্য আনসারদের মনে ছিল প্রচণ্ড দায়িত্ববোধ। এমনকি একবার তারা নবিজি ﷺ-কে প্রস্তাব দেন যেন তাদের মূল্যবান খেজুরবাগানগুলোর অর্ধেকের মালিকানা মুহাজিরদের দিয়ে দেওয়া হয়। নবি ﷺ এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। নাছোড়বান্দা আনসারদের দ্বিতীয় প্রস্তাব, "তাহলে ওরা আমাদের সাথে চাষবাসে অংশ নিক। যা লাভ হবে, সেটার একটা ভাগ তারা পারিশ্রমিক হিসেবে নেবে।" এ প্রস্তাবটি নবিজির অনুমোদন পায়।[২৬৬]

সা'দ ইবনু রবীআ (রদিয়াল্লাহু আনহু) একজন সম্পদশালী আনসারি। তার সাথে জোড়া হয়েছে মুহাজির আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে। তিনি আবদুর রহমানকে নিজের অর্ধেক সম্পত্তি সেধেই ক্ষান্ত হননি। এর সাথে যোগ করেছেন, "আমার দু'জন স্ত্রী। আপনার কাকে ভালো লাগে বলুন। ওকে তালাক দিয়ে দিই। ইদ্দত শেষে আপনি তাকে বিয়ে করে নিন।"

আবদুর রহমান তার স্বাগতিকের এই প্রস্তাব আন্তরিকতার সাথে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "আল্লাহ আপনার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন।। আপনি শুধু আমাকে বলে দিন যে, এখানকার বাজারটা কোথায়।" মক্কার অন্যদের মতো তিনিও ছিলেন দক্ষ ব্যবসায়ী। বাজার থেকে পাওয়া মুনাফা দিয়ে কিছুদিনের মাঝেই তিনি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন। বিয়েও করেন এক আনসার নারীকে।[২৬৭]

ইসলামি সমাজ

মুহাজির ও আনসার পরিবারগুলোর মাঝে তৈরি হওয়া বন্ধন গড়ে তুলেছে শক্ত এক সামাজিক ভিত। একে দৃঢ়তরভাবে প্রোথিত করতে নবি ﷺ কিছু সামাজিক আচারবিধি প্রণয়ন করেন। তবে এও মনে রাখতে হবে যে, আনসার-মুহাজিররাই মদীনার একমাত্র বাসিন্দা নন। এ সমাজের বাইরেও আছে ইসলাম কবুল না করা মুশরিক ও কয়েকটি ইয়াহূদি গোত্র। সংখ্যালঘু হিসেবে মক্কায় মুসলিমরা যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, সে-রকমটা যেন এখানেও না ঘটে, সে জন্য নবি ﷺ এই দুটি অমুসলিম সমাজের সাথে একটি চুক্তি করেন। চুক্তিনামায় শর্তগুলো ছিল এ-রকম:

---

[২৬৬] বুখারি, ২২৯৪; মুসলিম, ২৫২৯।
[২৬৭] বুখারি, ৩০৪৮।

১. অন্য সমস্ত মানুষের বিপরীতে আনসার এবং তাদের সাথে চুক্তিস্বাক্ষর করা সকল গোত্র একটি একক জাতি।

২. তাদের ও মুসলিমদের মাঝে রক্তপণ পরিশোধ ও বন্দিমুক্তি ঘটবে আগের নিয়ম অনুযায়ী। মদীনার উভয় অমুসলিম গোষ্ঠী মুক্তিপণ ও রক্তপণের ব্যাপারে মুসলিমদের সহযোগিতা করবে।

৩. যেকোনও অপরাধী, বিদ্রোহী ও শত্রুপক্ষীয় সেনাদলের বিরুদ্ধে মদীনার তিনটি সমাজই ঐক্যবদ্ধ থাকবে। চাই সে সকল অপরাধী তাদের আপন সন্তানই হোক না কেন।

৪. কোনও অমুসলিমকে হত্যার বদলে কোনও মুসলিমকে হত্যা করতে পারবে না। মুসলিমের বিরুদ্ধে অমুসলিমকে সাহায্যও করা যাবে না।

৫. আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব সবার এক। সুতরাং সাধারণ কেউও যদি কাউকে নিরাপত্তা দান করে তবে তা সবাই ওপরই প্রযোজ্য হবে।

৬. ইয়াহূদিদের মধ্য থেকে কেউ মুসলিম হলে তাকে অন্য মুসলিমদের মতোই গণ্য করা হবে।

৭. মুসলমানদের চুক্তি এক হবে।

৮. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও মুসলিমকে হত্যাকারী ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে, যদি না ভুক্তভোগীর পরিবার খুনিকে ক্ষমা করে দেয়। খুনির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সকল মুসলিমের ওপর বাধ্যতামূলক।

৯. মুসলিমদের মাঝে বিভেদসৃষ্টিকারী কিংবা ইসলামের কোনও বিধান বিকৃতকারীকে সমর্থন করা সকল মুসলিমের জন্য অবৈধ।

১০. তিন সমাজের মাঝে উদ্ভূত যেকোনও বিবাদ মীমাংসা করবেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ।[২৬৮]

মুসলিমদের জন্য এই চুক্তিনামা এক মাইলফলক। এক পবিত্র শপথের মাধ্যমে এখন মুসলিমরা পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধ। ভবিষ্যতে নিজেদের মাঝে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা অটুট রেখে তাদের প্রমাণ করতে হবে যে, চুক্তি ফলপ্রসূ হয়েছে।

মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে চুক্তিনামা তৈরি থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমরা এখন

[২৬৮] ইবনু হিশাম, ১/৫০২-৫০৪।

নিজেদের মতো করে শর্তাবলি তৈরি করার মতো যথেষ্ট প্রতাপশালী। মুশরিকদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, চাইলেই তারা এখন মুসলিম কর্তৃপক্ষের সাথে বিদ্রোহ করে বসতে পারবে না।

মদীনার অধিকাংশ গোত্রপতি ও প্রভাবশালীই মুসলিম হয়ে গেছেন। ইসলামবিরোধীদের এখন আর খোলাখুলি বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ নেই। নতুন এই ক্ষমতাকাঠামোতে অসন্তুষ্ট অমুসলিমরা যেন মিত্রতার আশায় মক্কার দিকে ঝুঁকে না পড়ে, সে ব্যবস্থাও করেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। তিনি অমুসলিমদের এই শর্তে সম্মত করান যে, "আমরা কুরাইশদের কোনও মুশরিককে আশ্রয়ও দেবো না এবং মুসলিমদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাধা হয়েও দাঁড়াব না।"

মুসলিম ও ইয়াহূদিদের মাঝে নবি ﷺ আলাদা একটি চুক্তি করেন:

১. ইয়াহূদি ও মুসলিমরা দুটি আলাদা জাতি হিসেবে বাস করবে। প্রত্যেকের থাকবে নিজস্ব জীবনপদ্ধতি। নিজ নিজ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দায়িত্বও থাকবে যার যার।

২. উভয় জাতি জোটবদ্ধ হয়ে শহরের ওপর যেকোনও আক্রমণ প্রতিহত করবে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ জনগণের প্রতিরক্ষা করবে।

৩. উভয় জাতি শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করবে। কোনোক্রমেই একে অপরের কাজে নাক গলাবে না অথবা পরস্পরের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা করবে না।

৪. এক জাতির অপরাধের জন্য তার মিত্র জাতিকে পাকড়াও করা হবে না।

৫. অত্যাচারিতদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।

৬. যুদ্ধের ব্যয়ভার উভয় জাতি বহন করবে।

৭. বিদ্রোহ ও অন্যায় রক্তপাত উভয় জাতির জন্য অবৈধ।

৮. সকল বিবাদের মীমাংসা করবেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ।

৯. কুরাইশ বা তাদের মিত্রদের কোনও সাহায্য বা আশ্রয় দেওয়া যাবে না।

১০. এই চুক্তি কোনও অন্যায়কারী ও অপরাধীকে নিরাপত্তা দেবে না।[২৬১]

এ চুক্তির ফলে মদীনার তিনটি জাতির মাঝে ঐক্য তৈরি হয় আর মুহাম্মাদ ﷺ এ রাষ্ট্রের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আসীন হন। সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব ও অধিকার

---

[২৬১] ইবনু হিশাম, ১/৫০২-৫০৪।

বুঝে নেওয়ার পর নবি ﷺ সক্রিয়ভাবে অপর দুই জাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে শুরু করেন। অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আর নিজেদের ধর্ম আঁকড়ে থাকা লোকেরাও ক্ষমতাসীন মুসলিম কর্তৃপক্ষের সাথে নির্ঝঞ্ঝাট সহাবস্থান করে। তবে কোনও একটি গোষ্ঠীর কাছেও ইসলাম পছন্দ নয়, নয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানও। তাদের একাংশ বাহ্যিকভাবে মুসলিম হয়, যাতে ইসলামি সমাজে ঘুণপোকার কাজ করতে পারে। এদেরই পরে নাম দেওয়া হয় মুনাফিক। তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই। বিদ্বেষী অমুসলিমদের সাথে মিলে তারাই পরিণত হয় মদীনার শান্তি-নিরাপত্তার প্রতি সবচেয়ে বড় হুমকিতে।

চতুর্থ অধ্যায়

সামরিক অভিযান
(গযওয়া ও সারিয়্যা)

উদীয়মান হুমকি

মদীনার নিরাপত্তা ও শান্তি অটুট রাখতে নবিজি ﷺ-এর এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য কুরাইশরা সুযোগ খুঁজতে থাকে। মদীনার মুশরিকদের কাছে তারা আদেশ পাঠায়, যেন শহর থেকে মুসলিমদের বের করে দেওয়া হয়। সাহায্য না পেলে তাদের শিশুদের হত্যা করা ও নারীদের বন্দি করার হুমকি দেয় কুরাইশরা। নবি ﷺ এই গোপন বার্তা-চালাচালির খবর উদ্ঘাটন করে সমাধানের ব্যবস্থা নেন। মদীনার মুশরিকদের নসীহত করেন এবং খুব করে বলে দেন, যেন তারা কুরাইশদের হুমকি-ধমকিতে ভয় না পায়। নবি ﷺ-এর কথা শুনে তারা তাদের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসে।[২৭০]

ঘটনার মোড় ঘুরে যাওয়ায় কুরাইশদের অস্থিরতা বেড়ে চলে। তা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়, যখন সা'দ ইবনু মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু) উমরা করতে মক্কা যান। সাথে ছিলেন আবূ সফওয়ান উমাইয়া ইবনু খালাফ। দু'জনে কা'বা তওয়াফ করার সময় তাদের সাথে দেখা হয় আবূ জাহলের। সা'দকে দেখেই সে চিনতে পারে যে, ইনি ইসলাম কবুল করা একজন মদীনাবাসী। দাঁত কিড়মিড় করে বলে, "বাহ! আপনি তাহলে বিধর্মীদেরও আশ্রয় দিচ্ছেন, আবার মক্কায় এসে নিরাপদে ঘুরেও বেড়াচ্ছেন? আল্লাহর কসম! আবূ সফওয়ান আপনার সাথে না থাকলে আজ আপনি নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারতেন না।"

আবূ জাহলের হুমকি থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমদের কা'বা থেকে দূরে রেখেই ক্ষান্ত হবে না তারা; বরং নিরস্ত্র কোনও মুসলিমকে পেলে হত্যা করতেও বদ্ধপরিকর।[২৭১]

এমনই আরও এক হুমকির নাম মদীনার ইয়াহূদি গোত্রগুলো। মদীনাবাসী গোত্রদ্বয় আওস ও খাযরাজের মাঝে পুরোনো শত্রুতা উসকে দিতে তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। বিকাশমান মুসলিম সমাজ ভেতর-বাহির সব জায়গা থেকে শত্রুতার সম্মুখীন হতে থাকে। রক্তপাতের সম্ভাবনা এতই বেড়ে যায় যে, মুসলিমরা ঘুমোতেও যেতেন মাথার কাছে অস্ত্র রেখে। নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথেও থাকত সশস্ত্র দেহরক্ষী:

---

[২৭০] আবূ দাউদ, ৩০০৪।
[২৭১] বুখারি, ৩৬৩২।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

"আল্লাহই আপনাকে মানুষের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখবেন।"[২৭২]

লড়াইয়ের অনুমতি

এ পর্যন্ত নবি ﷺ ও মুসলিমদের প্রতি নির্দেশ ছিল সকল অপমান-লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করার। কিন্তু এখন মুসলিমরা যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে। সক্ষমতার এই পরিবর্তনে শত্রুপক্ষের তৎপরতা আরও বেড়ে যায়। অবশেষে অত্যাচারকারীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেন আল্লাহ তাআলা। এই অনুমতি পরে আদেশে পরিণত হয়। অনুমতিটি অবতীর্ণ হয় ধাপে ধাপে।

১. প্রথমে অনুমতি দেওয়া হয় শুধু কুরাইশদের বিরুদ্ধে লড়তে। কারণ, এরাই মক্কায় মুসলিমদের প্রথম নিপীড়ক। তাদের মালামাল ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকারও পান মুসলিমরা। তবে যেসব গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি আছে, তাদের সাথে এ আচরণ করা যাবে না।

২. কুরাইশদের সাথে মিত্রতাকারী অথবা সরাসরি মুসলিমদের অত্যাচারকারী অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্রের বিরুদ্ধেও যুদ্ধের অনুমতি আসে।

৩. তারপর অনুমোদিত হয় চুক্তিভঙ্গকারী যেকোনও ইয়াহূদি গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে তাদের সাথে চুক্তি এমনিতেই বাতিল বলে গণ্য হয়।

৪. এরপর আসে মুসলিমদের উত্ত্যক্তকারী ও নিপীড়নকারী আহলে কিতাব (খ্রিষ্টান ও ইয়াহূদি) জাতিগুলোর সাথে যুদ্ধের অনুমোদন। তবে আহলে কিতাবরা ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে জিযইয়া কর পরিশোধে সম্মত হলে তাদের সাথে লড়াই করা যাবে না।

অবশেষে ইসলাম গ্রহণকারী যেকোনও মুশরিক, ইয়াহূদি বা খ্রিষ্টানের সাথে শান্তি স্থাপন করতে এবং তাদের জান-মালের অধিকার সংরক্ষণ করতে আদেশ করা হয় মুসলিমদের।

---

[২৭২] সূরা মাইদা, ৫ : ৬৭।

যুদ্ধ ও অভিযানসমূহ

একসময়ের দুর্বল নিপীড়িত সমাজটিই এখন নবিজি ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে পরিণত হয় সামর্থ্যবান শক্তিশালী এক সামরিক বাহিনীতে। এরা এখন লড়াই করে বাঁচবে। মুখ বুজে আর সইবে না কোনও গোত্রের নির্যাতন, নিপীড়ন ও অত্যাচার। তিরন্দাজি এবং ঘোড়সওয়ারি নিয়মিত দক্ষতা অনুশীলনকর্মের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। নবি ﷺ মুসলিমদের কয়েকটি ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে বিভক্ত করেন। নানা দিকে তাদের অভিযানে পাঠানো হতো। একে বলা হয় সারিয়্যা। কখনও স্বয়ং নবিজি ﷺ এসব অভিযানে অংশ নিতেন। সশরীরে অংশ নেওয়া এসব অভিযানকে বলা হয় গযওয়া।

অশ্বারোহী বাহিনীগুলোর কাজ মূলত চারটি। **প্রথমত**, মদীনার সীমান্তপ্রহরা এবং কোনও সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তথ্য জোগাড় করা।

দ্বিতীয়ত, এই এলাকা দিয়ে পার হতে যাওয়া মাক্কি কাফেলাগুলো আক্রমণ করা। অনেক মুসলিম নিজেদের সব সহায়-সম্পদ মক্কায় ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাই কুরাইশ অর্থায়নে পরিচালিত কাফেলা আক্রমণ করে প্রতিশোধ গ্রহণ বৈধ।

তৃতীয়ত, মদীনার বাইরের গোত্রগুলোর সাথে চুক্তি স্থাপন। যাতে এরা কুরাইশদের সাথে মিত্রতা করে না বসে, তাই রাসূল ﷺ তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন।

চতুর্থত, সারা আরবজুড়ে ইসলামের বার্তা প্রচার করা।

নবিজি ﷺ প্রথম যেই সারিয়্যা প্রেরণ করেন, সেটি সারিয়্যায়ে সীফুল বাহর নামে পরিচিত। প্রথম হিজরি সনের রমাদান মাসে এটি সংঘটিত হয়। ত্রিশ জন মুহাজিরের এ বাহিনীতে নেতৃত্ব দেন নবিজির চাচা হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু)। আইসের সীমানায় লোহিত সাগরের উপকূলের দিকে ছুটে চলেন তারা। সেখানে দেখা পান আবূ জাহলের নেতৃত্বে সিরিয়াফেরত একটি কাফেলার। উভয় পক্ষের মাঝে সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম। প্রস্তুতি সুসম্পন্ন। কিন্তু মাজদি ইবনু আমর জুহানির মধ্যস্থতায় সে যাত্রায় ঝামেলা মিটমাট হয়ে যায়।

এটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সারিয়্যা। মুসলিমদের পতাকা ছিল সাদা রঙের। এটি বহন করেন আবূ মারসাদ ইবনু হুসাইন গানাভি (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

পরের মাসগুলোতে আল্লাহর রাসূল ﷺ একের পর এক কয়েকটি সারিয়্যা প্রেরণ

করেন। বাতনু রাবিগের উদ্দেশে ষাট জন মুহাজিরের এক বাহিনী নিয়ে ধাবিত হন আবূ উবাইদা ইবনুল হারিস (রদিয়াল্লাহু আনহু)। আবূ সুফ্ইয়ানসহ দুই শ জন মক্কাবাসীর এক কাফেলার দেখা মেলে সেখানে। উভয়পক্ষ থেকে তির নিক্ষেপ হলেও কোনও মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়নি।

খারারের কাছে রাবিগ অঞ্চলে বিশ জন মুহাজিরকে নেতৃত্ব দিয়ে অগ্রসর হন সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)। সে অভিযানেও কোনও লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি।

তারপর দ্বিতীয় হিজরি সনের সফর মাসে সত্তর জন মুহাজিরকে নিয়ে অভিযানে বের হন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ। আবওয়া অথবা ওয়াদদানের উদ্দেশে যাত্রা করেন তাঁরা। এবারও তারা কোনও শত্রুর মুখোমুখি হননি। তবে এই অভিযানকালে আমর ইবনু মাখশি দামরির সাথে নবিজি ﷺ-এর একটি শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হয়।

পরের মাসে (রবীউল আউয়াল) নবি ﷺ আরেকটি দল নিয়ে রাদওয়ার সীমানায় বুওয়াত এলাকায় যান। সেখানেও কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

একই মাসে কুরয ইবনু জাবির ফিহরি মুসলিমদের মালিকানাধীন কিছু গবাদি পশুকে চারণভূমি থেকে তাড়া দেয়। নবি ﷺ সত্তর জন মুহাজির সৈন্যকে সাথে নিয়ে ধাওয়া করেন তাকে। বদরের প্রান্তে সাফাওয়ান পর্যন্ত পিছু নেন। কিন্তু সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়। এ অভিযানটি 'বদরের প্রথম যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

একই বছরের জুমাদাল ঊলা কিংবা জুমাদাল আখিরাহ মাসে দুই শ বা আড়াই শ মুহাজিরের আরেকটি দলের নবি ﷺ নেতৃত্ব দেন। এ দলটির উদ্দেশ্য ছিল যুল উশাইরা এলাকায় একটি সিরিয়াগামী কাফেলাকে আক্রমণ করা। তবে তাঁরা পৌঁছানোর কয়েকদিন আগেই কাফেলাটি সে স্থান পেরিয়ে যায়। এ অভিযানের সময় বানূ মাদলাজের সাথে রাসূল ﷺ এর একটি শান্তিচুক্তি করেন।

সে বছরেরই রজব মাসে মক্কা ও তায়িফের মধ্যবর্তী নাখলা অঞ্চলে একটি গুপ্তচরদল পাঠানো হয়। বারো জন মুহাজিরবিশিষ্ট সে দলের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু জাহশ আসাদি (রদিয়াল্লাহু আনহু)। উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশ অর্থায়নে পরিচালিত একটি কাফেলার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা। মুসলিম সেনারা কাফেলাটিকে আক্রমণ করে একজনকে হত্যা করেন। আরও দু'জনকে বন্দি করে নিয়ে আসেন মদীনায়। নবি ﷺ এ সংবাদে বেশ রুষ্ট হন। বন্দিদের মুক্তি এবং মৃতের পরিবারকে রক্তপণ প্রদান করেন তিনি। কুরাইশরা এ ঘটনায় মারাত্মক হই-হল্লা শুরু করে দেয়। কারণ, রজব মাস চারটি

পবিত্র মাসের একটি, যে সময় রক্তপাত নিষিদ্ধ। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

"নিষিদ্ধ মাসে রক্তপাতের ব্যাপারে তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, এ-সকল মাসে লড়াই করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কিন্তু মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা প্রদান, তাঁর প্রতি অবিশ্বাস করা, মাসজিদুল হারামে (কা'বা) যেতে বাধা দেওয়া এবং এর অধিবাসীদের বিতাড়িত করা আল্লাহর নিকট এরচেয়ে বেশি গর্হিত অপরাধ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ।"[২৭৩]

নতুন কিবলা

দোসরা হিজরি সনের শা'বান মাসে বাইতুল মাকদিসের বদলে মক্কার কা'বাকে মুসলিমদের কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। কুরআনের একটি আয়াতের মাধ্যমে এই পরিবর্তন কার্যকর করা হয়। নবি ﷺ ও মুসলিমগণ এ পরিবর্তনে খুবই আনন্দিত হন। কিন্তু লোক দেখাতে ইসলাম কবুল করা মুনাফিকরা এ ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। তাদের মাঝে অনেকেই ইয়াহূদি ও মূর্তিপূজা ধর্মে ফেরত গিয়ে মুসলিম সমাজকে অনেকাংশে আবর্জনামুক্ত করে ফেলে।[২৭৪]

বদরের যুদ্ধ (১৭ রমাদান, ২য় হিজরি)

এ পর্যন্ত হয়ে আসা মুসলিম সামরিক অভিযানগুলো ছিল ছোটখাটো। এগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল তদন্ত ও তথ্য জোগাড়। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের পদার্পণের সূচনাটা অবশ্য এর মাধ্যমে হয়ে গেছে। তবে মুসলিম ও কুরাইশদের মাঝে প্রথমবারের মতো একটা এসপার-ওসপার হয়ে যায় বদরের যুদ্ধের মাধ্যমে। ইসলামি ইতিহাসে এ যুদ্ধ এক মাইলফলক।

মক্কা থেকে সিরিয়াগামী একটি কাফেলাকে বাধা দিতে নবি ﷺ যুল উশাইরায় যান। কিন্তু কাফেলাটি আগেই সিরিয়ায় পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। তাই রাসূল ﷺ দু'জন

---

[২৭৩] সূরা বাকারা, ২ : ২১৭।

[২৭৪] ইবনু হিশাম, ১/৫৯১-৬০৫; যাদুল মাআদ।

সেনাকে সিরিয়ার 'হাওরা'য় পাঠিয়ে দেন কাফেলাটির ফিরে আসার দিনক্ষণের ওপর নজর রাখতে। গুপ্তচরেরা কাফেলাটিকে ফিরে আসতে দেখে দ্রুত মদীনায় সংবাদ নিয়ে আসেন। নবি ﷺ খবরটি পাওয়ামাত্রই প্রস্তুত করে ফেলেন ৩১৩, ৩১৪ বা ৩১৭ জনের একটি দল। এর মধ্যে ৮২, ৮৩ বা ৮৬ জন মুহাজির আর বাকিরা ছিল আনসার। আওস গোত্রের ৬১ জন এবং খাযরাজ গোত্রের ছিল ১৭০ জন। এতে ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া ও সত্তরটি উট।[২৭৫]

মদীনা থেকে ১৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর প্রান্তরের দিকে রওনা হন তিনি।

মুসআব ইবনু উমাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিম বাহিনীর সাদা পতাকাটি বহনের গৌরব লাভ করেন। মুহাজির ও আনসারদের জন্য ছিল পৃথক দুটি পতাকা, যা বহন করেন যথাক্রমে আলি ইবনু আবী তালিব এবং সা'দ ইবনু মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)। আর মদীনার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়ে আসেন আবদুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূম (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে। তবে কাফেলা 'রাওহা' পৌঁছালে তার স্থানে আবূ লুবাবা ইবনুল মুনযির (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাঠিয়ে দেন।

পাহাড়ে ঘেরা বদর প্রান্তরে তিন দিক থেকে ঢোকা যায়। দক্ষিণের রাস্তাটিকে বলা হতো 'আল-উদওয়াতুল কুসওয়া'(اَلْعُدْوَةُ الْقُصْوَى) —নিকটবর্তী প্রান্ত। আর উত্তর দিক থেকে আসা রাস্তাটি 'আল-উদওয়াতুদ দুনইয়া'(اَلْعُدْوَةُ الدُّنْيَا) —দূরবর্তী প্রান্ত। মদীনার লোকেরা প্রধান যে রাস্তাটি ধরে সেখানে আসেন, তা পূর্বদিকে। বদর প্রান্তরে কিছু ঘরবাড়ি, কুয়া ও বাগান রয়েছে। যার কারণে সিরিয়াগামী মাক্কি কাফেলাগুলো এ পথ ধরেই যায়। সাধারণত এ জায়গায় কয়েক ঘণ্টা থেকে আরম্ভ করে কয়েক দিন পর্যন্ত যাত্রাবিরতি করা হয়।

তিনটি রাস্তায় আলাদা আলাদা প্রহরা বসিয়ে দিলেই কাফেলা সহজে বন্দি হয়ে যেত। কিন্তু সাফল্য নির্ভর করছিল প্রতিপক্ষকে কতটা চমকে দেওয়া যায় তার ওপর। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কাফেলাটিকে আগে বদরে ঢুকতে দেওয়া হবে। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে পালানোর তিনটি পথই বন্ধ করে দিয়ে তাদের এক জায়গায় আটকে দেওয়া হবে। তাই নবি ﷺ ও তাঁর সেনারা বদরের উল্টো দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মদীনা থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে আসার পর ঘুরে গিয়ে আবার সরাসরি বদরের পথ ধরেন।

মুসলিমদের নিশানায় থাকা এই কাফেলার নেতৃত্বে আছেন আবূ সুফইয়ান ইবনু হারব।

[২৭৫] বুখারি, ৩৯৫৬।

চল্লিশ জনের কাফেলায় ১,০০০ উটের পিঠে প্রায় ৫০ হাজার দীনার মূল্যের মালামাল। আবূ সুফইয়ান অত্যন্ত চৌকস লোক। মুসলিমদের গতিবিধির ব্যাপারে তিনি প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে নিয়ে পথ চলছেন। বদর থেকে বহু দূরে থাকতেই তিনি বের করে ফেলেন যে, মুসলিমদের একটি বাহিনী মদীনা থেকে বের হয়েছে। ত্বরিত পরিকল্পনা করে কাফেলার মুখ ঘুরিয়ে দেন পশ্চিমে উপকূলের দিকে। বদর এলাকা একেবারেই এড়িয়ে যাওয়াটা উদ্দেশ্য। তা ছাড়া সাহায্য চেয়ে মক্কায় খবরও পাঠালেন একজনকে দিয়ে।

কুরাইশরা আবূ সুফইয়ানের এই বার্তা পাওয়ামাত্র ত্বরিতগতিতে প্রায় ১৩০০ জনের একটি বাহিনী তৈরি করে ফেলে। আবূ লাহাব ছাড়া মক্কার বাকি সব রুই-কাতলা এ বাহিনীতে যোগ দেয়। সেই সাথে আশপাশের গোত্র থেকে যত লোক জোগাড় করা গেছে, সবাইকেই যুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। মক্কার গোত্রগুলোর মধ্য থেকে বানূ আদি শুধু অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়।

পৌত্তলিক বাহিনী জুহফায় পৌঁছে খবর পায় যে, আবূ সুফইয়ানের কাফেলা এখন নিরাপদ। তাদের বাহিনী যেন মক্কায় ফিরে যায়। সবাই সেটাই করত, কিন্তু বেঁকে বসল আবূ জাহল। তার চাপাচাপিতে সবাইকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হয়। তবে মিত্র গোত্রপতি আখনাস ইবনু শারীক সাকাফির নির্দেশ অনুযায়ী ফিরে যায় শুধু বানূ যাহরা গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৩০০ জন। বাকি এক হাজার জন যুদ্ধযাত্রা জারি রাখে। আল-উদওয়াতুল কুসওয়াতে পৌঁছে কুরাইশ মুশরিকরা বিস্তীর্ণ একটি ময়দানে শিবির গাড়ে। জায়গাটি বদরকে ঘিরে রাখা পাহাড়গুলোর ঠিক পেছনেই।

অবস্থার এই পটপরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারেন নবি ﷺ। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করতে বসেন সঙ্গীদের সাথে। আবূ বকর ও উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) নিজ নিজ মত দেন। পুরো বাহিনীর মনে যা ছিল, তা মুখে উচ্চারণ করেন মিকদাদ (রদিয়াল্লাহু আনহু),

"হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম! বানী ইসরাঈল মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে যেমনটি বলেছিল আমরা আপনাকে কক্ষনো তা বলব না।

فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾

'আপনি আর আপনার রব গিয়ে লড়াই করুন। আমরা এখানেই বসলাম।'[২৭৬]

[২৭৬] সূরা মাইদা, ৫ : ২৪।

বরং আমরা আপনার সাথে করেই যুদ্ধে যাব। আপনার ডানে, বামে, সামনে, পেছনে সারি বেধে লড়াই করব।”

মিকদাদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথায় রাসূল ﷺ খুব খুশি হলেন, যা তাঁর চেহারায়ও প্রকাশ পেল।[২৭৭]

তিনি চিন্তিত ছিলেন যে, আনসাররা হয়তো নিজে থেকে আক্রমণে যাবে না। মদীনা আক্রান্ত হলেই কেবল রক্ষণাত্মক যুদ্ধ করবে। এমনিতেও আকাবার দ্বিতীয় শপথে শহরের বাইরে যুদ্ধ করার ব্যাপারে কোনও শর্ত ছিল না।

নবি ﷺ বললেন, “হে মুসলমানগণ, তোমরা সবাই আমাকে পরামর্শ দাও।” আনসারদের সর্দার সা'দ ইবনু মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন,

“ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি হয়তো আমাদের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন যে সত্তা, তাঁর নামে কসম করে বলছি, আপনি যদি সাগরেও ঝাঁপ দেন, আমরা তা-ই করব। একজনও পেছনে পড়ে থাকব না। যদি শত্রুর সাথে সংঘর্ষে জড়ান, নির্দ্বিধায় আমরা আপনার অনুসরণ করব। আমরা যুদ্ধে দৃঢ় আর সংঘাতকালে সাহসী।”

তা শুনে নবি ﷺ বললেন,

“আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ নাও। তিনি দুটি জিনিসের একটি অবশ্যই আমাদের দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। হয় কাফেলার মালামাল, আর নয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়। আল্লাহর কসম! আমি যুদ্ধের ময়দান দেখতে পাচ্ছি। ঠিক যে যে জায়গায় তারা মারা পড়বে, তাও স্পষ্ট দেখছি।”

দৃঢ়প্রত্যয়ে সাহাবিদের বদরে নিয়ে চললেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। কুরাইশদের সাথে একই রাতে বদরে এসে পৌঁছালেন তাঁরা। মুসলিমরা শিবির স্থাপন করেন আল-উদওয়াতুদ দুনইয়ায়। কিন্তু হুবাব ইবনুল মুনযির (রদিয়াল্লাহু আনহু) পরামর্শ দেন যে, আরেকটু আগে বেড়ে নিকটতম কুয়ার ধারে শিবির করলে ভালো হবে। তাহলে যথেষ্ট পানি মজুদ রাখা যাবে। সেই সাথে অন্যান্য কূপগুলোও ভরাট করে দেওয়া যায়, ফলে কুরাইশরা পানি সংকটে পড়বে। হুবাবের এই দুর্দান্ত বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শানুযায়ী কাজ করেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। নবিজি ﷺ-এর জন্য খেজুর গাছে ঘেরা ছোট একটি জায়গায় তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধকালে তিনি এখান থেকে দিকনির্দেশনা দেবেন।

[২৭৭] বুখারি, ৩৯৫২।

সা'দ ইবনু মুআযের নেতৃত্বাধীনে আনসার যুবকদের একটি দল প্রহরীর কাজ করেন। সেখান থেকেই নবি ﷺ সৈন্যবাহিনীকে তারতীব দিয়েছিলেন।[২৭৮]

নবি ﷺ এরপর কয়েকজনকে সাথে নিয়ে বদরের চারদিকে হেঁটে বেড়ান। একেকটা জায়গা দেখিয়ে বলেন, "ঠিক এই জায়গায় কালকের যুদ্ধে অমুক মারা যাবে। ওই জায়গায় অমুক মারা পড়বে, ইনশা আল্লাহ।"[২৭৯]

একটি গাছের ধারে সালাতে দাঁড়িয়ে রাত কাটান তিনি। রাতে আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে সাহাবিদের প্রশান্তির ঘুম হয়, চনমনে মন-মেজাজ নিয়ে ভোরে জেগে ওঠেন তারা। মুমিনদের ওপর এসব অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

"সেদিন আল্লাহ তোমাদের নিরাপত্তার চাদরের মতো এক তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলেন। আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়ে পবিত্র করেছেন তোমাদের। সেই সাথে তোমাদের ওপর থেকে দূর করে দিয়েছেন শয়তানের কুপ্রভাবও। অটল রেখেছেন তোমাদের অন্তর, করেছেন দৃঢ়পদ।"[২৮০]

পরদিন সকালবেলা (শুক্রবার, ১৭ রমাদান, ২য় হিজরি) উভয় সেনাদল মুখোমুখি হয়। নবি ﷺ খুব আকুতি-মিনতি সহকারে হৃদয়-নিংড়ানো এক দুআ করেন, "হে আল্লাহ, ওই যে আসছে কুরাইশরা, তাদের সব অহংকার ও দম্ভ নিয়ে। তারা আপনাকে অস্বীকার করে। আপনার নবিকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দেয়। হে আল্লাহ, আমার প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করুন! হে আল্লাহ, আজকে তাদের পরাজিত করে দিন।"

সেনাদের জড়ো করে নবি ﷺ বলে দিলেন, "যেন তাঁর নির্দেশের আগে কেউ যুদ্ধ শুরু না করে। তারা কাছাকাছি চলে এলেই কেবল তির ব্যবহার করবে। নিজেদের তিরকে অযথা ব্যবহার না করে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। তারা একদম কাছে চলে না এলে তরবারি বের করবে না।"[২৮১] আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তারপর নবিজি ﷺ-কে তাঁর জন্য

---

[২৭৮] তিরমিযি, ১৬৭৭।
[২৭৯] মুসলিম, ১৭৭৯।
[২৮০] সূরা আনফাল, ৮ : ১১।
[২৮১] বুখারি, ৩৯৮৪; আবূ দাউদ, ২৬৬৪।

তৈরি করা তাঁবুটিতে নিয়ে এলেন। রবের কাছে নবি ﷺ দুআ করতে শুরু করেন,

“হে আল্লাহ, এই ছোট্ট দলটি যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আর কখনোই আপনার ইবাদাত করা হবে না। হে আল্লাহ, যদি আপনি চান তাহলে আজকের পরে আর কখনও আপনার ইবাদাত করা হবে না।” নবি ﷺ খুব ইখলাস ও বিনয়ের সাথে দুআ করছিলেন। এমনকি ঘাড় থেকে তাঁর চাদর নিচে পড়ে যায়। এই অবস্থা দেখে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) চাদর ঠিক করে দেন এবং বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, এবার থামুন! আপনি তো আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে দুআ করেছেন।’[২৮২]

আবূ জাহলও প্রার্থনা করে, “হে আল্লাহ, আজ ওই দলটিকে ধ্বংস করে দিন, যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন (!) করে আর অপরাধকর্মে লিপ্ত। হে আল্লাহ, আপনার প্রিয় দলটিকে আজ সাহায্য করুন।”

• দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান

কুরাইশের সেরা তিন অশ্বারোহী সেনাসারি থেকে সামনে এসে দাঁড়ায়। উতবা ইবনু রবীআ, শাইবা ইবনু রবীআ এবং ওয়ালীদ ইবনু উতবা। মুসলিমদের আহ্বান করে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। জবাবে তিন জন আনসার এগিয়ে আসেন। কিন্তু চ্যালেঞ্জাররা তখন নির্বাসিত মাক্কিদের রক্তের পিপাসায় উন্মাদ। বলে, “আমরা আমাদের জ্ঞাতিভাইদের চাই।” আনসারদের বদলে তাই সামনে এগিয়ে আসেন উবাইদা ইবনুল হারিস, হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব এবং আলি ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহুম)। হামযা মুখোমুখি হন শাইবার, আলি দাঁড়ান ওয়ালীদের সামনে, আর উবাইদা গ্রহণ করেন উতবার চ্যালেঞ্জ। হামযা এবং আলি (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) সহজেই নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করেন। ওদিকে উবাইদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) ও উতবার মাঝে হতে থাকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। দু’জনেই আহত। হামযা ও আলি দৌড়ে এসে হত্যা করেন উতবাকে। পায়ে মারাত্মক জখম হওয়া উবাইদাকে ধরাধরি করে ফিরিয়ে আনেন সেনাসারির ভেতরে। পরে মদীনায় ফিরে যাবার সময় ‘সাফরা’ নামক স্থানে উবাইদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হয়ে যান এ আঘাতের কারণেই।[২৮৩]

• শুরু হলো যুদ্ধ

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তিন জন ঝানু সৈনিককে হারিয়ে তখন কুরাইশরা ক্রুদ্ধ। আক্রমণে ধেয়ে আসে তারা। ত্বরিত সাফল্যে উজ্জীবিত মুসলিমরা “আহাদ! আহাদ!

[২৮২] বুখারি, ২৯১৫।
[২৮৩] বুখারি, ৩৯৬৫।

(এক! এক!)" রব তুলে অবিচল পদে আক্রমণ প্রতিহত করেন।

এদিকে এক হাজার ফেরেশতা এসে মুসলিমদের সাথে যোগ দেন আল্লাহর সাহায্যরূপে। মুহাম্মাদ ﷺ-কে এই গায়েবি সাহায্য দেখিয়েও দেওয়া হয়। আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দিকে ফিরে তিনি বলেন, "খুশির খবর, আবূ বকর! আল্লাহর সাহায্য চলে এসেছে। ওই যে, উনি জিবরীল। ঘোড়ার রাশ ধরে সামনে এগিয়ে চলেছেন। ধুলো-মাটিতে ভরে গেছে তাঁর পরনের পোশাক।"[২৮৪]

নবি ﷺ জোরে জোরে পা ফেলে লড়াইয়ের দিকে আসতে থাকেন এবং এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে থাকেন,

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

"শীঘ্রই ওই দলটি পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।"[২৮৫]

নবি ﷺ এক মুঠো ধুলো নিয়ে কুরাইশদের দিকে ছুড়ে মেরে বলেন, "شَاهَتِ الْوُجُوهُ বিকৃত হয়ে যাক চেহারাগুলো।" আল্লাহ্ তাআলার কী আশ্চর্য ক্ষমতা! প্রতিটি শত্রুর নাকে-মুখে ঢুকে পড়ে সেই ধুলো। একজনও বাদ যায়নি। আল্লাহ্ তাআলা এ ব্যাপারে বলেন,

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

"নিক্ষেপ তুমি করোনি, যখন তুমি তা নিক্ষেপ করেছিলে; বরং স্বয়ং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন।"[২৮৬]

আক্রমণের আদেশ দিয়ে নবি ﷺ বলেন, "গর্জে উঠো!" শত্রুর চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ লোকবলবিশিষ্ট মুসলিমরা যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহকে দেখে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ফেরেশতাদের অদৃশ্য বাহিনীর সাহায্যে কুরাইশদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিমরা। একের পর এক সৈনিক হারাতে হারাতে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে কুরাইশ সেনাসারি। তাদের পিছু ধাওয়া করে মুসলিমরা কাউকে হত্যা করেন, কাউকে বন্দি করেন। আবার অনেকের মাথা কেটে পড়ে যাচ্ছে, হাত পড়ে যাচ্ছে কিন্তু কেউ বলতে পারে না কে কাটছে। আসলে তারা ফেরেশতা ছিল।[২৮৭]

---

[২৮৪] বুখারি, ৩৯৯৫।

[২৮৫] সূরা কমার, ৫৪ : ৪৫।

[২৮৬] সূরা আনফাল, ৮ : ১৭।

[২৮৭] ইবনু সা'দ, তবাকাত, ২/২৬।

সুরাকা ইবনু মালিক ইবনি জু'শুমের রূপ ধরে শয়তান সশরীরে উপস্থিত ছিল। ফেরেশতাবাহিনী চলে এসেছে দেখে সে পলায়ন করে লোহিত সাগরে ডুব দেয়।

• আবূ জাহলের নরকযাত্রা

সেনাপতি আবূ জাহলকে কড়া নিরাপত্তাবেষ্টনীতে রাখে তরবারি ও বর্শাধারী সেনারা। এই নিরাপত্তাব্যূহ ভেদ করে মুসলিমরা তার কাছে যেতেই পারছিল না।

আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পাশে অল্পবয়সি দুই জন আনসার যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। ফলে তিনি নিজেকে নিরাপদ মনে করছিলেন না। ভাবছিলেন শক্তিশালী কেউ পাশে থাকলে ভালো হতো। এমন সময় দু'জনের একজন অপরজন থেকে লুকিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "চাচা, আবূ জাহল কোনটা?"

আবদুর রহমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) অবাক হয়ে বললেন, "তুমি জেনে কী করবে?"

"শুনেছি সে নাকি নবিজি ﷺ-কে গালিগালাজ করে। যেই সত্তার হাতে আমার জান, তাঁর কসম! ওকে দেখামাত্র হয় আমি তাকে হত্যা করে ফেলব, আর নয়তো সে আমাকে হত্যা করবে।"

আরেকজনও একইভাবে একই কথা জিজ্ঞেস করল। যুদ্ধের হই-হল্লার মাঝে হঠাৎ আবূ জাহলকে চোখে পড়ল আবদুর রহমানের। ছেলে দুটোকে দেখিয়ে বললেন, "ওই যে, ওইটা আবূ জাহল।" তখন তারা বাজপাখির মতো চোখের পলকেই সব ভিড় পেরিয়ে আবূ জাহলের কাছে পৌঁছে গেল এবং সাথে সাথে আবূ জাহলের শরীর তরবারির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। ফলে আবূ জাহলের মাটিতে পড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও কিছু করার থাকল না। এরপর তারা দু'জনে রাসূল ﷺ-এর সামনে হাজির হয়ে নিজেকে আবূ জাহলের হত্যাকারী বলে দাবি করে এবং খুশি প্রকাশ করে। দু'জনেরই তরবারি পরীক্ষা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন, "তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছ।"[২৮৮]

এই দুই যুবক হলেন আফরার দুই ছেলে মুআয এবং মুআওওয়িয (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)। মুআওওয়িয বদরে যুদ্ধেই শহীদ হয়েছিলেন। তবে মুআয জীবিত ছিলেন উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাতকাল পর্যন্ত। আবূ জাহলের কাছ থেকে লব্ধ জিনিসপত্র নবি ﷺ তাকেই দিয়েছিলেন।[২৮৯]

---

[২৮৮] বুখারি, ৩১৪১; মুসলিম, ১৭৫২।

[২৮৯] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ৭/৩৪৫।

ওদিকে মৃত্যুপথযাত্রী আবূ জাহলকে ধূলায় লুটিয়ে কাতরাতে দেখেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)। পুরোনো শত্রুর ঘাড়ে পা দিয়ে মাথা কাটার উদ্দেশ্যে তার দাড়ি ধরেন এবং বলেন, "ওহে আল্লাহর শত্রু, আজ আল্লাহ তোকে কী বেইজ্জতিটাই না করে ছাড়লেন!"

এই মরণ মুহূর্তেও আবূ জাহলের দম্ভোক্তি, 'কিসের বেইজ্জতি? তোরা যে ব্যক্তিকে হত্যা করছিস তার চেয়ে বড় কেউ আছে নাকি?' আবার বলতে লাগল, 'আফসোস! কৃষকের ছেলেরা ব্যতীত অন্য কেউ যদি আমাকে হত্যা করত? আজকে কার বিজয় হলো?

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) জবাব দিলেন "আল্লাহ আর তাঁর রাসূলের।"

"ওহে বকরির রাখাল, কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছিস, খেয়াল আছে?" আবূ জাহলের এই কথার পর আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) তার শিরশ্ছেদ করেন। কাটা মাথাটি হাজির করেন নবি ﷺ-এর সামনে।

"আল্লাহু আকবার! আলহামদুলিল্লাহ!" হর্ষধ্বনি করে উঠলেন আল্লাহর রাসূল। "আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন, আর একাই পরাজিত করেছেন শত্রুসেনাদের।" আবূ জাহলের কর্তিত মস্তকের দিকে চেয়ে নবি ﷺ বলেন, "এই লোক ছিল এই উম্মাহর ফিরআউন।"[২৯০]

• পার্থক্য গড়ে দেওয়ার সেই দিন

আবূ জাহলের মৃত্যুর পর কুরাইশরা মনোবল হারিয়ে ফেলে। মানুষ ও ফেরেশতার এক সম্মিলিত বাহিনীর হাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে ফিরে যায় তারা। শেষ হয় বদরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ কোনও ভূমি বা সম্পদ দখল অথবা প্রতিপত্তি লাভের লড়াই ছিল না; বরং তা ছিল কুফরের ওপর ঈমানকে বিজয়ী করার লড়াই। এই দিন মুসলিমরা নিজের বাবা, চাচা, সন্তান, ভাই ও বন্ধুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) হত্যা করেন তার মামা আস ইবনু হিশামকে। আর আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) মুখোমুখি হন তার ছেলে আবদুর রহমানের। নবিজি ﷺ-এর চাচা আব্বাস বন্দি হন মুসলিমদের হাতে। মুশরিকদের দলে ছিল বাবা উতবা ইবনু রবীআ, আর মুসলিমদের দলে ছিল তার আপন সন্তান আবূ হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। আত্মীয়তা আর রক্ত-সম্পর্ককে

---

[২৯০] বুখারি, ৩৯৬২।

কুরবানি করে অর্জিত হয়েছে ঈমানের বিজয়। যুদ্ধের দিনটি পরিচিতি লাভ করে 'ইয়াওমুল ফুরকান' (পার্থক্য গড়ে দেওয়ার দিন) নামে। কারণ, এই দিনে কোনও গোত্রপরিচয় নয়; বরং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাস ছিল পার্থক্যকারী রেখা।

• দুইপক্ষের নিহত ব্যক্তিগণ

এই যুদ্ধে ১৪ জন মুসলিম শহীদ হন। ছয় জন মুহাজির ও আট জন আনসার। বদরের মাঠেই তাদের কবর দেওয়া হয়। আজও কবরগুলোর অবস্থান প্রসিদ্ধ ও সুচিহ্নিত।

আর পৌত্তলিক পক্ষের মারা যায় ৭০ জন, বন্দিও হয় ৭০ জন। মৃতদের অধিকাংশই হয় গোত্রপতি, নয়তো প্রভাবশালী কেউ। চব্বিশ জন পৌত্তলিক গোত্রনেতার লাশ ছুড়ে ফেলা হয় দুর্গন্ধময় এক পরিত্যক্ত কুয়ায়।[২৯১]

নবি ﷺ ও সাহাবিগণ তিন দিন বদরে অবস্থান করেন। মদীনায় ফিরে যাওয়ার দিন নবি ﷺ সেই কুয়ার ধারে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক গোত্রপতির নাম ধরে ধরে ডেকে বলেন, "ওহে অমুকের ছেলে অমুক! ওহে অমুকের ছেলে অমুক! এখন কি মনে হচ্ছে না যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করলেই ভালো হতো? আমাদের রব আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা তা সত্য পেয়েছি। এখন তোমরাও কি তোমাদের রবের প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছ?"

উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) অবাক হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এমন দেহের সাথে কথা বলছেন যার মধ্যে প্রাণই নেই!"

নবি ﷺ এর প্রত্যুত্তরে বললেন, "আমি যা কিছু বলছি তা তোমরা তাদের থেকে বেশি শুনতে পারছ না। তবে তারা জবাব দিতে পারে না।"[২৯২]

• দিকে দিকে যুদ্ধজয়ের খবর

জান নিয়ে পালাতে সক্ষম মুশরিকরা বয়ে নিয়ে যায় তাদের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের শোচনীয় খবর। দুঃখে-হতাশায় মুষড়ে পড়ে মক্কাবাসী। কিন্তু মুসলিমদের সামনে মান-ইজ্জত বজায় রাখতে যেকোনও ধরনের শোক পালন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

কিন্তু চাইলেই কি আর শোক আটকে রাখা যায়? আসওয়াদ ইবনু আবদিল মুত্তালিবের কথাই ধরুন। বদরে সে তিন তিনটি সন্তানকে হারিয়েছে। এক রাতে কোনও এক নারীর

---

[২৯১] বুখারি, ২৪০।
[২৯২] বুখারি, ৩৯৭৬।

লাগামছাড়া মাতমের আওয়াজ পেয়ে ভাবল শোক প্রকাশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে এক দাসকে পাঠিয়ে দিল খবর নিতে। কিন্তু জানা গেল যে, নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল আছে। তবে মহিলাটি কাঁদছে কারণ তার একটি উট হারিয়ে গেছে। রেগেমেগে আসওয়াদ বলল,

"মাতম করে রাত জাগতে বুঝি ওই এক উটকেই পেলি?
আর বদরে পড়ে থাকা লাশদের বুঝি ভুলেই গেলি?"

এদিকে নবি ﷺ দু'জন দূতকে মদীনায় পাঠান বিজয়ের সুসংবাদ জানাতে। উত্তর মদীনায় যান আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা আর দক্ষিণে যাইদ ইবনু হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)। মদীনাবাসী এমনিতেই চিন্তিত ছিল। তার ওপর ইয়াহূদিরা গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে, প্রতাপশালী কুরাইশরা মুসলিমদের পরাস্ত করে ফেলেছে। নবিজির বার্তা এসে পৌঁছানোমাত্র সবাই উঁচু স্বরে তাকবীর-ধ্বনি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। বিজয় তো এসেছেই, আর নিহত মুসলিমরাও শহীদ হিসেবে পাবেন আল্লাহর কাছে যথার্থ পুরস্কার।

• মদীনায় প্রত্যাবর্তন

সবাই মিলে মদীনায় ফিরে চলার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের নিয়ম-সংক্রান্ত একটি ওহি লাভ করেন। নবিজি ﷺ-এর জন্য রাখা হবে এক-পঞ্চমাংশ। আর বাকিটা ভাগ করে দেওয়া হবে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে। মুহাম্মাদ ﷺ-ই একমাত্র নবি, যার জন্য গনীমাতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে। এরপর নাদর ইবনুল হারিস ও উকবা ইবনু আবী মু'আইতকে হত্যার নির্দেশ আসে। যথাক্রমে আলি ও আসিম ইবনু সাবিত আনসারি (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাদের শিরশ্ছেদ করেন।[২৯৩]

বিজয়ের সুসংবাদ শুনে মদীনা থেকে অনেকেই বদর অভিমুখে ছুটে আসেন। সবারই ইচ্ছে নবিজি ﷺ-কে অভিবাদন জানানো প্রথম ব্যক্তি হওয়ার। রাওহা অঞ্চলে এসে সেনাদলের দেখা পান তারা। সেখান থেকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে যান মদীনায়। বিপুল পরিমাণ বন্দি নিয়ে বিজয়ী বাহিনীকে শহরে প্রবেশ করতে দেখে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এই সময়ই আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সাথি-সঙ্গীরা মানুষ দেখানোর জন্য ইসলাম গ্রহণ করে।

---

[২৯৩] ভিন্ন বর্ণনামতে, দুটি মৃত্যুদণ্ডই আলি (রদিয়াল্লহু আনহু)-এর হাতে কার্যকর হয়।

• বন্দিদলের মুক্তিপণ

মদীনায় পৌঁছে নবি ﷺ পরামর্শসভা বসালেন বন্দিদের কী করা যায়, সে ব্যাপারে। আবু বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতে কুরাইশদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। নবি ﷺ প্রথম মতটির অনুমোদন দেন। একেকজনের ক্ষেত্রে এক থেকে চার হাজার দীনার পর্যন্ত মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। যারা টাকা পরিশোধে অক্ষম তবে লেখাপড়াতে সক্ষম, তাদের প্রত্যেককে দায়িত্ব দেওয়া হয় দশ জন করে মুসলিম শিশুকে লেখাপড়া শেখাতে। যারা দুটোর একটাও করতে অক্ষম, তাদের এমনিই ছেড়ে দেওয়া হয়।[২৯৪]

যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বঘটনা ছিল নবিজি ﷺ-এর জামাতা আবুল আসের বন্দিত্ব ও মুক্তি। আবুল আসের স্ত্রী নবি-তনয়া যাইনাব (রদিয়ালাহু আনহা) তখনো মক্কায়। স্বামীর জন্য মুক্তিপণ হিসেবে তিনি একটি গলার হার পাঠান। নবিজি ﷺ হারটি দেখামাত্র চিনতে পারেন। প্রয়াত খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর এই হারটি তিনি নিজেই মেয়ের বিয়েতে উপহার দিয়েছিলেন। প্রিয়তমার স্মৃতি মনে পড়ে রাসূলুল্লাহর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। বিনা মুক্তিপণে আবুল আসকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেন তিনি। সাহাবিগণ সে নির্দেশ পালন করেন। তবে শর্ত হলো যাইনাবকে মদীনায় হিজরত করতে দিতে হবে। সে মক্কায় ফিরে যাওয়ার পর যাইনাব (রদিয়াল্লাহু আনহা) মদীনায় চলে আসার অনুমতি পান।[২৯৫]

• দুই প্রদীপের ধারক

নবি ﷺ যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করছেন, সে সময় আরেক নবি-তনয়া এবং উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী রুকাইয়া (রদিয়াল্লাহু আনহা) খুবই অসুস্থ। উসমানকে মদীনায় থেকে স্ত্রীর দেখাশোনা করতে বলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। সেই সাথে প্রতিশ্রুতি দেন যে, মদীনায় থাকলেও তিনি যুদ্ধে যাওয়ার সাওয়াব এবং গনীমাতের ভাগ উভয়ই পাবেন।[২৯৬]

উসামা ইবনু যাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কেও একই কারণে মদীনায় থেকে যেতে বলা হয়। কিন্তু নবিজি যুদ্ধ থেকে ফেরার আগেই রুকাইয়া (রদিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তিকাল

---

[২৯৪] ইবনুল জাওযি, তারীখু উমর, ৩৬।

[২৯৫] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬/২৭৬; আবু দাউদ, ২৬৯২।

[২৯৬] বুখারি, ৩৬৯৯।

করেন। উসামা ইবনু যাইদ বলেন, “আমরা যখন বিজয়ের খবর পেয়েছি, ততক্ষণে রুকাইয়ার দাফন-কাফন শেষ।”

বিপত্নীক উসমানের সাথে এরপর নিজের আরেক মেয়ে উম্মু কুলসূম (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিয়ে দেন রাসূল ﷺ। নবিজির দুই মেয়েকে পরপর বিয়ে করায় উসমানের উপাধি হয় যুন-নূরাইন (দুই আলোর অধিকারী)। নবম হিজরি সনের শা'বান মাসে উসমানের স্ত্রী থাকা অবস্থায়ই উম্মু কুলসূম (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর মৃত্যু হয়। মাসজিদে নববির কাছে 'বাকী' নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২৯৭]

বদর-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

ওদিকে বদরের অপমানের জ্বালা মেটাতে পৌত্তলিকরা তখনো তড়পাচ্ছে। চরম একটা প্রতিশোধের চিন্তা ও পরিকল্পনা মাথায় ঘুরছে দিনরাত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে মুসলিমদের একের পর এক বিজয়ের মালা পড়াতে থাকেন।

• বানূ সুলাইমের যুদ্ধ

বদর থেকে ফিরে আসার পর বেশিদিন পেরোয়নি। কোনও সূত্রমতে এক সপ্তাহ, অপরাপর বর্ণনায় আড়াই কি তিন মাস। মদীনা আক্রমণের জন্য গোপনে এক বাহিনী প্রস্তুত করতে থাকে বানূ সুলাইম গোত্র। কিন্তু আগেই তাদের ঘাঁটি আক্রমণ করে মুসলিমরা সে পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেন। ফিরে আসেন যুদ্ধলব্ধ গনীমাত নিয়ে।[২৯৮]

• নবি ﷺ-কে হত্যার পরিকল্পনা

এরপর নবি ﷺ-কে হত্যার পরিকল্পনা করে উমাইর ইবনু ওয়াহাব জুমাহি ও সফওয়ান ইবনু উমাইয়া। তাদের গোপন পরিকল্পনা নবিজি ﷺ-কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ তাআলা। স্বার্থোদ্ধারের আশায় উমাইর চুপি চুপি মদীনায় প্রবেশ করে। কিন্তু সাথে সাথে ধরা পড়ে যায়। নবি ﷺ তাকে জানান যে, ওহির মাধ্যমে তার সব চক্রান্ত তিনি ইতিমধ্যে জেনে গেছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে উমাইর ইবনু ওয়াহাব তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করেন। রদিয়াল্লাহু আনহু।[২৯৯]

---

[২৯৭] ইবনু হিশাম, ২/৬৪৩।

[২৯৮] ইবনু হিশাম, ২/৪৩-৪৪; যাদুল মাআদ, ২/৯০।

[২৯৯] ইবনু হিশাম, ১/৬৬১-৬৬৩।

• বানূ কাইনুকা'র যুদ্ধ

বদরে ঐতিহাসিক জয়লাভ করেও মুসলিমরা দম ফেলার সময় পাননি; বরং মাক্কি ভাইদের পক্ষ থেকে মুসলিম রাষ্ট্রকে চাপে রাখার দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নেয় মদীনার প্রতিটি মুশরিক ও ইয়াহূদি গোত্র। ইয়াহূদি গোত্র কাইনুকা'র শত্রুতা তো একদম খোলাখুলিভাবেই চলতে থাকে। নবি ﷺ তাদের সাবধান করে দিলে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, "মুহাম্মাদ, শুনুন। এত খুশি হয়েন না। কুরাইশদের কয়েকটা উঠতি যুবক আর যুদ্ধে অপারগদেরই তো মাত্র হত্যা করেছেন। কিন্তু আমাদের সাথে যেদিন লড়বেন, সেদিন দেখবেন সত্যিকারের বীরত্ব কাকে বলে!!"[৩০০]

নবিজি এর জবাব দিলেন স্বভাবসুলভ ধৈর্যের মাধ্যমে। এতে বানূ কাইনুকা'র ছটফটানি আরও বেড়ে গেল।

বানূ কাইনুকা' মদীনার বাজারে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায়। যার জের ধরে নিহত হন একজন মুসলিম ও একজন ইয়াহূদি। তাদের এইসব অপতৎপরতা ও অনিষ্টের শাস্তি স্বরূপ এবার আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের ঘেরাও করে অবরোধ করেন। ২য় হিজরি সনের মধ্য শাওয়াল, শনিবার থেকে বানূ কাইনুকা'র ওপর অবরোধ আরোপ করেন মুসলিম বাহিনী। পনের দিন আটকে থাকার পর যুল-কা'দা মাসের শুরুতেই ইয়াহূদিরা আত্মসমর্পণ করে। নবি ﷺ তাদের সকলকে মদীনা থেকে নির্বাসিত করে সিরিয়ার 'আযরুআত' এলাকায় পাঠিয়ে দেন। তবে অল্পকাল পরই তাদের অধিকাংশ মারা পড়ে সেখানে।

• সাওয়ীকের যুদ্ধ

ওদিকে আরেকটি সামরিক অভিযানের মাধ্যমে বদরের প্রতিশোধ নিতে আবূ সুফইয়ানের ছটফটানি ও অস্থিরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে লড়াই করার আগে গোসল না করারও কসম করেন তিনি। লড়লেই যেন বিজয় নিশ্চিত! দুই শ জনের এক বাহিনী নিয়ে মদীনায় আসেন কসম পূর্ণ করতে। 'আরিদ' নামক এক জনবসতিতে অতর্কিতে হামলা করে দুই জন আনসারকে শহীদ করেন। এরপর বাহিনীটি তাদের কয়েকটি দামি খেজুর গাছ কেটে পুড়িয়ে দেওয়ার পর পালিয়ে যায়।

হানাদারদের খবর পেয়ে নবি ﷺ ও তাঁর সেনারা তাদের পিছুধাওয়া করেন। 'কারকারাতুল কাদর' নামক স্থান পর্যন্ত ধাওয়া করা হলেও শত্রুরা হাতছাড়া হয়ে যায়।

---

[৩০০] আবূ দাঊদ, ৩০০১, যাদুল মাআদ, ২/৭১, ৯১।

তবে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে গিয়ে আবূ সুফইয়ানের বাহিনী তাদের সব মূল্যবান রসদ ফেলে যেতে বাধ্য হয়। বিশেষত ভুট্টা দিয়ে তৈরি একধরনের ছাতু। খাবারটির আরবি নাম 'সাওয়ীক'। এই কারণেই অভিযানটিকে 'সাওয়ীকের যুদ্ধ' বলে অভিহিত করা হয়। এটাকে কারকারাতুল কাদরের যুদ্ধও বলা হয়।[৩০১]

- ## কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যা

মুসলিমদের পথে পরবর্তী কাঁটার নাম কা'ব ইবনু আশরাফ। প্রচুর সম্পদশালী ধনী এক ইয়াহূদি কবি। মুসলিম ও তাদের নবি ﷺ-এর প্রতি তার অপরিসীম বিদ্বেষ। নিজের কাব্যপ্রতিভা ব্যবহার করে সে নবি ﷺ, সাহাবা এবং মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম নিয়ে মারাত্মক কটূক্তি করত। সেই সাথে ইসলামের শত্রুদের উৎসাহিত করতে থাকত মুসলিমদের সাথে লড়াই করার জন্য। বদরের যুদ্ধের পরপরই মক্কায় এক ঝটিকা সফর করে সে এ ব্যাপারে আরও উস্কানি দিয়ে আসে। প্রতিশোধ-নেশায় পাগল কুরাইশ তখন একেই তো নাচুনি বুড়ি, তার ওপর কা'বের বাকপটুতা দিয়ে আসে ঢোলের বাড়ি।

আরবে কবি এবং কবিতার কদর এমনিতেই বেশ উঁচু। কা'বের বাগ্মিতা যেন জাদুর মতো কাজ করে কুরাইশদের ওপর। প্রতিশোধের আহ্বানের পাশাপাশি সে কুরাইশদের এ বলেও সান্ত্বনা দেয় যে, ধর্মীয় দিক দিয়ে তারাই সঠিকতর। বানূ কাইনুকা'র ঘটনা থেকে শিক্ষাও নিতে বলে তাদের। কা'বের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার শপথ নেয় কুরাইশ মুশরিকরা।

কাজ শেষে মদীনায় ফিরে এসে মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কণ্ঠযুদ্ধ জারি রাখে কা'ব ইবনু আশরাফ। তার ফিরে আসার খবর পেয়ে নবি ﷺ সাহাবিদের বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অপমান করছে কা'ব। কে আছ, যে আমাকে তার থেকে মুক্তি দেবে?"

এই আহ্বানে সাড়া দেন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা, আব্বাদ ইবনু বিশর, আবূ নাইলাহ, হারিস ইবনু আওস এবং আবূ আবস ইবনু জাবর (রদিয়াল্লাহু আনহুম)। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাকে দলপতি করে অভিযানের পরিকল্পনা ঠিক করা হয়। তবে এ অভিযানে যেহেতু ছলনার আশ্রয় নিতে হবে, তাই আগেই তিনি নবিজি ﷺ-এর নিকট অনুমতি নিয়ে নেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অনুমোদন পেয়ে কা'বের কাছে যান মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা।

---

[৩০১] ইবনু হিশাম, ২/৪৪-৪৫; যাদুল মাআদ, ২/৯০-৯১।

তাকে ডাকিয়ে এনে এ কথা সে কথার ফাঁকে বলেন, "এই লোকটা [নবি ﷺ] আমাদের কাছে যাকাত-সদাকা চায়। সত্যি কথা বলতে কী, সে আমাদের বিরাট বিপদে ফেলে দিচ্ছে!"

ফাঁদে পা দেয় কা'ব। খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলে, "আল্লাহর কসম! ভবিষ্যতে ওকে নিয়ে তোমরা আরও অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।" এভাবে কা'বের বিশ্বাস জয় করে নেওয়ার পর মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) কিছু গম আর খেজুর কর্জ চান। বন্ধক হিসেবে নিজের অস্ত্রগুলো জমা রাখার কথা বলেন। কা'ব অনুরোধটি গ্রহণ করেন।

এরপর আবূ নাইলাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) এসে একইভাবে উষ্মা প্রকাশ করে বলেন যে, আরও বেশ কিছু লোক নবিজি ﷺ-এর ব্যাপারে একই মনোভাব পোষণ করে। তাদেরও কা'বের কাছে নিয়ে আসার কথা বলেন তিনি। কারণ, সবারই এখন সাহায্যের প্রয়োজন। কা'বের খুশি আর দেখে কে! এতগুলো মুসলিমকে হুঁশ ফিরে পেতে দেখে সে নিজেই বেহুঁশ হওয়ার দশা।

সেদিন ৩য় হিজরি সনের রবীউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ। পূর্ণিমার রাতে দুর্গে নিজের কামরায় নববধূর আলিঙ্গন উপভোগ করছে কা'ব। পাঁচ জন সশস্ত্র মুসলিম এসে ডাক দেয় কা'বকে। তার স্ত্রী বলে, 'এই সময় কোথায় যাচ্ছেন?' আমি যে আওয়াজ শুনলাম তা থেকে রক্ত প্রবাহের ইঙ্গিত পাচ্ছি!' স্ত্রীর সাবধানবাণীকে পাত্তা না দিয়ে সরল বিশ্বাসে কা'ব বেরিয়ে আসে দুর্গ থেকে। মুসলিমদের হাতে অস্ত্র দেখেও সে কিচ্ছুটি সন্দেহ করেনি। এগুলো তো বন্ধক রাখার জন্য আনা হয়েছে, তাকে হত্যা করতে নয়!

হাঁটতে হাঁটতে আর কথা বলতে বলতে একটু দূরে চলে আসে সবাই। আবূ নাইলাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) কা'বের মাথায় দেওয়া সুগন্ধির প্রশংসা করেন। একটু কাছ থেকে শুঁকে দেখার অনুমতি চান তিনি। গদগদ হয়ে কা'ব রাজিও হয়ে যায়। এভাবে আবূ নাইলাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বারকয়েক নিজেও শোঁকেন, সঙ্গীদেরও শুঁকে দেখতে বলেন। একসময় কা'বকে একদম বাগে নিয়ে আসার পর আবূ নাইলাহ সঙ্গীদের আহ্বান করেন, "এবার ধরো আল্লাহর শত্রুটাকে!"

সাথে সাথে সবাই তরবারি দিয়ে কয়েকবার আঘাত হানেন। তবে তা খুব বেশি ফলপ্রসূ হয়নি। অবশেষে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কোদাল দিয়ে কা'বের তলপেট চিরে ফেলেন। ভয়ানক চিৎকার করতে করতে মারা পড়ে কা'ব। সে আওয়াজে জেগে ওঠে সারা দুর্গ। মশাল জ্বলে ওঠে চারপাশে। কিন্তু জঘন্যতম

শত্রুর বকবকানি চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে নিরাপদে পালিয়ে আসেন পাঁচ মহান সাহাবি। (রদিয়াল্লাহু আনহুম)।

এ ঘটনায় মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে ইয়াহূদিদের মনোবল। প্রকাশ্য শত্রুতা ত্যাগ করে কিছুকালের জন্য গা-ঢাকা দেয় তারা। মুসলিমরাও সাময়িক রেহাই পান উত্ত্যক্তকারীদের হাত থেকে।[৩০২]

- কারদাহ অভিযান

হিজরি তৃতীয় সনের জুমাদাল উলা মাস। ইরাক হয়ে সিরিয়া রওনা দেয় কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা। কাফেলার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত সফওয়ান ইবনু উমাইয়া। নিরাপত্তা নিয়ে কুরাইশরা এবার বেশি চিন্তিত না। কারণ, এবার তারা যাচ্ছে নাজদ অঞ্চল দিয়ে। মদীনা ও মুসলিমদের হুমকি থেকে এটা বেশ দূরে।

কিন্তু নবিজি ﷺ-ও খুব হুঁশিয়ার। মূল্যবান মালবোঝাই কাফেলাটির খবর পেয়ে দুই শ জনের একটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করেন তিনি। নেতৃত্বে আছেন যাইদ ইবনু হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। নাজদ অঞ্চলের 'কারদাহ' নামক একটি ঝরনার কাছে কুরাইশ কাফেলাটি যাত্রাবিরতি করে। অতর্কিত আক্রমণের মুখে কাফেলার যাত্রীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ফেলে যায় তাদের সব মালামাল। মালামাল হস্তগত করার পাশাপাশি কাফেলার গাইড ফুরাত ইবনু হাইয়ানকেও আটক করেন মুসলিমরা। কিন্তু আটককারীদের কাছে তিনি এত অসাধারণ মানবিক আচরণ পান যে, মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

লব্ধ গনীমাত হিসেব করে দেখা যায় এতে প্রায় এক লাখ দিরহাম মূল্যের সম্পদ আছে। বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের যে-রকম সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, এই আক্রমণে তাদের ঠিক সে-রকমই বিশাল আর্থিক ক্ষতি হয়।[৩০৩]

উহুদের যুদ্ধ (শাওয়াল, ৩য় হিজরি)

কুরাইশদের শরীরে এখন দুটি অপমানের দগদগে ঘা। বদরের সামরিক পরাজয়, আর কারদাহ'র অর্থনৈতিক ধস। এখন সময় এসেছে আরেকটি যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমদের ওপর সমস্ত আক্রোশ ঢেলে দেওয়ার। রীতিমতো বিপজ্জনক গতিতে চলতে থাকে এর প্রস্তুতি। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ক্রোধ আছে, এমন প্রত্যেকেই বাহিনীতে

[৩০২] বুখারি, ৪০৩৭।

[৩০৩] ইবনু হিশাম, ২/৫০-৫১।

নিয়োগ পেতে থাকে। বিশেষত বদরে যারা বাপ-ভাই-সন্তান হারিয়েছে, তারা।

প্রতিশোধস্পৃহা চাঙা করতে ভাড়া করা হয় গায়িকার দল। আশপাশের যেসব গোত্রের সাথে কুরাইশদের মিত্রতা ছিল, তাদেরও সেনাদলে যোগদানে বাধ্য করা হয়। ঘরের নারীরাও তাদের সাথে যোগ দেয়, যাতে সৈনিকদের শরীরে জোশও থাকে, আবার বেইজ্জতি হওয়ার ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিঠটানও না দেয়। শেষমেশ কুরাইশদের হাতে জড়ো হয় তিন শ উট, দুই শ ঘোড়া, আর সাত শ বর্মসহ তিন হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী। আবূ সুফ্ইয়ান হন সেনাপতি, আর বানূ আবদিদ দারের লড়াকু সৈনিকদের নিযুক্ত করা হয় পতাকাবাহী হিসেবে।

দম্ভভরে মদীনার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে রক্তপিপাসু ভয়ানক এই মাক্কি বাহিনী। হিজরি ৩য় সনের ৬ই শাওয়াল শুক্রবারে এসে পৌঁছায় শহরের প্রান্তভাগে। আইনাইন ও উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে 'কানাহ' উপত্যকায় শিবির গাড়ে তারা।

এক সপ্তাহ আগ থেকেই শত্রুর অপেক্ষায় ছিলেন নবিজি ﷺ। মদীনার চারপাশে প্রহরার ব্যবস্থা করে নিশ্চিত করছিলেন শহরের নিরাপত্তা। জারি রেখেছেন জরুরি অবস্থা।

মাক্কি সেনাদল এসে পৌঁছালে সাহাবিদের সাথে পরামর্শসভা করেন নিরাপত্তা জোরদারের বিষয়ে। পরিকল্পনা ছিল শহরের ভেতরে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করা। পুরুষরা সব প্রবেশপথ ও গলিতে শত্রুর মোকাবিলা করবে। আর নারীরা বাড়ির ছাদ থেকে ইট-পাটকেল ছুড়ে তাদের সহযোগিতা করবে।

পরিকল্পনা শুনে মুনাফিক গোষ্ঠীর খুশি আর দেখে কে! ঘরেও বসে থাকা যাবে, যুদ্ধক্ষেত্রে না যাওয়ার দোষও ঘাড়ে চাপবে না। মুনাফিক-সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই জোরেসোরে সমর্থন জানালো পরিকল্পনাটির প্রতি। কয়েকজন তরুণ সাহাবি খোলাখুলি যুদ্ধের জন্য জোরাজোরি করতে থাকেন। নবি ﷺ তাদের দাবি মেনে নিয়ে সেনাদলকে তিন ভাগে ভাগ করেন। মুহাজিরদের এক দল, আওস গোত্রের আরেক দল, আর তৃতীয়টি খাযরাজের। পতাকাবহনের দায়িত্ব পান যথাক্রমে মুসআব ইবনু উমাইর, উসাইদ ইবনু হুদাইর এবং হুবাব ইবনুল মুনযির (রদিয়াল্লাহু আনহুম)।

আসরের সালাতের পর বাহিনী নিয়ে উহুদ পাহাড়ের পথ ধরেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। 'শাইখাইন' নামক স্থানে পৌঁছে পুরো বাহিনীকে পুনঃপর্যবেক্ষণ করেন। অল্পবয়স্কদের নিরাপত্তার খাতিরে শহরে ফেরত পাঠিয়ে দেন। অবশ্য বিশেষ বিবেচনায় বাহিনীতে থাকার অনুমতি পান ঝানু তিরন্দাজ রাফি' ইবনু খাদীজ (রদিয়াল্লাহু আনহু)। সামুরা ইবনু জুনদুব (রদিয়াল্লাহু আনহু) এসেও থাকার জন্য অনুনয় করেন। অতীতে

কুস্তি লড়াইয়ে রাফি'কে পরাজিত করার রেকর্ডগুলোর দোহাই দেন। নবি ﷺ একটি পরীক্ষামূলক কুস্তির ব্যবস্থা করেন দু'জনের মাঝে। সামুরা নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে নবিজি ﷺ-এর অনুমতি অর্জন করে নেন।

শাইখাইনে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন নবি ﷺ। সেখানেই রাত কাটান এবং পঞ্চাশ জন প্রহরীকে নিয়োগ করেন পুরো বাহিনীর দেখাশোনার জন্য। শেষরাতের নীরবতার মাঝে 'শাউত' এলাকায় আদায় করেন ফজরের সালাত। সবকিছু ভালোই চলছিল। হঠাৎ মুনাফিকদের কাছ থেকে আসে প্রথম আঘাত। এ স্থানে এসে আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বেঁকে বসে। তিন শ সঙ্গীসহ ফিরে চলে যায় শহরে। এক হাজার জনের বাহিনী একটানে নেমে আসে সাতশ-তে। ইবনু উবাইয়ের কাজটা বানূ সালামা ও বানূ হারিসাকে বেশ দোটানায় ফেলে দেয়। হতচকিত ভাব কাটিয়ে ওঠার আগে তারাও ফিরে যাবার কথাই ভাবছিল। তবে নবিজি ﷺ-এর নসীহত শুনে আল্লাহর রহমতে মুসলিমদের মনোবল নবায়িত হয় এবং সব রকমের দ্বিধা-সংশয় দূরীভূত হয়।

অবশিষ্ট সেনাদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি রাস্তা দিয়ে নবিজি ﷺ এগিয়ে চলেন উহুদের পানে। ফলে শত্রুরা রয়ে যায় এলাকার পশ্চিম দিকে। পাহাড়কে পেছনে রেখে অবতরণ করেন উহুদ উপত্যকায়। যার ফলে এখন মুসলিম বাহিনী এবং মদীনার ঠিক মাঝখানে অবস্থান করছে শত্রুদল।

আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর নেতৃত্বে আইনাইন পাহাড়ে[৩০৪] পঞ্চাশ জন তিরন্দাজের এক বাহিনী নিযুক্ত করেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। এই দলটির কাজ সেখানেই অবস্থান করে পেছন থেকে আসা সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকানো। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদম কড়া নির্দেশ দিয়ে দেন যে, যুদ্ধ যেদিকেই এগোক, মুসলমানরা বিজয় লাভ করুক কিংবা কাফির-মুশরিকরা, তিরন্দাজরা যেন এ অবস্থান ছেড়ে একচুলও না নড়েন।[৩০৫]

ওদিকে মুশরিকরাও তাদের বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসে। গানের তালে তালে উৎসাহ দিতে থাকে নারীরা। সেনাসারির ফাঁকে ফাঁকে খঞ্জনি বাজিয়ে গাইতে থাকে—

"এগিয়ে গেলে টানব বুকে, গালিচা বিছায়ে দেবো,
হটলে পিছু, মুখ ফেরাব, চিনতেও নাহি পাব।"

---

[৩০৪] পরে যার নাম হয় রামাহ পাহাড়।

[৩০৫] বুখারি, ৩০৩৯; ইবনু হিশাম, ২/৬৫-৬৬।

পতাকাবাহীদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে তারা গায়—

"ওহে আবদুদ দারের ছেলেরা, বীরসেনানীর সারি,
সামনে বাড়ো, জোরসে মারো, চালাও তরবারি!"

• দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও লড়াইয়ের শুরু

উভয় সেনাদল কাছাকাছি হলো। পৌত্তলিক পক্ষের সবচেয়ে সাহসী সেনা পতাকাবাহী তালহা ইবনু আবী তালহা আবদারি। উট হাঁকিয়ে সামনে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। জবাবে এগিয়ে আসেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রদিয়াল্লাহু আনহু)। বাঘের ন্যায় একলাফে তার উটে চড়ে বসেন এবং তাকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়েন এরপর তলোয়ার বের করে তাকে যবাই করে দেন। নবি ﷺ উঁচু স্বরে বলে ওঠেন "আল্লাহু আকবার!" সকল সাহাবিও প্রতিধ্বনিত করেন সেই ধ্বনি।

মূল যুদ্ধ শুরুর আগে এ-রকম দ্বন্দ্বযুদ্ধ অনেকটা আবশ্যক আনুষ্ঠানিকতা। এর পরপরই মূল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ সে সময় মুশরিক অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান। তিন তিনবার তিনি পেছন থেকে আক্রমণ করার চেষ্টা করেন। প্রতিবারই মুসলিম তিরন্দাজদের কাছ থেকে মুষলধারে ধেয়ে আসা তিরের কারণে পিছু হটতে বাধ্য হন।

মুসলিম সেনাবাহিনীর আক্রমণের কেন্দ্রে থাকে পৌত্তলিক বাহিনীর এগারো জন পতাকাবাহী। একে একে সবক'টাকে খতম করতেই মুশরিকদের পতাকা ধুলোয় গড়াগড়ি করে লুটোপুটি খেতে থাকে। এরপর মূল বাহিনীতে ঢুকে পড়ে বিপুল পরিমাণ কাফিরকে কতল করেন মুসলিমরা। বিশেষত আবূ দুজানা ও হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) সেদিন এমন বীরত্ব ও সামরিক দক্ষতা দেখান, যা গোটা ইসলামি সমর ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

তবে সেই সাথে ওই যুদ্ধেই শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেন আল্লাহর সিংহ হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু)। বদরের যুদ্ধে জুবাইর ইবনু মুত'ইমের চাচা তু'আইমা ইবনু আদিকে হত্যা করেছিলেন হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তার ছিল এক আবিসিনীয় দাস। ওয়াহশি ইবনু হারব নামক এই দাসটি দক্ষ বর্শাবিদ। জুবাইর ইবনু মুত'ইম কথা দেয় হামযাকে শহীদ করতে পারলে ওয়াহশিকে সে মুক্ত করে দেবে।

সে উদ্দেশ্যেই একটি পাথরের আড়ালে বর্শা নিয়ে অপেক্ষায় থাকে ওয়াহশি। ওদিকে সিবা' ইবনু উরফুতার শিরশ্ছেদ করে সোজা দাঁড়িয়ে আছেন হামযা। ঠিক এই সময়

ওয়াহশি ছুড়ে মারে বর্শাটি। হামযার তলপেট ভেদ করে দুই পায়ের মাঝ দিয়ে বের হয়ে আসে তা। ফলে তিনি পড়ে যান এবং আর উঠতে পারেন না। অবশেষে শহীদ হয়ে যান আল্লাহর সিংহ হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু)।[৩০৬]

এত বড় ক্ষতি কাটিয়ে ওঠে ঠিকই মুসলিমরা প্রাণপণে লড়ে যান। আরও একটি পরাজয়ের স্বাদ নিয়ে পালাতে শুরু করে পৌত্তলিক সেনাদল। ধাওয়া খেয়ে মুশরিক নারীরাও এদিক-ওদিক ছুটে পালায়। আহত শত্রুদের শেষ করে দিয়ে শত্রুশিবিরের মালামাল সংগ্রহ করতে শুরু করেন মুসলিম সেনাবাহিনীর একাংশ।

আপাত এই বিজয়ের পরই আস্তে আস্তে ঘটনার মোড় ঘুরতে থাকে। নবিজি ﷺ-এর কড়া নিষেধের কথা ভুলে গিয়ে তিরন্দাজদের বড় একটি অংশ নিজ অবস্থান ছেড়ে গনীমাতের মাল সংগ্রহে ছুটে আসেন। পঞ্চাশ জনের মাঝে মাত্র দশ জন দাঁড়িয়ে থাকেন ধৈর্য ধরে। কিন্তু বিপদ যা হবার, ততক্ষণে হয়ে গেছে। দুর্বল হয়ে পড়েছে মুসলিমদের প্রতিরক্ষাব্যূহ।

সুযোগ কাজে লাগাতে ভুললেন না ঝানু সমরবিদ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। নিজ বাহিনী নিয়ে অবশিষ্ট দশ তিরন্দাজকে সহজেই শেষ করে দেন। পাহাড়ের উল্টোদিক থেকে ঘুরে এসে একেবারে হতভম্ব করে দেন মুসলিমদের। চারদিক থেকে মুসলিমদের ঘেরাও করে খালিদের নেতৃত্বে হারানো ইজ্জত (!) পুনরুদ্ধারে ছুটে আসে মূর্তিপূজারির দল।

• নবিজির ওপর মুশরিকদের আক্রমণ ও নবিপ্রয়াণের গুজব

সেনাদলের পেছনে সাত জন আনসার ও দু'জন মুহাজিরের পাহারা-বেষ্টনীতে অবস্থান করছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। সেখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পান খালিদ ও তার অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ। নবিজি তারস্বরে ডেকে ওঠেন, "আল্লাহর বান্দারা! আমার দিকে এসো!" শব্দ শুনে গলার আওয়াজ চিনে ফেলে কাছেপিঠে থাকা মুশরিকরা। সাহায্য চলে আসার আগেই তাঁকে হত্যা করার নেশায় আওয়াজ অনুসরণ করে ছুটে আসে কিছু শত্রু। এ দৃশ্য দেখে নবি ﷺ ঘোষণা দেন, "কে আছে যে তাদের আমাদের থেকে দূরে সরাবে? তার প্রাপ্য হবে জান্নাত অথবা (বলেছেন,) সে জান্নাতে আমার ঘনিষ্ঠতম সহচর হবে।"

বারকয়েক এই ঘোষণা দেন তিনি। একের পর এক ছুটে আসতে থাকেন আনসাররা। আপন জীবন কুরবানি করে নবিজি ﷺ-কে রক্ষা করেন সবাই। এভাবে একে একে

---

[৩০৬] বুখারি, ৪০৭২; ইবনু হিশাম, ২/৬৭-৭২।

সাত জন আনসার শহীদ হন।[৩০৭]

সপ্তম আনসারির শাহাদাতের পর নবিজির কাছে থেকে যান শুধু দুই মুহাজির তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)।[৩০৮]

এবার নবিজি ﷺ-এর দিকে মুশরিকরা পূর্ণ মনোযোগ দেয়। উড়ে আসা একটি পাথরখণ্ডের আঘাতে মাটিতে পড়ে যান নবিজি। ডান দিকের নিচের পাটির একটি দাঁত ভেঙে যায়, কেটে যায় নিচের ঠোঁট, আর শিরস্ত্রাণ ভেঙে গিয়ে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে কপাল আর মাথা। আরেক মুশরিক তরবারির আঘাত হানে নবিজি ﷺ-এর চোখের ঠিক নিচের হাড়ে। শিরস্ত্রাণ ছিদ্র হয়ে এর দুটো রিং ঢুকে যায় রাসূলের চেহারায়। আরেকজন তাঁর কাধে এত জোরে আঘাত করে যে, পরে এক মাস পর্যন্ত প্রচণ্ড ব্যথা রয়ে যায়। তবে নবিজি ﷺ গায়ে দুটি লৌহবর্ম পরিধান করেছিলেন। এই কারণে সেটা কাটতে সে সক্ষম হয়নি।[৩০৯]

ওদিকে নবিজি ﷺ-এর প্রতিরক্ষায় মুশরিকদের দিকে মুহুর্মুহু তির ছুড়ছেন সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)। নিজের তূণীর থেকে একটি একটি তির তার হাতে দিতে দিতে নবি ﷺ বলেন, "ছুড়তে থাকো। আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক।"[৩১০]

আর তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) তো গোটা শত্রুদলের বিরুদ্ধে এমনভাবে লড়ছেন, যেন তিনি একাই একটি যুদ্ধবাহিনী। যুদ্ধশেষে তার শরীরে ৩৫ থেকে ৩৯টির মতো ক্ষত পাওয়া যায়। নবিজির দিকে তেড়ে আসা শত্রুদের তির-তরবারিকে হাত দিয়ে বাধা দিতে থাকেন তিনি। একসময় প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হতে হতে অবশ হয়ে আসে আঙুলগুলো। একবার একটি তির হাতে লাগায় 'হিস' জাতীয় একধরনের শব্দ করে ওঠেন। নবি ﷺ সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "যদি এ জায়গায় বিসমিল্লাহ বলতে, তাহলে ফেরেশতারা তোমাকে ওপরে উঠাত এবং মানুষজন তোমাকে দেখতে পেত।"[৩১১]

মানবপ্রচেষ্টা যখন আর পেরে উঠছিল না, আল্লাহ তাআলা তখন তাঁর নবির সুরক্ষার্থে

---

[৩০৭] মুসলিম, ১৭৮৯।

[৩০৮] বুখারি, ৩৭২২, ৩৭২৩।

[৩০৯] বুখারি, ৪০৭৫।

[৩১০] বুখারি, ৪০৫৫। এটি আরবি ভাষায় অন্তরঙ্গতার গভীরতা প্রকাশের একধরনের বাচনভঙ্গি। (অনুবাদক)

[৩১১] বুখারি, ৩৮১১, নাসাঈ, ৩১৫১।

অলৌকিক সাহায্য পাঠান। জিবরীল এবং মিকাইল (আলাইহিমাস সালাম) নেমে এসে নবিজির হয়ে লড়াই শুরু করেন।[৩১২] সুযোগ পেয়ে আরও কয়েকজন সাহাবি এগিয়ে এসে জান বাজি রেখে প্রতিরক্ষায় যোগ দেন। সবার আগে আসেন আবূ বকর, আর তার সাথে আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)। আবূ বকর দেখেন যে, নবিজির মুখমণ্ডলে শিরস্ত্রাণের রিং গেঁথে আছে। ফলে তিনি সেগুলো বের করতে চাইছিলেন কিন্তু আবূ উবাইদা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পীড়াপীড়ির কারণে তাকে সুযোগ করে দেন। সুযোগ পেয়ে দাঁত দিয়ে টেনে ধাতব রিংগুলো বের করে আনেন আবূ উবায়দা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। এতে তাঁর সামনের দুটি দাঁত উপড়ে যায়। তারপর দু'জনে ছুটে যান মারাত্মকভাবে জখম হওয়া তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহর সাহায্যে।[৩১৩]

মিত্র আর শত্রুরা সমান তালে ছুটে আসতে থাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থান লক্ষ্য করে। স্বভাবতই তিনি তখন পুরো যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে। মানবঢাল হয়ে নবিজিকে সুরক্ষা দেন আবূ দুজানা, মুসআব ইবনু উমাইর, উমর ইবনুল খাত্তাব, আলি ইবনু আবী তালিব ও অন্যান্য সাহাবিগণ। রদিয়াল্লাহু আনহুম। একটু একটু করে একেবারে কাছে চলে আসা মুশরিকবাহিনীকে ঠেকিয়ে দিতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করেন সাহাবিরা। কেউ তির ছুড়ছেন, কেউ হচ্ছেন মানবঢাল, কেউ তরবারি চালাচ্ছেন, আর কেউ হাত দিয়ে ঠেকাচ্ছেন শত্রুদের তির।

মুসলিমদের পতাকাবাহী মুসআব ইবনু উমাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিশানা বানায় মুশরিকরা। অসংখ্য তরবারির আঘাতে একসময় তার ডান হাত দেহ থেকে বিছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তখন পতাকাটি বাম হাতে নিয়ে নেন মুসআব। শত্রুরা একসময় তার বাম হাতটিও কেটে ফেলতে সক্ষম হয়। তারপরও হাঁটুতে আঁকড়ে বুক আর গলার সাথে ঠেস দিয়ে পতাকা তুলে রাখেন তিনি। অবশেষে সে অবস্থাতেই আবদুল্লাহ ইবনু কামিআর তরবারির আঘাতে তিনি শহীদ হয়ে যান। নবিজি ﷺ আর মুসআব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর চেহারায় ছিল দারুণ মিল। আবদুল্লাহ ইবনু কামিআ খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে বলে যে, সে মুহাম্মাদ ﷺ-কে মেরে ফেলেছে। পৌত্তলিক বাহিনীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গুজবটি। মুসলিমদের জন্য এটি অনেকটা শাপে বর হয়ে দাঁড়ায়। আচমকা এই সুসংবাদ শুনে স্বস্তির সুবাতাস বয়ে যায় মুশরিক শিবিরে। ফলে আক্রমণের চাপও কমিয়ে ফেলে তারা। কারণ, তাদের ধারণায় তাদের আসল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।[৩১৪]

---

[৩১২] বুখারি, ৪০৫৪; মুসলিম, ২৩০৬।
[৩১৩] যাদুল মাআদ, ৩/১৯৭।
[৩১৪] ইবনু হিশাম, ২/৮০-৮৩; যাদুল মাআদ, ২/৯৭।

• মুসলিমদের মাঝে বিশৃঙ্খলা

চারদিক থেকে ঘেরাও হতে দেখে মুসলিমদের মূল বাহিনীতে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। কেউ দক্ষিণ দিকে পালিয়ে একদম মদীনা পৌঁছে যায়। কেউ পর্বতগিরির দিকে গিয়ে আশ্রয় নেয় তাঁবুতে। আর কয়েকজন যে নবিজির প্রতিরক্ষায় দৌড়ে আসেন, তা তো আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে কোনোকিছুই যেন সুচারু পরিকল্পনামাফিক হচ্ছিল না। বেশির ভাগ সেনা অবিচল থেকে লড়াই চালিয়ে গেলেও সাংগঠনিকতার অভাবে তেমন কোনও লাভ হচ্ছিল না। বিশৃঙ্খলা এমনই পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, নিজ দলের লোকদের চিনতে না পেরে নিজেদেরই আঘাত করতে থাকে মুসলিমরা। হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বাবা ইয়ামান (রদিয়াল্লাহু আনহু) নিহত হন মুসলিমদের হাতেই। নবিজি ﷺ-এর মৃত্যুসংবাদ কানে আসার পর তো যুদ্ধের ইচ্ছে যতটুকু ছিল, তাও উবে যায়। কেউ কেউ হাল ছেড়ে দিয়ে ময়দান থেকে চলে যান। তবে কারও প্রত্যয় আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। ঘোষণা দেন, "নবিজি ﷺ যেটার জন্য প্রাণ দিলেন, চলো আমরাও সেটার জন্য জান বাজি রাখি।"[৩১৫]

এই অবস্থাতেই হঠাৎ কা'ব ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবিজি ﷺ-কে একঝলক দেখতে পান। শিরস্ত্রাণে চেহারা ঢাকা থাকলেও চোখ দেখে নবিজিকে চিনতে পারেন তিনি। চিৎকার করে বলেন, "মুসলিমরা, সুসংবাদ! এই তো নবিজি! উনি বেঁচে আছেন!"

এই খবরে মুসলিমদের মনোবল ফিরে আসে। দলে দলে সবাই ছুটে আসেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে। অল্পক্ষণের মাঝেই ত্রিশ জনের একটি দল আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী হয়। নবি ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়ার। সেনাসারির মধ্য দিয়ে পুরো বাহিনীকে তিনি সফলভাবে পর্বতগিরির কাছে নিয়ে আসেন। পৌত্তলিকরা বাধা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে উল্টো দু'জন সৈনিক হারায়।

পিছু হটে আসাটা মুসলিমদের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হয়। এমনিতেই নবিজি ﷺ-এর একটি নির্দেশ অমান্য করে আজকের যুদ্ধে এই দুর্দশা। নিশ্চিত বিজয় ঘুরে গিয়ে উল্টো নিজেরাই গণহারে মারা পড়ার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু নবি ﷺ তাঁর সেনাদলকে পিছু হটিয়ে এনে দক্ষ হাতে সে বিপর্যয় সামাল দেন।

---

[৩১৫] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ২/৪৮৯।

• পর্বতগিরিতে আশ্রয়

অবরুদ্ধ দশা থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিমরা গিরিখাতের নিরাপদতর আশ্রয়ে জড়ো হন। এরপর খানিকক্ষণ মুসলিম ও পৌত্তলিকদের মাঝে কিছু ছোটখাটো দাঙ্গা চলে। মুশরিকরা বড় আকারের হামলার চিন্তা বাদ দিয়ে এ-রকম ছোট ছোট আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে নিহত মুসলিমদের খুঁজে খুঁজে তাদের লাশ বিকৃত করতে থাকে। তাদের কান, নাক, লজ্জাস্থান কেটে দেয় এবং পেট ফুটো করে ফেলে। হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর তরবারিতে আত্মীয় হারানোর শোকে উন্মাদ হয়ে ছিল আবূ সুফইয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতু উতবা। হামযার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে সে এক জঘন্য কাজ করে। তার পেট চিরে কলিজা বের করে এনে চিবুতে শুরু করে। তবে গিলতে না পেরে পরে ফেলে দেয়। সে হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাক, কান ইত্যাদি কেটে কানের দুল ও পায়ের নুপুর বানিয়েছিল।[৩১৬]

উবাই ইবনু খালাফ শেষ একটি চেষ্টা করে রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার। কিন্তু তা করতে গিয়ে উল্টো নিজেই পটল তোলে। নবি ﷺ একটি বল্লম ছুড়ে মেরে তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দেন। বাহনের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে ষাঁড়ের মতো হাঁক বেরিয়ে আসে তার মুখ দিয়ে। মক্কায় ফেরার সময় 'সারিফ' নামক স্থানে সে মারা যায়।[৩১৭]

আবূ সুফ্ইয়ান ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের নেতৃত্বে আরও কয়েকজন কুরাইশি সেনা আক্রমণে আসে। বিভিন্ন দিক থেকে পাহাড়ে চড়ে মুসলিমদের পরাভূত করার চেষ্টা করে তারা। কিন্তু কয়েকজন মুহাজিরকে সাথে নিয়ে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের পাল্টা আক্রমণ করে নেমে যেতে বাধ্য করেন।[৩১৮] সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর তিরের আঘাতে সে সময় তিন মুশরিকের মৃত্যু হয়েছে বলেও কিছু সূত্র থেকে জানা যায়।[৩১৯]

শেষ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আবূ সুফ্ইয়ান ও খালিদ সিদ্ধান্ত নেন যে, এবার বাড়ি ফেরার পালা। নিজেদের বাইশ জন[৩২০] হারালেও শত্রুর যতটুকু ক্ষতি করা গেছে, তাতে খুশি হওয়ারই কথা। মুসলিমদের মৃতদেহ পাওয়া গেছে সত্তরটি। একচল্লিশ জন

---

[৩১৬] ইবনু হিশাম, ২/৯০।
[৩১৭] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ২/৩২৭।
[৩১৮] ইবনু হিশাম, ২/৮৬।
[৩১৯] যাদুল মাআদ, ২/৯৫।
[৩২০] এক বর্ণনামতে, ৩৭জন।

শহীদ খাযরাজ গোত্রের, চব্বিশ জন আওসের, আর চার জন মুহাজির। মুসলিমদের পক্ষে যুদ্ধ করা একজন ইয়াহূদিও নিহত হন এ যুদ্ধে।[৩২১]

মুসলিম শিবিরে এখন বিশ্রাম নেওয়ার পালা। উহুদ অঞ্চলে 'মিহ্রাস' নামক একটি জলাধার ছিল। নবিজি ﷺ বিশ্রাম নিতে বসলে আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেখান থেকে পানি নিয়ে আসেন। তবে পানিতে দুর্গন্ধ থাকায় নবিজি তা পান করেননি। শুধু মুখ ধুয়ে বাকি পানিটুকু মাথায় ঢালেন। যাতে যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হয়। কিন্তু এতে তাঁর ক্ষতস্থান থেকে আবারও রক্তপাত শুরু হয়। কোনোভাবেই তা বন্ধ হয় না। অবশেষে ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) চাটাইয়ের একটি টুকরা পুড়িয়ে ছাই দিয়ে ক্ষতস্থানে ড্রেসিং করে দেন। ফলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) পরিষ্কার পানির সন্ধান পেয়ে তা নিয়ে আসেন, যা পান করে নবি ﷺ তৃপ্তি লাভ করেন। আঘাতের কারণে সে বেলা বসেই যুহরের সালাত আদায় করেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। সাহাবিগণও নবিজির অনুসরণে বসেই জামাআতে শরীক হন।[৩২২]

সে সময় মদীনা থেকে কয়েকজন নারী সাহাবি এসে পৌঁছায়। তাদের মধ্যে ছিল আয়িশা, উম্মু সুলাইম এবং উম্মু সুলাইত (রদিয়াল্লাহু আনহুন্না)। তারা আহত সৈনিকদের শুশ্রূষা করতে থাকেন। চামড়ার পাত্রে করে আহতদের কাছে পরিষ্কার পানি এনে পান করান।[৩২৩]

• বাগ্‌বিতণ্ডা ও যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি

উভয়পক্ষই রণে ক্ষান্ত দেওয়ার মানসিকতায় আছে। পৌত্তলিকরা মক্কায় ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত শেষ করলে আবূ সুফ্‌ইয়ান উহুদ পাহাড়ে উঠে চিৎকার করেন, "তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মাদ আছে?" নবি ﷺ কোনও শব্দ করতে নিষেধ করায় মুসলিমদের পক্ষ থেকে কেউ কোনও জবাব দেয়নি। আবূ সুফ্‌ইয়ান আবার চিৎকার দেন, "তোমাদের মাঝে কি আবূ কুহাফার পুত্র আবূ বকর আছে?" আবারও নীরবতা। তৃতীয়বার আবূ সুফ্‌ইয়ানের চিৎকার, "তোমাদের মাঝে কি উমর ইবনুল খাত্তাব আছে?" এবারও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

নীরবতায় উৎফুল্ল হয়ে আবূ সুফ্‌ইয়ান ডেকে উঠেন, "আচ্ছা, চলো! ওই তিনটা থেকে অবশেষে মুক্তি পাওয়া গেছে।" উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এবার আর চুপ থাকতে

---

[৩২১] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ৭/৩৫১; ইবনু হিশাম, ২/১২২-১২৯।
[৩২২] বুখারি, ৩০৩৭; ইবনু হিশাম, ২/৮৫-৮৭।
[৩২৩] বুখারি, ২৮৮১; নূরুদ্দ দীন হালাবি, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ২/২২।

পারলেন না। গর্জে উঠলেন, “ওরে আল্লাহর শত্রু! যাদের নাম ধরে ডেকেছ, সবাই জীবিত আছে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের কপালে আরও বেইজ্জতি রেখেছেন, অপেক্ষায় থাকো।”

আবূ সুফ্ইয়ান বললেন, “তোমাদের মুর্দাদের নাক-কান কেটে দেওয়া হয়েছে। তবে আমি এটার নির্দেশ দিইনি আবার মানাও করিনি।”

তারপর উঁচু স্বরে বলে উঠলেন, “হুবালের জয় হোক!”

রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে সাহাবিরা ঘোষণা দিলেন, “আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে বড় ও মহান।”

“আমাদের সাথে উযযা মা আছেন, তোমাদের কেউ নেই!” আবূ সুফইয়ানের চিৎকার।

সাহাবিদের জবাব, “আল্লাহ আমাদের মাওলা, তোমাদের কোনও মাওলা নেই!”

“আজ দারুণ জেতা জিতেছি! এটা বদরের প্রতিশোধ। যুদ্ধ তো (কূপের) বালতির ন্যায়। একবার এর হাতে, একবার ওর হাতে।”

উমরের প্রত্যুত্তর, “এটা সমান সমান না! আমাদের মৃতরা আছে জান্নাতে, আর তোমাদের মৃতরা জাহান্নামে।”

উমরের জবাবে আবূ সুফ্ইয়ান একটু দমে যান, পরে বলেন, “তোমরা তো এমনটাই বিশ্বাস করো। তবে বাস্তবে এমনটা হলে সত্যিই আমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত।” একটু পর বলেন, “উমর, আমি আল্লাহর নামে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি। সত্যি করে বলো তো, আমরা কি মুহাম্মাদকে খতম করতে পেরেছি?”

“আল্লাহর কসম! পারোনি। তোমার সব কথা নবিজি আমাদের পাশে বসেই শুনছেন।”

“ঠিক আছে। ইবনু কামিআর চেয়ে আমি তোমাকেই বেশি সত্যবাদী বলে জানি।”[৩২৪]

তারপর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, “তাহলে আগামী বছর বদরে আবার যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি রইল।”

নবিজি ﷺ-এর অনুমোদনক্রমে এক সাহাবি জবাব দেন, “ঠিক আছে। এই সিদ্ধান্তই আমাদের এবং তোমাদের মাঝে পাকাপোক্ত হয়ে থাকল।”[৩২৫]

---

[৩২৪] বুখারি, ৩০৩৯; যাদুল মাআদ, ২/৯৪; ইবনু হিশাম, ২/৯৩-৯৪।

[৩২৫] ইবনু হিশাম, ২/৯৪।

• মুশরিকদের মক্কায় ফেরা

এই বাক্যবিনিময়ের পর পৌত্তলিক সেনাদল ফিরতি যাত্রা আরম্ভ করে। উটের পিঠে চড়ে ঘোড়াগুলোকে পাশাপাশি হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। এটা রণে ভঙ্গ দেওয়ার ইঙ্গিত। এদের এভাবে ফিরে চলে যাওয়ার পেছনে আল্লাহর রহমত ছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যাই পাওয়া সম্ভব না। কারণ, তখন মদীনা একেবারে অরক্ষিত। পৌত্তলিকরা সেদিন আক্রমণে এগিয়ে আসলে সহজেই পুরো শহর দখল ও তছনছ করে ফেলতে পারত। ইতিহাস লেখা হতো একেবারেই ভিন্নভাবে। অন্যরকম করে।

শত্রুরা চলে যাওয়ার পর মুসলিমরা ময়দানে বেরিয়ে এসে আহত ও শহীদদের খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেন। কয়েকজন শহীদের দেহ মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নবিজি ﷺ-এর আদেশক্রমে আবার তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। শাহাদাতের স্থানে যুদ্ধের পোশাকেই গোসল ও জানাযা ছাড়া দাফন করতে বলেন তাদের। দু-তিন জন শহীদকে একটি কবরেও রাখতে হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে দু'জন শহীদের কাফন ছিল এক কাপড়ে। তবে তাদের মাঝে ইযখির ঘাস দিয়ে দেওয়া হতো। শহীদদের মাঝে যারা কুরআন বেশি জানতেন, তাদের আগে কবরে নামানো হয়। আল্লাহর রাস্তায় সকল আত্মত্যাগকারী শহীদদের লক্ষ্য করে নবি ﷺ বলেন, "কিয়ামাতের দিন আমি তাদের হয়ে সাক্ষ্য দেবো।"[৩২৬]

শহীদদের দেহ সংগ্রহ করার এক পর্যায়ে সাহাবিরা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পান। হানযালা ইবনু আমির (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দেহ মাটি থেকে একটু উঁচুতে শূন্যে ভাসছে, সারা শরীর থেকে টপটপ করে ঝরছে পানির ফোঁটা। নবি ﷺ ব্যাখ্যা করে দেন যে, "ফেরেশতারা তাকে গোসল করাচ্ছে।" সদ্যবিবাহিত এই সাহাবি বাসরের পরপরই জিহাদের ডাক শুনতে পান। ঘরে নববধূ রেখে ছুটে এসেছিলেন আল্লাহর রাস্তায়। গোসলের জন্য দেরিটুকু পর্যন্ত করেননি। বীরবিক্রমে লড়াই করে পান করেন শাহাদাতের সুধা। চিরকাল তিনি স্মরিত হবেন "গসীলুল মালাইকা" (ফেরেশতাদের হাতে স্নাত) নামে।[৩২৭]

হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে কবর দেওয়ার সময়ও চলে এল। তার কাফনের কাপড় এতই ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যায়, আর পা ঢাকলে মাথা। পরে মাথা ঢেকে দিয়ে কিছু ইযখির ঘাস তার পায়ে রেখে দাফন করা হয়। নিহত এই বীর

---

[৩২৬] বুখারি, ১৩৪৩।

[৩২৭] যাদুল মাআদ, ২/৯৪।

অর্জন করে নিয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি। মহা আড়ম্বরপূর্ণ দাফনকার্য পেলেই কী, আর না পেলেই-বা কী?

হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হন মুসআব ইবনু উমাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু)।[৩২৮]

• মুসলিম বাহিনী মদীনা অভিমুখী

শহীদদের দাফন-কাফন শেষ। এবার মদীনা ফেরার পালা। পথে থেমে কয়েকজন নারীকে সান্ত্বনা দেন তিনি। তাদের আত্মীয়রা যুদ্ধে নিহত হয়েছে। নবিজির দুআ তাদের অন্তর প্রশান্ত করে।

প্রিয়জন হারানোর বেদনা ধৈর্য ধরে সহ্য করেন মুসলিমরা। নবিজি ﷺ নিরাপদ আছেন, এ সংবাদেই প্রশান্তি সবার। আপনজনের চেয়ে নবিজিকে তাঁরা কত বেশি ভালোবাসতেন, তার সামান্য নমুনা পাওয়া যায় একটি ঘটনায়। যুদ্ধফেরত মুসলিমদের একটি দলের সাথে দীনার বংশের এক নারীর দেখা হয়। তারা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নারীটিকে জানান যে, তার স্বামী, ভাই এবং বাবা তিন জনই যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু নারীটি উত্তরে বলেন, "আগে বলুন নবিজি কেমন আছেন?" জানানো হলো, "আল্লাহর শোকর, তিনি নিরাপদ আছেন।" নারীটির শুধু শোনা কথায় মন মানে না। তিনি নিজের চোখে গিয়ে রাসূলুল্লাহকে দেখতে চান। অবশেষে নবিজিকে সামনাসামনি দেখতে পেয়ে বলেন, "আপনি যে বেঁচে আছেন, তাতেই সব দুঃখ উধাও হয়ে গেছে।"[৩২৯]

সে রাতে মদীনাবাসীরা একদম সতর্ক অবস্থায় থাকেন। হাজার হোক, জরুরি অবস্থা তখনো চলমান। ক্লান্তি আর আঘাত তো আছেই, তার সাথে যুক্ত হয়েছে নিজেদের ভুলের কারণে নবিজি ﷺ-এর জীবন ঝুঁকিতে ফেলার অনুশোচনা। সবাই তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাহাড়া দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো ফিরে যেতে থাকা শত্রুদলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা। মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ যেন চলে না আসে, তা নিশ্চিত করতে চাইছিলেন তিনি।

• হামরাউল আসাদের যুদ্ধ

ঠিক পরদিন সকালেই নবি ﷺ একজন ঘোষককে দিয়ে ঘোষণা করান যে, উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবাইকে এক্ষুনি শত্রু ধাওয়া করতে যেতে হবে। চরম ক্লান্তি আর

---

[৩২৮] বুখারি, ১২৭৪।

[৩২৯] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ২/৯৯।

মারাত্মক ক্ষত নিয়ে প্রতিটি মুসলিম সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। মদীনা থেকে আট মাইল দূরে হামরাউল আসাদে স্থাপন করা হয় সেনাশিবির।

ওদিকে মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে রাওহা নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করে সলা-পরামর্শ চলছে মুশরিক শিবিরে। সেনাপতিদের কটূক্তি করার জের ধরে চলছে বাগ্‌বিতণ্ডা। অরক্ষিত মদীনায় আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগকে পায়ে ঠেলে আসার শিশুসুলভ সিদ্ধান্ত নিয়ে সবাই এখন খেপা।

মুসলিম শিবিরেও তখন পরিকল্পনা চলছে। মা'বাদ ইবনু আবী মা'বাদ খুযাঈ নবিজি ﷺ-এর এক শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি হামরাউল আসাদে এসে উহুদের ঘটনা সম্পর্কে সমবেদনা জানান। নবিজি তাকে বললেন আবূ সুফইয়ানের কাছে যেতে। ভীতিকৌশল ব্যবহার করে তাড়িয়ে দিতে বললেন মুশরিক বাহিনীকে। কথামতো মা'বাদ গেলেন রাওহায়। সিদ্ধান্তের পাল্লা তখন মদীনা পুনরাক্রমণের দিকেই হেলে আছে।

মা'বাদ গিয়ে শুরু করলেন মারাত্মক বর্ণনা। মুসলিমরা কেমন ভয়ানক প্রস্তুতি নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করতে আসছে, তা বলতে লাগলেন রং চড়িয়ে, "আরে আপনারা তো জানেন না। মুহাম্মাদ এত বিশাল এক দল নিয়ে বেরিয়েছেন, জীবনে এত বড় বাহিনী দেখিনি। প্রতিশোধ আর রক্তের নেশায় পাগল হয়ে আছে সবাই। তোমরা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ওই পাহাড়টার পেছন দিকে ওদের প্রস্তুতিটা একবার দেখে নাও।"

বুদ্ধি কাজে দিল। সাহস হারিয়ে ফেলল মাক্কি বাহিনী। আবূ সুফ্‌ইয়ানও তার রণপরিকল্পনাকে একই রকম ভীতিকৌশলে সীমিত করে ফেলেন। মাক্কি বাহিনী আরেক রাউন্ডের জন্য প্রস্তুত—এই বলে একটি কাফেলাকে দায়িত্ব দেন যেন তারা মুসলিম বাহিনীর নিকট তা খুব করে প্রচার করে। এই ফাঁকে বাহিনী নিয়ে তড়িঘড়ি করে নিজেরা ধরেন মক্কার পথ।

হারতে হারতে বেঁচে আসা মুসলিম বাহিনী এই সতর্কবার্তা শুনে লড়াইয়ের পূর্ণপ্রস্তুতি নেন। নতুন আক্রমণের ঘোষণায় তাদের মনোবল আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَّقَالُوْا

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿۳۷۱﴾

"যাদের লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য কাফিররা বহু সাজ-সরঞ্জাম সমাবেশ করেছে, তাদের ভয় করো। তখন

তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট আর তিনি কতই-না চমৎকার তত্ত্বাবধায়ক।”[৩৩০]

যেহেতু ফাঁকা হুমকি আর বাস্তবায়িত হয়নি, তাই পরের প্রশান্ত অবস্থাটির কথা আয়াতে তুলে ধরা হয় এভাবে,

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾

“ফলে তারা ফিরে এল আল্লাহর নিয়ামাত ও অনুগ্রহ নিয়ে। কোনও ক্ষতিই তাদের স্পর্শ করেনি। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছু তারা চায়ওনি। আর আল্লাহ তো সীমাহীন অনুগ্রহকারী।”[৩৩১]

উহুদ-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ও যুদ্ধসমূহ

উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের দুর্বল দিক প্রকাশ হয়ে পড়ে। মুশরিকরা এর ফায়দা লুটতে ভোলেনি। মুসলিমরা পরপর কয়েকটি বেদনাদায়ক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন।

- শোকাবহ রজী’

হিজরি চতুর্থ সনের সফর মাস। আদাল ও কারা গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল নবি ﷺ-এর কাছে আসে। তাদের জনগোষ্ঠীরা ইসলামের প্রতি বেশ আগ্রহী—এ কথা জানায় তারা। অপরিচিত এই ধর্মবিশ্বাসটি সম্পর্কে তারা আরও জানতে ইচ্ছুক। আসিম ইবনু সাবিত (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে দশ জন সাহাবির একটি দলকে তাদের ওখানে পাঠান নবিজি ﷺ। ঈমান ও কুরআন শেখাতে গিয়ে মুসলিমদের সে দলটি আর ফিরে আসেননি। মুশরিকদের বিশ্বাসঘাতকতায় আল্লাহর রাহে শহীদ হয়ে যান তারা।

রজী’ নামক স্থানে হুযাইল গোত্রের একটি দল ওত পেতে ছিল। আদাল আর কারার লোকেরাই তাদের লেলিয়ে দিয়েছে মুসলিমদের ওপর। একটি পাহাড়ে থাকা অবস্থায় দশ জন সাহাবির ছোট্ট দলটিকে চারদিক থেকে জেঁকে ধরে প্রায় এক শ হুযাইলি তিরন্দাজ। তারা শপথ করে বলে যে, মুসলিমরা নেমে এলে তাদের হত্যা করা হবে না। কিন্তু দলনেতা আসিম নেমে আসতে অস্বীকৃতি জানান। তিরযুদ্ধে সাত জন সাহাবি

---

[৩৩০] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৭৩।
[৩৩১] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৭৪।

শহীদ হন। বাকি তিন জনকে আবারও শপথ করে বলা হয় যে, তাদের হত্যা করা হবে না। ফলে নেমে আসেন তারা। আসার সাথে সাথে হুযাইলিরা তাদের হাত-পা বেঁধে ফেলতে শুরু করে। একজন সাহাবি মন্তব্য করেন, "এটা হলো প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা।" তাকে বাঁধতে আসা লোকটিকে তিনি বাধা দিতে উদ্যত হন। ফলে তাকেও হত্যা করা হয়। খুবাইব ইবনু আদি আর যাইদ ইবনু দাসিনা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বন্দি করে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয় সেই পুরোনো নিপীড়ক কুরাইশদের হাতে। নিজের জীবন আর তাদের নিজেদের রইল না।

বদর যুদ্ধে হারিস ইবনু আমির ইবনি নাওফালকে কতল করেছিলেন খুবাইব। এবার খুবাইবের জীবনের মালিকানা নিয়ে নেয় হারিসের ছেলে। কিছুদিন কারাভোগ করানোর পর তানঈম অঞ্চলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড দিতে। দণ্ড কার্যকরের আগে তিনি দু-রাকাআত সালাত আদায় করে নেন। বদদুআ করেন যেন তার খুনিদের প্রত্যেকের ওপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হয়। মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার সময় আবৃত্তি করেন,

"মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু হলে, নেই পরোয়া কোনও কিছুতেই;
যে পাশ থেকেই করা হোক হত্যা, তা হবে আল্লাহর পথেই।
আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় আমি হচ্ছি নিহত;
তিনি চাইলে কর্তিত অঙ্গেও দেবেন বরকত অবিরত।"

আবূ সুফ্ইয়ান খুবাইব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন, "কী? এখন আফসোস হচ্ছে না? মনে হচ্ছে না আজকে তোর জায়গায় মুহাম্মাদ মারা গেলে ভালো হতো, আর তুই থাকতি পরিবারের সাথে নিরাপদে?"

খুবাইব হুংকার দেন, "আল্লাহর কসম! নবিজির গায়ে একটা কাঁটা বিঁধুক, সেটাও আমি চাই না।"

এরপর হারিস ইবনু আমিরের ছেলে তাঁকে তার পিতার বদলে হত্যা করে।

আর এদিকে সফওয়ান ইবনু উমাইয়ার হাতে নিজের মৃত্যুর অপেক্ষায় আছেন যাইদ ইবনু দাসিনা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। সাফওয়ানের বাপ উমাইয়া ইবনু মুহাররিস মারা পড়েছিল যাইদের তরবারিতে। কিছু সূত্রমতে আবূ সুফইয়ানের সাথে ওপরের কথোপকথনটি হয়েছিল যাইদ ইবনু দাসিনার, খুবাইবের নয়।

রজী' পাহাড়ে পড়ে থাকা মুসলিমদের লাশগুলোকেও কুরাইশরা অপমান করার ফন্দি করে। আসিম (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর লাশ নিয়ে আসার জন্য একদল লোককে

পাঠানো হয়। কিন্তু তার দেহের ওপর ভনভন করতে থাকা ভীমরুলের কারণে কাছেও ঘেঁষতে পারেনি মুশরিকরা। জীবদ্দশায় আসিম (রদিয়াল্লাহু আনহু) কসম করেছিলেন যে, জীবনে তিনি কোনও পৌত্তলিককে ছোঁবেন না, তাদেরও তার শরীর ছুঁতে দেবেন না। মরণের পরও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সে কসম রক্ষা করেন।[৩৩২]

• মর্মান্তিক বি'রু মাঊনা

প্রায় কাছাকাছি সময়ে এর চেয়েও দুঃখজনক আরেকটি ঘটনার শিকার হন মুসলিমরা। আবূ বারা আমির ইবনু মালিক নামে এক লোক ছিল। বল্লম যেন তার কাছে খেলনার মতো। 'মুলায়িবুল আসিন্নাহ' (বল্লম-খেলুড়ে) নামে তাই সবার কাছে পরিচিত। নবিজি ﷺ-এর সাথে একবার দেখা করতে আসে সে। যথারীতি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন আল্লাহর রাসূল। আবূ বারা সে সময় হ্যাঁ-না কিছুই জানায়নি। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিয়ে যায় নাজদ অঞ্চলে। সেখানকার লোকেরা নাকি ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী। নবিজি যদি কয়েকজন সাহাবিকে সেখানে পাঠাতেন, তাহলে নাজদিরা ইসলামের ব্যাপারে কিছু শিখে-পড়ে নিত। ওই সাহাবিদের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল আবূ বারা।

কুরআন-পারদর্শী সত্তর জন সাহাবির একটি দলকে এ কাজে পাঠান নবি ﷺ। বি'রু মাঊনা নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন তারা। আল্লাহর এক দাগী শত্রু আমির ইবনু তুফাইলের কাছে নবিজির পক্ষ থেকে একটি চিঠি নিয়ে যান হারাম ইবনু মিলহান (রদিয়াল্লাহু আনহু)। দাম্ভিক আমির সেটা নিজে না পড়ে তার এক দাসকে দিয়ে পড়াতে লাগল। হারাম (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মনোযোগ সেদিকেই। সুযোগ পেয়ে বল্লমের আঘাতে তাকে শহীদ করে ফেলে আমির। তাকে অবাক করে দিয়ে হারাম ইবনু মিলহানের শেষ কথা হয়, "আল্লাহু আকবার! কা'বার রবের কসম, আমি সফল!"

আমির ইবনু তুফাইল তারপর বানূ আমির গোত্রের সবাইকে আহ্বান করে বাকি সাহাবিদের আক্রমণ করতে। কিন্তু আবূ বারার দেওয়া নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি ভাঙতে রাজি হয়নি তারা। তাই সে শরণাপন্ন হয় বানূ সুলাইম এবং আরও কিছু উপগোত্রের, যেমন রি'ল, যাকওয়ান, লাহইয়ান এবং উসাইয়া। এরা ঠিকই কালবিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মুসলিমদের ওপর। কা'ব ইবনু যাইদ এবং আমর ইবনু উমাইয়া (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) ছাড়া সবাই শহীদ হন। আহত কা'বকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল। সে যাত্রায় জীবিত উদ্ধার হয়ে তিনি পরে খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

---

[৩৩২] বুখারি, ৩০৪৫; ইবনু হিশাম, ২/১৬৯-১৭৯; যাদুল মাআদ, ২/১০৯।

মুনযির ইবনু উকবার সাথে মাঠে উট চরাচ্ছিলেন আমর ইবনু উমাইয়া দামরি (রদিয়াল্লাহু আনহু)। দূর থেকে দেখতে পান বি'রু মাঊনার ওপর উড়ন্ত শকুনের ঝাঁক। সাথে সাথে আঁচ করে ফেলেন আমির ইবনু তুফাইলের সাথে মুসলিমদের সাক্ষাতের পরিণতি। তৎক্ষণাৎ মুনযির ছুটে যান মুসলিম ভাইদের বাঁচাতে। নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিরোধ করেন শত্রুদের। আমর ইবনু উমাইয়াকে বন্দি করা হলেও সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। তিনি ছিলেন মুদার গোত্রের সদস্য। আমির ইবনু তুফাইলের মা গোলাম আযাদ করার অঙ্গীকার করেছিলেন। সেটা রক্ষার্থে আমর ইবনু উমাইয়াকে মুক্ত করে দেয় আমির ইবনু তুফাইল। তবে তার আগে তার মাথার এক গোছা চুল কেটে রাখে বিজয়ের স্মৃতি হিসেবে।

একমাত্র জীবিত সদস্য হিসেবে মদীনায় ফিরে আসেন আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। পথে কারকারাহ অঞ্চলে বানূ কিলাবের দুই ব্যক্তির সাথে দেখা হয় তার। দুঃসহ ঘটনার আকস্মিকতা তখনো কাটিয়ে উঠতে না পারা আমর ওই দু'জনকে শত্রু ভেবে খুন করে ফেলেন। অথচ তাদের সাথে নবি ﷺ-এর শান্তিচুক্তি ছিল। অবশেষে মদীনায় ফিরে এসে তিনি পুরো ঘটনা খুলে বলেন। শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ শুধু বলেন, "এমন দু'জনকে হত্যা করেছ, যাদের রক্তের ক্ষতিপূরণ আমাকে আদায় করতে হবে।"

রজী' ও বি'রু মাঊনার ঘটনা নবিজি ﷺ-কে চরমভাবে শোকাহত করে। শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের তাবলীগ করতে যাওয়া দুটি দল একই মাসে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। বলা হয়ে থাকে যে, দুটি ঘটনার সংবাদ একই রাতে পেয়েছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। টানা ত্রিশ দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে কুনূতে নাযিলা পড়ে শহীদদের খুনিদের প্রতি বদদুআ করেন। অবশেষে ওহির মাধ্যমে জানানো হয় যে, ওই শহীদ বান্দারা আল্লাহ তাআলার সন্তোষভাজন ও সন্তুষ্ট হয়ে জান্নাতে প্রশান্তিতে রয়েছেন। এরপর নবি ﷺ কুনূতে নাযিলা পড়া বন্ধ করে দেন।[৩৩৩]

• বানূ নাদীরের যুদ্ধ (রবীউল আউয়াল, ৪র্থ হিজরি)

এদিকে নবিজি ﷺ-কে একসাথে অনেক দিকে মনোযোগ দিতে হচ্ছে। শান্তিচুক্তিবদ্ধ বানূ কিলাবের দু'জন লোক প্রাণ হারিয়েছেন আমর ইবনু উমাইয়ার হাতে। রক্তমূল্য পরিশোধ না করলে সেটা শান্তিচুক্তির লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে। এর জের ধরে হতে পারে আরও অনেক রক্তপাত। কয়েকজন সাহাবিসহ ইয়াহূদি গোত্র বানূ নাদীরের কাছে গেলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। উদ্দেশ্য, রক্তমূল্য পরিশোধে তাদের অংশগ্রহণ করতে বলা।

---

[৩৩৩] বুখারি, ১০০১, ১০০২, ১০০৩; ইবনু সা'দ, তবাকাত, ২/৫৩-৫৪।

তারা প্রতিক্রিয়া জানাল বেশ ভদ্রভাবেই, “আবুল কাসিম। আমরা তা-ই করব। আপনি এখানে একটু বসুন।” নবিজিকে অপেক্ষায় রেখে তারা নিজেদের মাঝে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল। দুর্ভাগ্যবশত তাদের আত্মমর্যাদাবোধের ওপর শয়তানের জয় হলো। আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করার কাপুরুষোচিত ফন্দি আঁটে তারা। ভারী একটা জাঁতা জোগাড় করে ঘোষণা করে, “কে আছে যে এটা ওই লোকটার মাথার ওপর ফেলতে পারবে?” জঘন্য এই কাজটি করতে রাজি হয় আমর ইবনু জাহ্‌শ।

কিন্তু তার আগেই জিবরীল (আলাইহিস সালাম) চলে এসে নবিজি ﷺ-কে চক্রান্তের কথা জানিয়ে দেন। নবিজি সাথে সাথে উঠে গিয়ে মদীনার পথ ধরেন।

চুক্তিবদ্ধ মিত্রের পক্ষ থেকে এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা মোটেও হালকা ব্যাপার নয়। বানূ নাদীরের এই ষড়যন্ত্র প্রমাণ করে দিল যে, মুসলিমদের সাথে তাদের সহাবস্থান অসম্ভব। স্বভাবতই নবি ﷺ তাদের মিত্রতার সমাপ্তি ঘটান। ওই ইয়াহূদি গোত্রের সাথে মুসলিম সমাজের এখন যুদ্ধের সম্পর্ক। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দিয়ে ইয়াহূদিদের কাছে একটি বার্তা পাঠান নবি ﷺ—‘দশ দিনের মাঝে তাদের মদীনা ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই সময়সীমার পর তাদের কাউকে মদীনায় পাওয়া গেলে ভোগ করতে হবে মৃত্যুদণ্ড।’

আলটিমেটাম পেয়ে ইয়াহূদিরা সহায়-সম্পত্তি গোছগাছ শুরু করে দেয়। বাধ সাধে মুনাফিক-শিরোমণি আবদুল্লাহ ইবনু উবাই। তার নাকি দুই হাজার সেনার এক বাহিনী প্রস্তুত আছে। যেকোনও বিপদে তারা বানূ নাদীরকে প্রতিরক্ষা দিতে প্রস্তুত। নবিজি ﷺ-এর প্রত্যয়কে আরও একবার ভুল বুঝল মুনাফিকরা। মিথ্যের বেসাতির ওপর গড়ে ওঠা এই মিত্রতার ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে,

> أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾

> “আপনি কি মুনাফিকদের দেখেননি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফির ভাইদের বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে অবশ্যই আমরা

তোমাদের সাহায্য করব। আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।"[৩৩৪]

তারা আরও বলে যে, বানূ কুরাইযা এবং গতফানও তোমাদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত আছে। বন্ধুর বেশধারীদের কাছ থেকে এমন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ইয়াহূদিদেরও বুকের পাটা বেড়ে যায়। নবি ﷺ-এর কাছে বার্তা পাঠিয়ে বলে, "যাব না আমরা। আপনার যা মনে চায় করুন।"

নবি ﷺ জবাব দিলেন, "আল্লাহু আকবার!" সাহাবিদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো তা। এটি যুদ্ধের আহ্বান। আবদুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূম (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে মদীনার দায়িত্ব অর্পণ করে আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে মুসলিম সেনাদলের পতাকা দিয়ে রাসূল ﷺ অগ্রসর হলেন বানূ নাদীরের পুরো অঞ্চলটি অবরোধ করতে। দুর্গে আশ্রয় নিয়ে তির ও পাথরের বন্যা ছোটাল ইয়াহূদিরা। রসদের উৎস আর নিরাপত্তাবেষ্টনীর কাজ করছিল তাদের বিশাল বিশাল খেজুরবাগানগুলো। নবি ﷺ আদেশ দেন সব গাছ কেটে বাগানে আগুন ধরিয়ে দিতে। এ ঘটনায় বানূ নাদীরের মনোবল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে।

কোনও বর্ণনামতে ছয় দিন, কোনও বর্ণনামতে পনেরো দিন অবরোধ থাকার পর অবশেষে বানূ নাদীর হার মানে। নিরাপদে নির্বাসনে যেতে দেওয়ার শর্তে তারা অস্ত্র নামিয়ে রাখতে সম্মত হয়। মুনাফিকদল এবং আরেক ইয়াহূদি গোত্র বানূ কুরাইযা ছিল তাদের মিত্র। কেউ কথা রাখেনি।

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾

"তারা শয়তানের মতো, যে মানুষকে কাফির হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফির হয়, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।"[৩৩৫]

অস্ত্র ছাড়া বাকি সব সম্পত্তি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন রাসূল ﷺ। যা পেরেছে, তা-ই মাথায় করে নিয়ে বের হয়েছে বানূ নাদীর। এমনকি ঘরের দরজা, জানালা আর খুঁটিও বাদ যায়নি। কুরআনে এ ঘটনার বর্ণনা এসেছে এভাবে,

---

[৩৩৪] সূরা হাশর, ৫৯ : ১১।
[৩৩৫] সূরা হাশর, ৫৯ : ১৬।

﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

"মুমিনদের হাতে তো বটেই, নিজেদের হাত দিয়েও তারা নিজেদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করল। চক্ষুষ্মানেরা, এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নাও।"[৩৩৬]

মদীনা ছেড়ে তাদের অনেকেই বসত গাড়ে খাইবারে। অল্প কিছু সদস্য চলে যায় সিরিয়ায়। মদীনায় তাদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত ভূমিগুলো বণ্টন করে দেওয়া হয় প্রথম দিককার মুহাজিরদের মাঝে। আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় আবূ দুজানা এবং সাহল ইবনু হানীফ—আনসারদ্বয়ও কিছু অংশ পান। জমি থেকে আসা খাজনার কিছু অংশ রাসূল ﷺ ব্যয় করেন স্ত্রীদের ভরণ-পোষণে। বাকি অংশ যায় প্রতিরক্ষা খাতে। মুসলিম যোদ্ধাদের জন্য ঘোড়া ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়। পঞ্চাশটি বর্ম, পঞ্চাশটি শিরস্ত্রাণ, আর তিনশটি তরবারিও ইয়াহূদিদের থেকে পাওয়া গিয়েছিল।[৩৩৭]

- বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ (শা'বান, ৪র্থ হিজরি)

উহুদ থেকে ফেরার সময় আবূ সুফ্ইয়ান বলে গিয়েছিল পরের বছর বদরে আবার মুখোমুখি হওয়ার কথা। চৌঠা হিজরি সনের শা'বান মাস আসতেই নবি ﷺ আগেভাগে ময়দানে রওনা হন। বদরে শিবির স্থাপন করে আট দিন অপেক্ষা করেন আবূ সুফইয়ানের জন্য। সাথে ছিল দেড় হাজার সেনা ও দশটি ঘোড়া। সেনাদলের পতাকাবাহী ছিলেন আলি, আর মদীনার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক হিসেবে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)।

আবূ সুফ্ইয়ানও দু-হাজার সৈনিক নিয়ে বেরোন, যার মাঝে পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ার। কিন্তু শুরু থেকেই তার মাঝে প্রত্যয়ের অভাব ছিল সুস্পষ্ট। 'মাররুয যাহরান' নামক স্থানে 'মাজিন্না নামক প্রসিদ্ধ ঝরনার নিকট পৌঁছে বাহিনীকে তিনি বলেন, "চারপাশে সবুজ থাকলেই না যুদ্ধ করা যায়। প্রাণীগুলোও খেতে পায়, আমাদেরও দুধ দেয়। কিন্তু এখন তো দেখছি চারদিকে খরা আর খরা। চলো, ফিরে যাই।" পুরো দলকেই সহমত জানাতে দেখা গেল। শত্রুর মুখোমুখি না হয়েই গুটি-গুটি পায়ে ফিরে গেল তারা।

এদিকে মুসলিমরা বদরে অবস্থান করে বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক লেনদেন সেরে ফেলেন। কয়েকটি বাণিজ্য কাফেলার কাছে নিজেদের বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করে ভালোই লাভ হয় তাদের। কুরাইশরা যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়ায় মুসলিমদের সামরিক মর্যাদাও

---

[৩৩৬] সূরা হাশর, ৫৯ : ২।

[৩৩৭] বুখারি, ৪০৩১; ইবনু হিশাম, ২/১৯০-১৯২; যাদুল মাআদ, ২/৭১, ১১০।

সমুন্নত থাকে। একই বছরের রবীউল আউয়াল মাসে ‘দূমাতুল জান্দাল’ নামক স্থানে একটি ডাকাতদলের ওপর শাস্তিমূলক অভিযান চালান রাসূল ﷺ। সব জাতের শত্রুকে পরাস্ত করে পুরো এক বছর ধরে শান্তিময় অবস্থা বিরাজ করে মদীনায়। অনুসারীদের ঈমান দৃঢ়করণ ও দ্বীনি শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেন নবি ﷺ।[৩৩৮]

খন্দকের যুদ্ধ (শাওয়াল ও যুল-কা'দা, ৫ম হিজরি)

বানূ নাদীরের নির্বাসন আর বদর থেকে কুরাইশদের ভীরু প্রস্থানের পর প্রায় দেড় বছর কেটে যায় তেমন কোনও ঝামেলা ছাড়াই। মনে হচ্ছিল যেন, পরিষ্কার নীলাকাশের নিচে এখন থেকে নির্বিঘ্নে দ্বীন প্রচার-প্রসারের কাজ চলবে। কিন্তু দৃষ্টিসীমার বাইরে তুফান ঠিকই ফনা তুলছে দূর সাগরে।

নির্বাসিত ইয়াহূদি গোত্রটি খাইবারে বেশ থিতু হয়ে এসেছে। প্রতিশোধের স্বপ্নও দেখতে শুরু করছে আস্তে আস্তে। জনবল বাড়াতে এদিক-ওদিক থেকে খুঁজতে লাগল মুসলিমবিরোধী মিত্র। কিছু ইতিহাসবিদের মতে, খাইবারি ইয়াহূদিদের বিশ জন গোত্রপতি কুরাইশদের সাথে দেখা করে নতুন করে সামরিক অভিযান শুরুর আবেদন করে। তাদের রাজি করার পর বানূ গতফান গোত্রের সম্মতিও আদায় করে নেয় তারা। তৈরি হতে থাকে মিত্রদের একটি বন্ধনী। পরিকল্পনা চলছে সবাই মিলে একযোগে মদীনায় হামলে পড়ার।

• খন্দক বা পরিখা খনন

নতুন এই জোটের খবর মদীনায় পৌঁছালে নবি ﷺ সাহাবিদের কাছে পরামর্শ চান। শত্রুসংখ্যা এবার একদম ধরাছোঁয়ার বাইরে। এখন তাই নিশ্ছিদ্র-নিরাপত্তা-পরিকল্পনা প্রয়োজন। সালমান ফারসি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বুদ্ধি দেন পরিখা খনন করার। তাহলেই শত্রুদের দূরে রাখা সম্ভব। বাকি সবাই সম্মতি দেন। পরিখার আরবি সমার্থক শব্দ অনুযায়ী আসন্ন যুদ্ধটি পরিচিত হয় ‘খন্দকের যুদ্ধ’ নামে।

মদীনার তিনদিকে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। আগ্নেয় সমভূমি আর পাথুরে পাহাড় মদীনাকে নিরাপত্তা দিয়েছে পূর্ব, পশ্চিম আর দক্ষিণ দিক থেকে। উত্তর দিক থেকেই কেবল শত্রু-আক্রমণ আসা সম্ভব। তাই এ দিকটাতেই মনোযোগ দিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে সবচেয়ে সরু অংশটির প্রশস্ততা প্রায় এক মাইল। ঠিক এই জায়গাতেই উভয় দিককে সংযুক্ত করা হয় পরিখার মাধ্যমে। পশ্চিমে

[৩৩৮] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ২/২০৯-২১০; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ২/১১২।

সাল'আ পাহাড়ের উত্তর দিক থেকে শুরু হয়ে পরিখাটি পূর্বদিকে শাইখাইনে এসে শেষ হয়।

দশজন দশজন করে দল ভাগ করে দেন নবিজি ﷺ। চল্লিশ হাত করে মাটি খোঁড়ার দায়িত্ব পড়ে প্রতিটি দলের। খনন ও মাটি বহনের কাজে রাসূল ﷺ নিজেও যোগ দেন। কাজের পরিমাণ বিশাল, মুসলিমরা বিরতিহীনভাবে কাজ চালিয়ে যান। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য তাদের মনোবলের উৎস। মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করতেন সাহাবিরা, আর তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও যোগদান করেন।[৩৩৯] হাড়কাঁপানো শীত আর তীব্র ক্ষুধার কষ্ট সয়েই কাজ চলতে থাকে। সামান্য কিছু যব সংগ্রহ করে পুরোনো ও দুর্গন্ধযুক্ত চর্বিতে রান্না করা হয়। খাবার গেলাটাই আরেকটি কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবুও তা দিয়েই ক্ষুধার যন্ত্রণা কিছুটা প্রশমন করতেন তাঁরা।[৩৪০]

সাহাবিরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে ক্ষুধার ব্যাপারে অনুযোগ করেন। প্রমাণ হিসেবে দেখান সবার পেটের সাথে বেঁধে রাখা একটি করে পাথর। খালি পেটের অসহ্যতা এতে একটু কমে আসে। নবি ﷺ উত্তরে নিজের পোশাক তুলে দেখান। তখন তাঁর পেটে বাঁধা ছিল এ-রকম দুটি পাথর।[৩৪১]

মুশরিকরা অলৌকিক ঘটনা দেখতে লম্ফঝম্ফ করছিল। আল্লাহ তাদের আবদার পূরণ করে বেশ কিছু মু'জিযা দেখালেও তাদের মন ভরেনি। এদিকে পরিখা খননের কাজ চলার সময়েও আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের প্রতি দয়াস্বরূপ কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করেন। মুসলিমদের ঈমান এতে দৃঢ়তর হয়। প্রতিকূলতা সামাল দেওয়ার শক্তি পান সবাই।

একবার নবিজি ﷺ-এর ক্ষুধার কষ্ট দেখে জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) অস্থির হয়ে পড়েন। বকরির একটি বাচ্চা যবাই করেন তিনি। তার স্ত্রী এক সা' অর্থাৎ প্রায় আড়াই কেজির মতো যব পিষে নেন। তারপর জাবির (রদিয়াল্লাহু আনহু) এসে নবি ﷺ ও অল্প কয়েকজন সাহাবিকে নিমন্ত্রণ জানান। নবিজি তো দাওয়াত কবুল করলেনই, সেই সাথে এক হাজার সাহাবির সবাইকে নিয়ে হাজির হলেন জাবিরের ঘরে! এই অবস্থা দেখে জাবির ও তাঁর স্ত্রী তো পেরেশান ও অস্থির। কিন্তু না; রাসূল ﷺ-এর বরকতে সবাই পেটভরে খাওয়ার পরও রুটির সংখ্যা আর গোশতের পরিমাণ

---

[৩৩৯] বুখারি, ২৮৩৭।
[৩৪০] বুখারি, ৪১।
[৩৪১] তিরমিযি, ২৩৭১।

একই রয়ে যায়।[৩৪২]

আরেকবার নু'মান ইবনু বাশীর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বোন তার বাবা ও মামার জন্য হাতের মুঠোয় সামান্য কিছু খেজুর নিয়ে আসেন। নবি ﷺ খেজুরগুলো নিয়ে একটি কাপড়ে ছড়িয়ে দেন। তারপর তাঁর ডাক শুনে একে একে খেতে আসেন খননকাজে ব্যস্ত সাহাবিরা। সবাই খেয়ে শেষ করার পরও খেজুরের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। এমনকি ওই কাপড়েই আর জায়গা হচ্ছিল না সেগুলোর।[৩৪৩]

সেখানকার মাটি এমনিতেই পাথুরে ও শক্ত। জাবির (রদিয়াল্লাহু আনহু) ও তার দল এমন এক পাথুরে জায়গায় খুঁড়ছিলেন, যা অনেক চেষ্টার পরও ভাঙছিল না। নবি ﷺ-কে জানানো হলো সমস্যাটির ব্যাপারে। নবি ﷺ এসে কোদাল দিয়ে আঘাত করতেই তা ঝুরঝুর করে ভেঙে বালুর স্তূপে পরিণত হয়।[৩৪৪]

এমনিভাবে বারা (রদিয়াল্লাহু আনহু) ও তার দলের কাজ একটি বড় পাথরে এসে আটকে যায়। নবি ﷺ এসে হাঁটু গেড়ে বসেন। শাবলের খোঁচা দেওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলে নেন। পাথরটি থেকে আলোর একটি ঝলক বেরিয়ে একটু আলগা হয়ে আসে তা। রাসূল ﷺ বলে ওঠেন, "আল্লাহু আকবার! আমাকে শামের (বৃহত্তর সিরিয়া) চাবি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানকার লাল প্রাসাদ একদম চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।"

শাবলের দ্বিতীয় আঘাত করার সাথে সাথে সুসংবাদ পান পারস্য বিজয়ের। শেষ আঘাতে জানা যায় ইয়েমেন বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী। এভাবে পরপর তিনটি আঘাতে পাথরটি ভেঙে যায়।[৩৪৫]

পরিখার ওপারে

মুসলিমরা যখন প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নির্মাণে ব্যস্ত, কুরাইশ ও তাদের মিত্ররা তখন জড়ো হয়েছে চার হাজার সৈনিক, তিন শ ঘোড়া, আর এক হাজার উটের রমরমা জৌলুশপূর্ণ এক বাহিনী নিয়ে। জোটের গর্বিত সেনাপতি আবূ সুফ্ইয়ান আর পতাকাবাহী উসমান ইবনু তালহা আবদারি। জুরফ ও যাগাবার মাঝামাঝি একটি এলাকায় শিবির স্থাপন করে তারা। ওদিকে গতফান গোত্র ও তাদের ছয় হাজার নাজদি অনুসারী তাঁবু গেড়েছে উহুদ পর্বতের পাদদেশে 'নাকামা' উপত্যকার শেষ প্রান্তে। মদীনার এত কাছে বিশাল

[৩৪২] বুখারি, ৪১০১।

[৩৪৩] ইবনু হিশাম, ২/২১৮।

[৩৪৪] বুখারি, ৪১১০।

[৩৪৫] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/৩০৩, নাসাঈ, ৩১৭৮।

দুই শত্রুবাহিনীর উপস্থিতি মারাত্মক এক হুমকি নিয়ে আসে মুসলিমদের প্রতি। প্রকাণ্ড এই সামরিক জোটের ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে বলেন,

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

“সেদিন তারা ওপর ও নিচ থেকে তোমাদের দিকে ধেয়ে এসেছিল। তোমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়ে হৃৎপিণ্ড যেন চলে এসেছিল গলার কাছে। এমনকি আল্লাহর পরিকল্পনার ব্যাপারে সন্দেহও পোষণ করতে শুরু করেছিলে। অথচ এটি ছিল মুমিনদের জন্য পরীক্ষা, বিরাট এক প্রকম্পনের আকারে।”[৩৪৬]

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

“জোটবদ্ধ বাহিনীকে দেখে মুমিনরা বলেছে, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তো এটিরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন! আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন।’ এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ বৃদ্ধিই পেয়েছে কেবল।”[৩৪৭]

কিন্তু মুনাফিকদের অবস্থা ছিল ভূত দেখার মতো। তারা বলেছিল,

مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾

“আল্লাহ আর তাঁর রাসূল আমাদের প্রতিশ্রুতির নামে স্রেফ প্রতারণা দিয়েছেন!”[৩৪৮]

আরও একবার রাসূল ﷺ মদীনার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক বানালেন আবদুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূম (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে। দুর্গে আশ্রয় নিতে নির্দেশ দিলেন নারী-শিশুদের। তারপর যুদ্ধের ময়দান অভিমুখে রওনা হন তিন হাজার সেনা নিয়ে। মুসলিম সেনাদল সাল'আ পর্বতকে পেছনে এবং পরিখা সামনে রেখে অবস্থান নেন। পরিখার ওপারে থাকে কাফির সেনাদল।

---

[৩৪৬] সূরা আহযাব, ৩৩ : ১০-১১।
[৩৪৭] সূরা আহযাব, ৩৩ : ২২।
[৩৪৮] সূরা আহযাব, ৩৩ : ১২।

দম্ভভরে এগিয়ে আসতে থাকা মুশরিক বাহিনী হঠাৎই দেখতে পায় পরিখাটি। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে থেমে গিয়ে আবূ সুফ্ইয়ান সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "এটি সম্পূর্ণ নতুন একটি কৌশল, যা আরবরা জানেই না।" অপ্রত্যাশিত বাধায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে মুশরিকরা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে পরিখার দুর্বল দিক খুঁজতে থাকে। কিন্তু মুসলিম তিরন্দাজদের মুহুর্মুহু আক্রমণে তারা না পারল লাফিয়ে খন্দক পার হতে, আর না পারল সেটা মাটি দিয়ে ভরাট করতে।

মদীনা অবরোধ করা ছাড়া তাই কাফির জোটের হাতে আর কোনও বিকল্প রইল না। প্রতিদিন সকালে তারা এসে পরিখা পার হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু ফিরে যায় তির আর পাথরবর্ষণের 'সাদর সম্ভাষণ' পেয়ে। কার্যকর একটি পরিকল্পনা খুঁজতে খুঁজতেই কেটে যায় দিনের পর দিন। মুসলিমরাও শত্রুদের হাল ছাড়ানোর জন্য তক্কেতক্কে সীমানা পাহারা দিতে থাকেন। ফলে কিছু সালাতের ওয়াক্তও ছুটে যায়। সূর্যাস্তের পর সেগুলো কাযা করে নেন নবি ﷺ ও সাহাবিগণ।[৩৪৯]

তখনো ভীতিকালীন সালাত (সালাতুল খওফ) এর বিধান নাযিল হয়নি।

অবশেষে একদিন মুশরিক অশ্বারোহী বাহিনীর একটি ছোট অংশ পরিখার একটি সংকীর্ণ অংশ লাফিয়ে পার হয়ে আসে। এর সদস্য ছিল আমর ইবনু আবদি ওয়াদ্দ, ইকরিমা ইবনু আবী জাহল, দারার ইবনুল খাত্তাবসহ আরও কয়েকজন। কয়েকজন মুসলিমকে সাথে নিয়ে আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) দ্রুতবেগে ধেয়ে এসে তাদের ফেরত যাওয়ার পথটি অবরোধ করে ধরেন। নিষ্ঠুর ও ভয়ানক যোদ্ধা আমর ইবনু আবদি ওয়াদ্দ মুখোমুখি যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানায় আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে। আলি তাকে উত্ত্যক্ত করে আরও রাগিয়ে তোলেন। দু'জনে বেধে যায় প্রবল যুদ্ধ। শেষমেশ আমরকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে ফেলেন আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

বাকি মুশরিকরা নিজ নিজ ঘোড়া নিয়ে পালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাড়াহুড়ার চোটে ইকরিমা ফেলে যান তার বল্লম, আর নাওফাল ইবনু আবদিল্লাহ পড়ে যায় একেবারে পরিখার ভেতর। মুসলিমরা সেখানেই তাকে হত্যা করেন। এই দাঙ্গায় শহীদ হন ছয় জন মুসলিম। মুশরিকদের মধ্য থেকে নিহত হয় দশ জন।

একটি তিরের আঘাতে সা'দ ইবনু মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে যায়। তারপরও অলৌকিকভাবে বেঁচে যান তিনি। আল্লাহর কাছে সা'দ দুআ করেছিলেন, কুরাইশদের বিরুদ্ধে এখনও যদি কোনও যুদ্ধ বাকি থাকে তাহলে যেন

---

[৩৪৯] বুখারি, ৫৯৬।

তাঁকে জীবিত রাখেন। নতুবা এই যখমই যেন তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আরও বলেছিলেন, আমারকে ওই পর্যন্ত মৃত্যু দিয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত বানূ কুরাইযার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতলকারী কোনও সিদ্ধান্ত না হয়।[৩৫০]

• বানূ কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা

উহুদ যুদ্ধের পর থেকে ইয়াহূদি গোত্র বানূ কুরাইযা নবি ﷺ-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে তারা এক মারাত্মক বেঈমানি করে বসে। বানূ নাদীরের গোত্রপতি হুয়াই ইবনু আখতাব দেখা করতে আসে কুরাইযা-পতি কা'ব ইবনু আসাদের সাথে। যথেষ্ট দোটানায় থাকার পর পর কা'ব অবশেষে হুয়াইয়ের কথামতো চুক্তি ভাঙতে রাজি হয়। পক্ষ নেয় কুরাইশ জোটের।

মদীনার দক্ষিণ দিকে বানূ কুরাইযার শক্ত ঘাঁটি। আর ওদিকটাতেই রসদসহ রেখে আসা হয়েছিল মুসলিম নারী-শিশুদের। পুরুষরা বেশির ভাগ ব্যস্ত ছিলেন উত্তরদিকে যুদ্ধের ময়দানে। বানূ কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুসলিম নারী-শিশুদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে দুই শ জনের একটি বাহিনী নিয়ে ছুটে আসেন মাসলামা ইবনু আসলাম (রদিয়াল্লাহু আনহু)। যাইদ ইবনু হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে আরও তিন শ জন এসে যোগ দেন তাদের সাথে। তা ছাড়া সা'দ ইবনু মুআয ও সা'দ ইবনু উবাদা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কেও পাঠানো হয় পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে।

নবিজির দূতেরা এসে দেখলেন যে, ইয়াহূদিরা সত্যি সত্যিই খোলাখুলি শত্রুতা শুরু করে দিয়েছে। নবি ﷺ-কে অপমান করে বানূ কুরাইযা বলে, "আল্লাহর নবি আবার কে? আমরা মুহাম্মাদের সাথে কোনও চুক্তিতে নেই।" প্রতিনিধিদ্বয় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে মাত্র তিনটি শব্দ বলেন, "আদাল এবং কারা।" রজী'র ঘটনায় আদাল ও কারা গোত্র যে-রকম করেছিল, বানূ কুরাইযাও একইভাবে পিঠে ছুরি বসাচ্ছে।

নতুন এই বিপদ নিয়ে মুসলিমরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। সুযোগ পেয়ে আবারও নখর বের করতে থাকে ঘরের শত্রু মুনাফিকরা। তাদের কেউ কেউ মাতম করল, "মুহাম্মাদ আমাদের কত স্বপ্নই-না দেখাল! এই সিজারের সব সম্পদ পেয়ে যাচ্ছি, ওই খসরুকে হারিয়ে দিচ্ছি! আর এখন এমন অবস্থা যে, নির্ভয়ে প্রস্রাব করতেও যেতে পারছি

---

[৩৫০] বুখারি, ৪১২২।

না।"[৩৫১] কেউ কেউ চাপা আনন্দ নিয়ে মুসলিমদের বলল, "ইয়াসরিবের লোকজন! এবার ঘরে ফিরে যাও। অত বড় শত্রুকে তোমরা জীবনেও ঠেকাতে পারবে না।"

ময়দানে থাকা আরেকদল মুনাফিক এসে নবিজি ﷺ-এর কাছে শহরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চায়। অজুহাত দেয় যে, ওদের ঘরবাড়ি এখন অরক্ষিত। এরই মাঝে এল বানূ কুরাইযার বেঈমানির খবর। নবি ﷺ কাপড় দিয়ে মুখ আর মাথা ঢেকে কিছুক্ষণ নীরবে শুয়ে থাকেন। তারপর উঠে বসে সাহায্য ও বিজয়ের সুসংবাদ শোনান এবং একটি প্রস্তাব দেন।

বানূ গতফান এককালে মদীনার সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। নবিজি ভাবলেন গতফান-পতি উয়াইনা ইবনু হিসনের সাথে পুরোনো সন্ধি নবায়ন করা যায় কি না। মদীনার এক-তৃতীয়াংশ ফল-ফসলের বিনিময়ে গতফানকে নিয়ে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে তাকে। দুই আনসার নেতা সা'দ ইবনু মুআয ও সা'দ ইবনু উবাদা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) এ পরিকল্পনার প্রবল বিরোধিতা করেন। বললেন, "একসময় আমরাও ওদের মতো মুশরিক ছিলাম। তখনো আমাদের কাছ থেকে একটি দানা পাওয়ারও সাহস পায়নি তারা। আর আজ যখন আল্লাহ আমাদের ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর মাধ্যমে সম্মানিত করলেন, তখন কিনা ওদের মুখে নিজেদের জিনিস তুলে দেবো? কক্ষনো না! আল্লাহর কসম! ওরা আমাদের কাছে স্রেফ তলোয়ার পাবে, তলোয়ার!"

নবি ﷺ দেখলেন যে, তাদের কথায় যুক্তি আছে। প্রস্তাব পাঠানোর পরিকল্পনা বাদ দিলেন তিনি।

• কাফিরদের বন্ধুত্বে ফাটল ও যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

দীর্ঘ অবরোধের পর মুখোমুখি যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও সমাধান চোখে পড়ছিল না কারওই। এমন সময় নুআইম ইবনু আশজাঈ (রদিয়াল্লাহু আনহু) এলেন নবি ﷺ-এর কাছে। তিনি গতফান গোত্রের সদস্য। কুরাইশ ও ইয়াহূদি উভয় জাতির সাথে তার সম্পর্ক খুবই ভালো। জানালেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখনও কেউ জানে না। কী করব, আদেশ দিন।" নবি ﷺ ভেবে বললেন, "তুমি একা একজন কত আর করতে পারবে?...আচ্ছা, এক কাজ করো। তুমি ছলে-কলে-কৌশলে ওদের জোটে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করো। মনে রেখো, যুদ্ধ মানেই ছলচাতুরি।"

---

[৩৫১] সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ৩৫৬/৫, তাবারি, তাফসীর, ১১/১৬১। ৩৩ : ১০ আয়াতের তাফসীর।

যেই কথা, সেই কাজ। নুআইম গেলেন বানূ কুরাইযায়। তাকে সাদরে বরণ করে নেওয়া হলো। তিনি বললেন, "আচ্ছা, আমাকে তো আপনারা ভালো করেই চেনেন। এখন যে কথাটা বলব, সেটা কিন্তু একদম গোপন রাখতে হবে, বুঝেছেন?" আগ্রহ পেয়ে ইয়াহূদিরা সম্মতি জানাল। নুআইম বললেন,

"বানূ কাইনুকা' আর বানূ নাদীরের সাথে কী ঘটেছে, তা তো স্বচক্ষেই দেখলেন। এখন আবার জোট বাঁধলেন গিয়ে কুরাইশ আর গতফানের সাথে। ওদের অবস্থা কিন্তু আপনাদের মতো না। এটা আপনাদের নিজেদের দেশ। আপনাদের নারী, শিশু, সহায়-সম্পদ সব এখানে। আর আপনাদের মিত্রদের ঘরবাড়ি-সম্পদ এখান থেকে একদম নিরাপদ দূরত্বে। কয়েকদিন থেকে এরা যদি কিছু করার সুযোগ না পায়, তাহলে তো ফিরে যাবে নিজ নিজ বাড়ি। আর আপনারা হয়ে পড়বেন মুহাম্মাদের সামনে অসহায়, একা। উনি চাইলে দয়া করবে, চাইলে যেভাবে ইচ্ছা আপনাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।"

এই কথা শুনে তারা ভয় পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে এখন আমাদের করণীয় কী? নুআইম (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনাদের নিকট সন্ধির নিরাপত্তার জন্য তাদের লোকজনকে না পাঠাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা তাদের সাথে মিলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না।' এ কথা শুনে তারা বলল, 'আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।'

এরপর নুআইম (রদিয়াল্লাহু আনহু) গেলেন কুরাইশদের নিকট। সব গোত্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, "আমি যে আপনাদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, এটা নিয়ে কি আপনাদের কারও কোনও সন্দেহ আছে?"

সবাই সমস্বরে বলল, "একদমই না।"

"তাহলে আমি আপনাদের একটা গোপন কথা বলতে চাই। তবে শর্ত হলো আমার পক্ষ তা থেকে গোপন রাখতে হবে!"

তারা জবাব দিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই।"

"ইয়াহূদিরা নিজেদের চুক্তিভঙ্গের কারণে তারা এখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত। ওরা ভয় পাচ্ছে যে, আপনারা ফিরে গেলে ওরা তো মুহাম্মাদের করুণার পাত্র হয়ে যাবে। এখন মুহাম্মাদকে খুশি করতে তারা প্রস্তাব দিয়েছে যে, আপনাদের জিম্মি হিসেবে উনার হাতে তুলে দেবে। সাবধান থাকবেন। আপনাদের কাউকে ডাকলে ভুলেও সেদিকে পা বাড়াবেন না।"

এরপর বানূ গতফানকেও আঘাত করলেন একই সন্দেহের অস্ত্র দিয়ে। তিন পক্ষের মাঝে এখন অবিশ্বাসের ঘোর অমানিশা। আবূ সুফ্ইয়ান বানূ কুরাইযার কাছে বার্তা পাঠালেন যে, পরদিন সম্মিলিতভাবে মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু জবাবে পেলেন শীতল প্রতিক্রিয়া। ইয়াহূদিরা জানাল, "দেখুন, প্রথমত কাল শনিবার। এদিন আমরা কোনও মারপিট করতে পারব না। এই দিন শারীআতের নিয়ম ভেঙে আগেও আমরা মহা মুসীবতে পড়েছি। আর না। দ্বিতীয়ত, আপনাদের কয়েকজন লোককে আমাদের কাছে জিম্মি হিসেবে রাখতে হবে। নাহলে আপনারা যদি আমাদের ফেলে নিজেদের বাসাবাড়িতে ফিরে যান, তখন সব বিপদ হবে আমাদের।"

এ কথা শুনে কুরাইশ আর গতফান ভাবল, "এ কী! নুআইম দেখি ঠিকই বলেছিল!" কুরাইশরা জিম্মি পাঠাতে অস্বীকৃতি জানাল, আবার যুদ্ধ করার জন্যও জোরাজুরি করতে লাগল। বানূ কুরাইযা তা দেখে ভাবল, "আরে! নুআইমের কথাই তো ঠিক!" এরপরই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় কুরাইশ- কুরাইযা আর গতফান মহাজোট।

আর মুসলিমরা তখন সময় কাটাচ্ছেন আল্লাহর কাছে বিপদমুক্তির দুআ করে,

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا

"হে আল্লাহ, আশ্রয় দিন, রক্ষা করুন সব বিপদ থেকে।"[৩৫২]

নবি ﷺ রবের কাছে দুআ করলেন,

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

"হে আল্লাহ, কিতাব অবতীর্ণকারী! দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! শত্রুদের নির্মূল করে দিন। হে আল্লাহ, তাদের পরাজিত করুন এবং তাদের মারাত্মক বিপদে ফেলুন।"[৩৫৩]

মুসলিমদের দুআর জবাবে আল্লাহ তাআলা শত্রুদের ওপর এক ভয়ংকর তুফান প্রেরণ করলেন। সাথে এলেন ফেরেশতাদের সেনাবাহিনীও। কাফিরদের মালপত্র উপুড় হয়ে গেল, উপড়ে গেল তাঁবুর সব খুঁটি। সারা শিবির জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল তাদের সব জিনিসপাতি। হাড়কাঁপানো শীতে তাদের মনোবলও নড়বড়ে হয়ে এল। হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে আর সাহস হারিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিল ফিরে যাওয়ার।

---

[৩৫২] আহমাদ, ৩/৩।

[৩৫৩] বুখারি, ২৯৩৩।

নবি ﷺ সে রাতে হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাঠান শত্রুদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে। রাতের আঁধার এবং ঝড়ো আবহাওয়ার মাঝে শত্রুসারির একদম ভেতরে প্রবেশ করে আবার নিরাপদে ফিরে আসেন হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। আল্লাহর বিশেষ ইচ্ছেয় ঝড় ও শৈত্য তাকে স্পর্শও করেনি। তিনি এসে শত্রুদের ফিরে যাওয়ার খবর দেন এবং ভাবনাহীন স্বস্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন।[৩৫৪]

এই খবর পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন মুসলিমরা। পরদিন সকালে ঠিকই দেখা যায় যে, যুদ্ধের ময়দান ফাঁকা পড়ে আছে।

> শত্রুরা জড়ো হয়েছিল পঞ্চম হিজরি সনের শাওয়াল মাসে। পুরো এক মাস জুড়ে মুসলিমরা সব দিক থেকে বিরাট আক্রমণের হুমকি আর আতঙ্কের মাঝে ছিল। শত্রুজোট অবশেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যুল-কা'দা মাসে। মদীনার বিরুদ্ধে এটা ছিল তাদের বৃহত্তম প্রচেষ্টা। সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে তারা চেয়েছিল এ যাত্রায় মুসলিমদের নিঃশেষ করে দিয়ে যেতে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেন। ফলে কুরাইশ আর বানূ গতফানের মতো প্রতাপশালীদের পরাজয় দেখে দুর্বলতর শত্রুগোত্ররা শিক্ষা নেয়। তারা আর কখনও মদীনার দিকে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস করেনি। মদীনা এখন থেকে চির-নিরাপদ। নবি ﷺ ঘোষণা দেন, "এতদিন তারা আক্রমণ করেছে, আমরা ঠেকিয়েছি। এখন থেকে আমরাই আক্রমণে যাব।"[৩৫৫]

বানূ কুরাইযার যুদ্ধ (যুল-কা'দা, ৫ম হিজরি)

খন্দকের যুদ্ধ সমাপ্ত। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিশ্রম ও উত্তেজনার ক্লান্তি নিয়ে সবাই ফিরছে নিজ নিজ ঘরে। এখন প্রয়োজন একটু শান্তির বিশ্রাম। নবি ﷺ উম্মু সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কামরায় এসে অস্ত্র-হাতিয়ার-পোশাক রেখে মাত্র গোসল শেষ করেছেন। এমন সময় জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে জানালেন যে, তাঁকেসহ আরও অন্যান্য ফেরেশতাকে পাঠানো হয়েছে বানূ কুরাইযার দুর্গ তছনছ করে দেওয়ার জন্য। আর সেখানে নবিজি ও সাহাবিরা কিনা অস্ত্র রেখে দৈনন্দিন কাজে ফিরে যাচ্ছেন![৩৫৬]

---

[৩৫৪] মুসলিম, ১৭৮৮।
[৩৫৫] বুখারি, ৪১১০; ইবনু হিশাম, ২/২৩৩-২৭৩; যাদুল মাআদ, ২/৭২-৭৪।
[৩৫৬] বুখারি, ২৮১৩।

সাথে সাথে নবি ﷺ ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, বানূ কুরাইযার এলাকায় না পৌঁছে কেউ যেন আসর না পড়ে।[৩৫৭]

গোসল ও বিশ্রামের মাধ্যমে নয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে এখন এক মু'জিযা দেখেই কেবল প্রশান্তি লাভ করবে মুমিনহৃদয়। ইবনু উম্মি মাকতূম (রদিয়াল্লাহু আনহু) মদীনার দেখাশোনার দায়িত্ব পেলেন। আর আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে পাঠিয়ে দেওয়া হলো একটি অগ্রগামী সেনাদল।

ওদিকে দূর থেকে ধাবমান মুসলিম সেনাদের দেখতে পায় বানূ কুরাইযা। দেখেই তারা নবিজি ﷺ-এর নামে গালিগালাজ শুরু করে। সেনাদলের বাকি অংশও দ্রুত চলতে শুরু করেন অগ্রগামী দলটির সাথে যোগ দিতে। তবে পথিমধ্যে আসরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ায় এক জায়গায় থেমে আবার যাত্রা শুরু করেন। সেখানে কিছু সাহাবি আসরের সালাত আদায় করে নেন। আর বাকিরা বানূ কুরাইযায় যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। মুহাজির ও আনসারদের নিয়ে রাসূল ﷺ নিজেও রওনা হন। বানূ কুরাইযার বিখ্যাত কুয়া 'আনা'র কাছে এসে থামেন তিনি।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মুসলিমরা আসার আগেই আল্লাহ তাআলা বানূ কুরাইযার অন্তরে প্রচণ্ড ভয়ের সঞ্চার করে দেন। সম্মুখসমরে না এসে তারা দুর্গে ঢুকে বসে থাকে। দুর্গ ঘিরে অবরোধ বসান সাহাবিরা। ইয়াহূদিরা নবিজির কাছে খবর পাঠায় যে, তারা আবূ লুবাবা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে কথা বলতে চায়। প্রতিনিধি হিসেবে তাকেই পাঠানো হয়। আবূ লুবাবাকে আসতে দেখেই দৌড়ে আসে বানূ কুরাইযার পুরুষরা। আর নারী-শিশুরা কান্না শুরু করে হাউমাউ করে। তাদের অশ্রু আর মাতমে আবূ লুবাবার মনে করুণার উদ্রেক হয়।

ইয়াহূদিরা তার নিকট পরামর্শ চাইল "কী বলেন? আমরা কি মুহাম্মাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলব?" আবূ লুবাবা বললেন, "হ্যাঁ।" কিন্তু তারপর গলার ওপর আঙুল চালিয়ে ইঙ্গিত দিলেন যে, তাদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এরপর সাথে সাথেই তাঁর মনে হলো যে, আগেভাগে তথ্য দিয়ে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করে ফেলেছেন। সেখান থেকে উঠে তিনি দ্রুতপায়ে ফিরে আসেন মাসজিদে নববিতে। নিজেকে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে কসম করেন যে, নবি ﷺ এসে বাঁধন খুলে দেওয়ার আগে তিনি এক পাও নড়বেন না।

নবি বিষয়টি জানতে পারার পর বলেন, "সে আমার কাছে এলে আমি আল্লাহর নিকট

[৩৫৭] বুখারি, ৯৪৬।

তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। এখন যেহেতু সে নিজের সিদ্ধান্তে এমনটা করেছে, আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত আসার আগ পর্যন্ত আমি নিজ থেকে কিছু করছি না।"[৩৫৮]

চলতে থাকে দীর্ঘ অবরোধ। সেই সাথে দুর্বল হতে থাকে বানূ কুরাইযার মানসিকতা। অবশেষে পঁচিশ দিন পর তারা আত্মসমর্পণ করে। পুরুষদের বন্দি করে নারী ও শিশুদের আলাদা জায়গায় রাখেন নবি ﷺ। আওস গোত্র এসে অনুনয় করে, যেন বানূ কাইনুকা'র মতো এদেরও দয়া করা হয়। আওস এবং বানূ কুরাইযা এককালের মিত্র।

নবিজি ﷺ প্রজ্ঞা খাটিয়ে নিজেকে একমাত্র বিচারকের আসন থেকে সরিয়ে আনেন। আওস গোত্রকে বলেন, "তাহলে তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট যে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের গোত্রেরই একজন সিদ্ধান্ত দেবেন?" সবাই তাতে রাজি। তাদের সম্মতিক্রমেই তাদের গোত্রপতি সা'দ ইবনু মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেন আল্লাহর রাসূল ﷺ।

খন্দকের যুদ্ধের সময় পাওয়া সেই আঘাতের কারণে সা'দ তখন মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন। মুসলিম শিবির থেকে ডাক পাওয়ামাত্র তিনি দ্রুতগতিতে বাহনে সওয়ার হয়ে চলে আসেন নবিজির কাছে। নবি ﷺ সবাইকে বলেন, "তোমাদের গোত্রপতির দিকে উঠে যাও! ওকে সাহায্য করো।" সাহাবিরা উঠে গিয়ে সা'দকে এগিয়ে নিয়ে আসেন। তার চারপাশে বাজছে সবার কণ্ঠ, "সা'দ, পুরোনো মিত্রদের একটু দয়া করবেন।" প্রথমে কোনও জবাব দিলেন না তিনি। চাপাচাপি বেড়ে গেলে বললেন, "সা'দের এখন সময় এসেছে—আল্লাহর ব্যাপারে তিরস্কারকারীদের তিরস্কারের পরোয়া না করার।"

সা'দের এই কথার অর্থ বাকিদের অনুরোধের সরাসরি প্রত্যাখ্যান। সকলেই বুঝল যে, এখন আর কোনও কোমলতা প্রত্যাশা করা ভুল। কেউ কেউ মদীনায় ফিরে গিয়ে ঘোষণা করল বন্দিদের মৃত্যুদণ্ডের কথা।

বাহন থেকে নেমে এলেন সা'দ। তাকে জানানো হলো যে, তার দেওয়া যেকোনও রায় মেনে নেওয়ার কথা দিয়েছে ইয়াহূদিরা। এরপর সা'দ উচ্চারণ করলেন তার রায়—পুরুষদের হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদের বন্দি করা হবে, আর তাদের সব সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়া হবে মুসলিমদের মাঝে।

রায়টি শুনে নবি ﷺ বলেন, "তুমি যে রায় দিয়েছ, সপ্ত আসমানের ওপরে আল্লাহ

---

[৩৫৮] ইবনু কাসীর, তাফসীর, ২/৩৩২, সূরা আনফালের ২৭ নং আয়াতের তাফসীর।

তাআলার ফায়সালাও এটিই ছিল।"[৩৫৯]

ইয়াহূদিদের আইন অনুযায়ীও এ রায় ছিল যথার্থ; বরং ইয়াহূদিদের আইনের চেয়ে এটি ছিল যথেষ্ট শিথিল।

সা'দ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সিদ্ধান্তের পর বানূ কুরাইযাকে মদীনায় নিয়ে একটি ঘরে এনে বন্দি করা হয়। ঘরটি ছিল বানূ নাজ্জার গোত্রের হারিসের মেয়ের। গর্ত খোঁড়া হয় মদীনার বাজারে। ছোট ছোট দলে বন্দিদের ধরে এনে এই গর্তগুলোতে শিরশ্ছেদ করা হয়। সেদিন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মোট সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে, কেউ বলেছেন, চার শ। কেউ বলেছেন ছয় শ। আর কেউ বলেছেন আট শ থেকে নয় শ এর মাঝামাঝি। সাথে একজন নারীও মৃত্যুদণ্ড পায়। কারণ, তার ছোড়া একটি জাঁতার আঘাতে খাল্লাদ ইবনু সুওয়াইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হয়েছিলেন।

বানূ নাদীরের নেতা হুয়াই ইবনু আখতাবকেও হত্যা করা হয় তাদের সাথে। কুরাইশ ও বানূ গতফানের মাঝে মৈত্রী তৈরি করা বিশ ইয়াহূদি গোত্রপতির একজন সে। তার ইন্ধনেই বানূ কুরাইযা মুসলিমদের সাথে চুক্তি ভেঙেছিল। ভবিষ্যতে বানূ কুরাইযার সুখে-দুঃখে পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছিল সে নিজেই। অবরোধ ও আত্মসমর্পণের সময়ও সে বানূ কুরাইযার সাথেই অবস্থান করছিল। ফলে সে তাদের সাথে মৃত্যুদণ্ডও পেল।

বানূ কুরাইযার কয়েকজন সদস্য আত্মসমর্পণের আগেই ইসলাম গ্রহণ করায় শাস্তি থেকে বেঁচে যান। গনীমাতের মাল হিসেবে মুসলিমদের হস্তগত হয় ১৫০০ তরবারি, ৩০০ বর্ম, ২০০০ বল্লম, ৫০০ ঢাল এবং বিপুল পরিমাণ পণ্য, পাত্র ও গবাদি পশু। প্রাপ্ত খেজুর বাগান ও বন্দিদের এক-পঞ্চমাংশ নিজের জন্য রেখে বাকিটুকু মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেন নবি ﷺ। পদাতিক সৈন্যরা পান এক ভাগ, আর অশ্বারোহীরা তিন ভাগ। এক ভাগ সৈনিকের, দুই ভাগ ঘোড়ার।

বন্দিদের নাজদে বিক্রি করে এর বিনিময়ে অস্ত্র ক্রয় করা হয়। তবে রাইহানা বিনতু যাইদ ইবনি আমরকে রাসূল ﷺ নিজের ভাগে রেখে দেন। বলা হয়ে থাকে যে, পরে তিনি তাকে মুক্ত করে দেন অতঃপর বিবাহ করেন। বিদায় হাজ্জের পর রাইহানা মারা যান।[৩৬০]

বানূ কুরাইযার সাথে এসপার-ওসপার শেষে আল্লাহ তাআলার নেক বান্দা সা'দ ইবনু

[৩৫৯] বুখারি, ৪১২১।

[৩৬০] ইবনু হিশাম, ২৪৫; ইবনুল জাওযি, তালকীহ, ১২।

মু'আযের দুআ কবুল হয়। খন্দকের যুদ্ধের পুরোনো সেই আঘাত এখন ক্রিয়া করতে শুরু করে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে এনে রাখা হয় মাসজিদে নববির একটি তাঁবুতে। নবি ﷺ সেখানে তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতেন। একদিন একটি ছাগী লাফিয়ে উঠতে গিয়ে সা'দের সাথে ধাক্কা খায়, ফলে তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত শুরু হয়। সেখান থেকেই পরে তার মৃত্যু হয়।[৩৬১]

বলা হয়ে থাকে যে, মুসলমানদের সাথে ফেরেশতারাও সা'দের লাশ বহন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আল্লাহ্ তাআলার আরশও কেঁপে উঠেছিল।[৩৬২]

ওদিকে মাসজিদে নববির খুঁটির সাথে বাঁধা অবস্থায় ছয় রাত কেটে যায় আবূ লুবাবা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর। সালাতের ওয়াক্তে তার স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিতেন। সালাত শেষে নিজেকে আবার বেঁধে ফেলতেন তিনি। তারপর আল্লাহ্ একটি আয়াত নাযিল করে আবূ লুবাবার জন্য ক্ষমার ঘোষণা দেন। ওহিটি পাওয়ার সময় নবি ﷺ ছিলেন উম্মু সালামার কামরায়। সাহাবিরা ছুটে এসে আবূ লুবাবাকে সুসংবাদটি জানান। সকলে বাঁধন খুলতে উদ্যত হলে আবূ লুবাবা বাধা দেন। বলেন যে, নবি ﷺ স্বয়ং এসে বাঁধন না খুললে মানবেন না তিনি। ফজর সালাত পড়তে এসে নিজ হাতে তার বাঁধন খুলে দেন নবিজি ﷺ।[৩৬৩]

বানূ কুরাইযার যুদ্ধে জয়ের পর বেশ সবল হয়ে ওঠে মদীনার নিরাপত্তা। নবি ﷺ পরপর আরও কয়েকটি অভিযানের মাধ্যমে একে সবলতর করেন। এর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সামরিক অভিযান এখানে আলোচিত হলো।

• আবূ রাফি'র হত্যাকাণ্ড (যুল-হিজ্জাহ, ৫ম হিজরি)

আবূ রাফি' এক ধনাঢ্য ইয়াহূদি ব্যবসায়ী। বাড়ি হিজাযে, থাকে খাইবারে। খন্দকের ওই জোটবাহিনী গঠনে তার বেশ অবদান ছিল। এখন জোটবাহিনীও পরাজিত, বানূ কুরাইযাও খতম। কিন্তু আবূ রাফি'কে জীবিত রাখা মানে ভবিষ্যতে এ-রকম আরও হুমকির সম্ভাবনা জিইয়ে রাখা। এর আগে আওস গোত্রের সদস্যরা কা'ব ইবনু আশরাফকে কতল করেছে। সমমানের আরেক হুমকি আবূ রাফি'কে হত্যা করার মর্যাদাটি তাই পেতে চাইল খাযরাজ। নবিজি ﷺ-এর অনুমতিক্রমে পঞ্চম হিজরি সনের যুল-হিজ্জাহ মাসে আবূ রাফি'র হত্যা অভিযানে বের হন পাঁচ খাযরাজি পুরুষ।

---

[৩৬১] বুখারি, ৪১২২।

[৩৬২] মুসলিম, ২৪৬৬; তিরমিযি, ৩৮৪৮, ৩৮৪৯।

[৩৬৩] ইবনু হিশাম, ২/২৩৩, ২৭৩; যাদুল মাআদ, ২/৭২।

আবূ রাফি'র দুর্গ খাইবারের সীমানায়। আবদুল্লাহ ইবনু আতীক (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে খাযরাজের ওই মুজাহিদরা সেখানে এসে পৌঁছান সূর্যাস্তের সময়। সাথিদের অপেক্ষা করতে বলে আবদুল্লাহ ইবনু আতীক দুর্গের ফটকের কাছে যান। সেখানে এত স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে থাকেন, যেন তিনি দুর্গবাসীদেরই একজন। এক প্রহরী দেখে ডাক দিল, "এই যে আল্লাহর বান্দা, ভেতরে চলে এসো। একটু পরই ফটক বন্ধ করে দেবো।"

এটাই তো চাইছিলেন আবদুল্লাহ। চট করে ভেতরে এসে লুকিয়ে ফেললেন নিজেকে। সে রাতে চাবির গোছাটা চুরি করে নিয়ে ফটক খুলে রাখলেন তিনি, যাতে পালানোর সময় সুবিধা হয়। এরপর এগিয়ে যেতে থাকেন আবূ রাফি'র কামরার দিকে। একেকটি কক্ষ পার হন আর দরজা ভেতর থেকে লাগিয়ে দেন। যাতে কেউ বাইরে থেকে আসতে না পারে। ভেতরের অন্ধকার আর দুর্গবাসীদের ঘুমের কারণে বোঝাই যাচ্ছিল না যে, আবূ রাফি' কোথায় আছে। আবদুল্লাহ নরম স্বরে ডাক দিলেন, "আবূ রাফি'!"

সে জবাব দিল, "কে?" আবূ রাফি'র কণ্ঠ অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন আবদুল্লাহ। তরবারি চালালেন বটে, কিন্তু আবূ রাফি' একটু আহত হলো কেবল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে। আঁধারের মাঝে আবদুল্লাহ সটকে পড়লেন। একটু পর ফিরে এসে স্বর বদলে জিজ্ঞেস করলেন, "আবূ রাফি', কিসের শব্দ হলো?" হাবভাব এমন যেন সাহায্য করতে এসেছেন।

"আরে সর্বনাশ! কে যেন ঘরে ঢুকে আমাকে তলোয়ার দিয়ে মারতে চেয়েছিল", ব্যথা আর রাগে চেঁচিয়ে উঠল আবূ রাফি'। আবদুল্লাহ আবারও এগিয়ে এসে আঘাত করলেন। কিন্তু এবারের আঘাতটিও প্রাণঘাতী হলো না। ফলে তলোয়ারটা কায়দা করে তার পেটে বিঁধিয়ে দিয়ে এত জোরে চাপ দেন যে, পিঠের হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে আবূ রাফি'র শরীর থেকে। দ্রুত আবদুল্লাহ ইবনু আতীক একের পর এক দরজা খুলে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে লাগলেন। চাঁদের আলো ছিল ঠিকই। কিন্তু ক্ষীণ আলোতে ভুল বোঝার কারণে সিঁড়িতে পা হড়কে পড়ে যান তিনি। পায়ে জখম হয়। পাগড়ি খুলে বেঁধে নেন পায়ের ক্ষতস্থান। ফটকের পাশের ছায়ায় লুকিয়ে থাকেন ভোর পর্যন্ত। ভোরে দুর্গের চূড়া থেকে এক ঘোষণাকারী বলে ওঠে, "আমি হিজাযের ব্যবসায়ী আবূ রাফি'র মৃত্যুর ঘোষণা দিচ্ছি!"

অভিযান শেষে খুশিমনে সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসেন আবদুল্লাহ। সবাই মিলে নিরাপদে মদীনায় ফিরে নবিজি ﷺ-কে সব ঘটনা জানান। আবদুল্লাহর পায়ের ক্ষতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত বোলাতেই তা পুরোপুরি এমনভাবে সেরে যায় যে, মনে হয় কখনও কোনও

ব্যথাই ছিল না।[৩৬৪]

• ইয়ামামার নেতা সুমামা ইবনু উসালের বন্দি (মুহাররম, ৬ষ্ঠ হিজরি)

সুমামা ইবনু উসাল ছিলেন ইয়ামামা অঞ্চলের নেতা। ইসলাম ও নবিজি ﷺ-এর প্রতি বিদ্বেষবশত একবার তিনি নবিজিকে হত্যাচেষ্টা করেন। এ কাজে তাকে ইন্ধন জোগায় মিথ্যুক নবি-দাবিদার মুসাইলিমা কাযযাব। ষষ্ঠ হিজরি সনের মুহাররম মাসে গুপ্তহত্যার উদ্দেশ্যে বের হন সুমামা।[৩৬৫] কিন্তু বানূ বকর ইবনি কিলাবের বিরুদ্ধে অভিযান শেষ করে ফেরত আসা একদল মুসলিম অশ্বারোহীর হাতে ধরা পড়ে যান তিনি।

মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে সাহাবিদের সেই দলটি সুমামাকে বন্দি করে মদীনায় নিয়ে আসেন। মাসজিদে নববির একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয় তাকে। নবি ﷺ বন্দিকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, "সুমামা, কেমন আচরণ আশা করো?"

সুমামা জবাব দেয়, "ভালো আচরণ। কারণ, যদি আমাকে মেরে ফেলেন, তবে এমন একজনকে হত্যা করবেন, যার রক্তের মূল্য আছে। যদি দয়া করেন, তবে দয়া পাবেন। আর যদি ধনসম্পদ চান বলুন, যা চান আপনাকে তা-ই দেওয়া হবে।"

পরপর তিন দিন নবি ﷺ তাকে একই প্রশ্ন করে একই জবাব পান। অবশেষে তাকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। কিন্তু সুমামা সম্ভবত এই তিন দিনে নিজের মুক্তির চেয়েও আরও গভীর কোনও বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। ছাড়া পেয়েই তিনি গোসল করে এসে ইসলামে দাখিল হওয়ার আবেদন জানান। পরে তিনি নবিজিকে বলেছিলেন, "আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, মুহাম্মাদ! একটা সময়ে আমি দুনিয়ার বুকে আপনাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতাম। কিন্তু সেই আপনিই এখন আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আল্লাহর কসম! আপনার ধর্মটাকে একসময় আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতাম। কিন্তু সেটাই এখন আমার নিকট সব থেকে বেশি প্রিয়।"

মদীনা থেকে বের হয়েই উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যান সুমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। কুরাইশরা তার এই পরিবর্তন দেখে অপমানের তুবড়ি ছোটায়। সুমামার ত্বরিত জবাব, "আল্লাহর কসম! নবিজি অনুমতি দেওয়ার আগ পর্যন্ত ইয়ামামা থেকে একটা গমের দানাও তোদের এখানে আসবে না।"

---

[৩৬৪] বুখারি, ৪০৩৯।

[৩৬৫] নূরুদ্দীন, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ২/২৯৭।

ঠিকই সুমামা কথাকে কাজে পরিণত করে বসেন। দিনের পর দিন কেটে যায়, অথচ গম-ব্যবসায়ীদের একটা কাফেলাও মক্কায় আসে না। শেষমেশ নবিজি ﷺ-এর কাছে চিঠি পাঠিয়ে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তারা এই অবরোধ তুলে নেওয়ার আবেদন জানায়। নবিজি অনুমতি দেওয়ার পরই কেবল সুমামা আবার মক্কাবাসীদের সাথে গম লেনদেন শুরু করেন।[৩৬৬]

• বানূ লিহইয়ানের যুদ্ধ (রবীউল আউয়াল, ৬ষ্ঠ হিজরি)

হিজায অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র উসফান। সেখানে বাস করে লিহইয়ান গোত্র। রজী'তে এরাই সত্তর জন সাহাবিকে আক্রমণ করে শহীদ করেছিল। নবি ﷺ অনেক আগে থেকেই এদের ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু এতদিন খন্দক যুদ্ধের মতো বড় বড় ঘটনাগুলো ব্যস্ত রেখেছিল তাঁকে। এখন আর সে ঝামেলা নেই। আর দেরি না করে ষষ্ঠ হিজরির রবীউল আউয়াল মাসে দুই শ সেনা ও বিশ জন অশ্বারোহী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। এ সময়ও তিনি মদীনার দায়িত্ব অর্পণ করে যান আবদুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূম (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে।

আমৃজ ও উসফানের মাঝামাঝি 'বাতনু গারান'-এ গিয়ে পৌঁছায় বাহিনীটি। এখানেই হয়েছিল সেই মর্মান্তিক গণহত্যা। সেখানে দুদিনের যাত্রাবিরতি করে নবি ﷺ শহীদদের জন্য দুআ করেন। অভিযানের খবর পেয়ে বানূ লিহইয়ান পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে। দশ জন অশ্বারোহীর একটি অগ্রগামী বাহিনী নিয়ে উসফানে যান নবিজি ﷺ। 'কুরাউল গমীম' পর্যন্ত গিয়েছিলেন তারা। চৌদ্দ দিন পর মুসলিম বাহিনী মদীনায় ফিরে আসেন। কিন্তু কাউকেই হাতের নাগালে পাননি। মুসলিম বাহিনীর ভয়ে তারা সবাই দূর-দূরান্তে পালিয়ে গিয়েছিল।

• যাইনাব ﵂-এর স্বামী আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ

একই বছরের জুমাদাল উলা মাসে রাসূল ﷺ একটি সিরিয়াফেরত কুরাইশ কাফেলার খবর পান। যাইদ ইবনু হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে ১৭০ জন অশ্বারোহীর একটি বাহিনীকে 'ঈস'-এ পাঠান তিনি। কুরাইশ কাফেলার নেতৃত্বে ছিলেন আবুল আস ইবনু রবী'। ইনি নবি-তনয়া যাইনাব (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর স্বামী। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তিন বছর যাবৎ দেখা নেই। একদিকে যাইনাব মদীনায় হিজরত করে এসেছেন, আরেকদিকে আবুল আস ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে রয়ে গেছেন মক্কায়।

---

[৩৬৬] বুখারি, ৪৩৭২; যাদুল মাআদ, ২/১১৯; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ৭/৬৮৮।

মুসলিম বাহিনী পুরো কাফেলাটিকে কব্জা করে ফেলেন। আবুল আস শুধু পালিয়ে চলে আসেন মদীনায়। আশ্রয় নেন যাইনাবের ঘরে। স্ত্রীকে অনুরোধ করেন, যেন রাসূল ﷺ-কে বলে কাফেলার মালপত্র ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কন্যার অনুরোধ রক্ষা করেন নবিজি।

ঋনু ব্যবসায়ী আবুল আস মক্কায় গিয়ে যার যার পণ্য তার তার কাছে বুঝিয়ে দিয়ে আসেন। তারপর মদীনায় ফিরে এসে ইসলাম কবুল করেন। পুনর্মিলন হয় স্বামী-স্ত্রীর। কাফিরদের সাথে মুসলিম নারীদের বিয়ে নিষিদ্ধ করে তখনো আয়াত নাযিল হয়নি। তাই পুনঃনবায়ন ছাড়াই বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট থাকে।[৩৬৭]

এ সময়টায় আল্লাহর রাসূল আরও কয়েকটি অশ্বারোহী অভিযাত্রী দল প্রেরণ করেন। দূরবর্তী এলাকাগুলোতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকা শত্রুদের খতম করে শান্তি নিশ্চিত করা হয় এই অভিযানগুলোর মাধ্যমে।[৩৬৮]

বানুল মুস্‌তালিকের যুদ্ধ (শা'বান, ৬ষ্ঠ হিজরি)

পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরি সনের দোসরা শা'বানে সংঘটিত বানুল মুসৃতালিক অভিযান ইসলামের ইতিহাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। বানূ খুযাআ তখন মুসলিমদের সাথে সন্ধিবদ্ধ। এদেরই একটি শাখা বানুল মুসৃতালিক একসময় কুরাইশদের পক্ষ নিয়ে নবিজি ﷺ-এর ওপর আক্রমণের চক্রান্ত করতে থাকে। বুরাইদা ইবনু হুসাইব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠানো হয় এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে। তিনি মদীনায় ফিরে এসে বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন। মদীনার দায়িত্ব যাইদ ইবনু হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে দিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে নবিজি ﷺ বেরিয়ে পড়লেন।

কুদাইদ অঞ্চলের সীমানায় মুরাইসী' নামক একটি ঝরনার কাছে শিবির গেড়েছিল বানুল মুসৃতালিক। সাত শ জনের এক সেনাবাহিনী নিয়ে এসে তাদের একেবারে চমকে দেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। অতর্কিত অভিযানে তাদের কয়েকজনকে হত্যা করা হয়, নারী ও শিশুদের বন্দি করা হয় আর বাজেয়াপ্ত করা হয় তাদের সব সম্পত্তি ও গবাদিপশু।[৩৬৯]

ধনাঢ্য হারিস ইবনু আবী দিরারের মেয়ে জুওয়াইরিয়াও ছিলেন বন্দিদের মাঝে। মদীনায়

---

[৩৬৭] আবূ দাউদ, ২২৪০।
[৩৬৮] যাদুল মাআদ, ২/১২০-১২২।
[৩৬৯] বুখারি, ২৫৪১।

আসার পর ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি। নবিজি ﷺ তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে করেন। সাহাবায়ে কেরাম উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদায় উন্নীত জুওয়াইরিয়া (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর সম্মানার্থে বানুল মুস্‌তালিকের আরও এক শ পরিবারকে মুক্ত করে দেন। বৈবাহিক সূত্রে তারা সবাই তখন নবিজির আত্মীয়। পরে তারাও ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে তার পুরো গোত্রের পার্থিব ও পারত্রিক কল্যাণ বয়ে আনেন জুওয়াইরিয়া (রদিয়াল্লাহু আনহা)।[৩৭০]

শুধু সামরিক গুরুত্বই এই অভিযানের একমাত্র উল্লেখযোগ্য দিক নয়; বরং এর জের ধরে আরও দুটো চরম বেদনাদায়ক ঘটনার উদ্ভব হয়, যা মুসলিম সমাজ ও নবিজি ﷺ-এর হৃদয়কে মারাত্মকভাবে ব্যথিত করে।

আনসার-মুহাজির দ্বন্দ্ব

মুরাইসী'তে অবস্থানকালে এক আনসারি ও এক মুহাজিরের মাঝে ঝগড়া ও মারামারি বেধে যায়। মুহাজির ব্যক্তিটি আনসার ব্যক্তিকে আঘাত করলে সে তার গোত্রকে "হে আনসার!" বলে উঁচু স্বরে আহ্বান করতে থাকে। ওদিকে অপর ব্যক্তিও "হে মুহাজিরীন!" বলে তার গোত্রকে আহ্বান করে ওঠেন। এতদিন ভাই হয়ে থাকা দুটো জাতির মাঝে স্রেফ জন্মভূমির পার্থক্যের ভিত্তিতে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়। মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ জঘন্য এই জাতীয়তাবাদী হাঁক কানে আসামাত্রই রাসূলুল্লাহ ﷺ বাধা দেন।

রাসূল ﷺ বললেন, "আমি তোমাদের মাঝে থাকতেই তোমরা এসব জাহিলি যুগের হাঁকডাক শুরু করে দিলে! এগুলো ছেড়ে দাও। এসব দুর্গন্ধযুক্ত।"[৩৭১]

সাহাবিরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবারও ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের পথে ফিরে আসেন।

বেশ কয়েকজন মুনাফিকও সে অভিযানে উপস্থিত ছিল। সাথে ছিল তাদের পালের গোদা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই। আনসার-মুহাজিরে ঝগড়া বাধতে দেখে তাদের তো পোয়াবারো। মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্য করে আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ভাষণ দিতে শুরু করে,

"এদের কত বড় সাহস! আমাদের মুখের ওপর কথা বলে? আমাদেরই দেশে এসে আমাদেরই চোখ রাঙাচ্ছে! কথায় আছে না, দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষলে ওই সাপের

[৩৭০] ইবনু হিশাম, ২/২৮৯-২৯৫; যাদুল মাআদ, ২/১১২-১১৩।
[৩৭১] বুখারি, ৩৫১৮।

কামড়েই মরতে হয়। আল্লাহর কসম! এবার মদীনায় ফিরে সম্মানিত লোকেরা এসব লাঞ্ছিত লোকদের বের করে দেবে।"

সে 'সম্মানিত লোক' বলে নিজেকে আর 'লাঞ্ছিত লোক' বলে নবি ﷺ-কে বুঝিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। সে তাদের আরও বলে,

"এই বিপদ তোমরা নিজেরাই টেনে এনেছ। তাদের নিজ শহরে আশ্রয় দিয়েছ এবং নিজের সম্পদের মালিক বানিয়েছ। শোনো! আল্লাহর কসম! তোমরা তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও, তাহলে দেখবে তারা তোমাদের শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে বাধ্য হবে।"

আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের এই বিষ উগরানো প্রত্যক্ষ করছিলেন তরুণ সাহাবি যাইদ ইবনু আরকাম (রদিয়াল্লাহু আনহু)। সাথে সাথে তিনি গিয়ে নবিজি ﷺ-কে বিষয়টি জানান। আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে ডাকিয়ে আনেন নবিজি। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে রীতিমতো কসম করে তা অস্বীকার করে বসে। সে-যাত্রায় মিষ্টি কথা দিয়ে বেঁচে গেলেও সূরা মুনাফিকূন নাযিল করে আল্লাহ তাআলা নিজেই সবকিছু ফাঁস করে দেন। কিয়ামাত পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইবনু উবাই এক ঘৃণিত নাম হয়ে থাকবে।[৩৭২]

মজার ব্যাপার হলো, পিতার নামে নাম হওয়া ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনি উবাই (রদিয়াল্লাহু আনহু) একজন সাচ্চা মুমিন। বাবার এই আচরণে প্রচণ্ড খেপে ওঠেন তিনি। পুরো বাহিনী মদীনায় পৌঁছার আগেই তিনি সেখানে গিয়ে বসে থাকেন। তার পিতা মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই আসামাত্র তার পথরোধ করে মুখের ওপর বলতে থাকেন,

"আল্লাহর কসম! নবিজি ﷺ অনুমতি দেওয়ার আগ পর্যন্ত আপনাকে এক চুলও সামনে যেতে দেবো না। কারণ, নবিজিই হলেন ইজ্জতওয়ালা, সম্মানিত আর আপনি হলেন লাঞ্ছিত, অপমানিত।"

নবি ﷺ আবদুল্লাহকে শান্ত করে বাবার পথ ছেড়ে দিতে অনুমতি দেন। গজগজ করতে করতে মদীনায় প্রবেশ করে আবদুল্লাহ ইবনু উবাই আর ভাবতে থাকে কীভাবে মুসলিমদের শান্তি বিনাশ করা যায়। দু'জন মানুষের সামান্য ঝগড়ার জের ধরে পিতা-পুত্রে চিরশত্রুতা শুরু হয়। কিন্তু এ ঘটনা থেকে এও জানা যায় যে, তাকওয়া আর ঈমানের বন্ধনই আসল বন্ধন। আর আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে এই অনুমতি প্রদানের

---

[৩৭২] বুখারি, ২৫৮৪; তিরমিযি, ৩৩১২।

ফলে ফিতনাও তখনকার মতো দমে যায়।[৩৭৩]

• আয়িশা ﷺ-এর প্রতি অপবাদ

মুরাইসী' থেকে মদীনা বেশ দীর্ঘ পথ। তখন একটি যাত্রাবিরতি চলছিল। নবি ﷺ-এর সিদ্ধান্তে রাতে আবারও সফর শুরু হয়। এ-রকম যাত্রাকালে আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) সাধারণত একটি হাওদার ভেতরে ঢুকে বসেন। তারপর সেটাকে ধরাধরি করে উটের পিঠে তুলে দেয় কয়েকজন মানুষ।

কিন্তু এবারে একটু ভিন্ন ঘটনা ঘটল। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) হঠাৎ খেয়াল করলেন যে, তার গলার হারটা খুঁজে পাচ্ছেন না। সেটা খুঁজতে গিয়ে একটু দূরে সরে পড়েন তিনি।

এদিকে মুসলিমরা শিবির ভেঙে পুনরায় সফর আরম্ভ করছে। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাওদার দায়িত্বে থাকা লোকেরাও যথারীতি সেটা উটের পিঠে তুলে দিল। হাওদা জিনিসটা অনেকটা পালকির মতো সবদিকে বন্ধ। তার ওপর আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) খুবই হালকা-পাতলা গড়নের ছিলেন। খালি হাওদা তুলতে গিয়েও তাই কারও কোনও সন্দেহ হয়নি যে, ভেতরে তিনি নেই।

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) ফিরে এসে দেখেন, তাকে রেখেই সবাই চলে গেছে। তবে তিনি এতে ভয় পেয়ে যাননি। কিছুদূর গিয়ে টের পাওয়ার পর তাকে যে নিতে ফেরত আসবে, তা তো জানা কথা। তাই তিনি নিজ স্থানেই বসে থাকেন এবং একসময় চোখ ভার হয়ে এলে ঘুমিয়ে পড়েন।

আরও একজন সাহাবি সেনাদলের পেছনে ছিলেন, যাতে কাফেলার কোনও ফেলে যাওয়া জিনিস তিনি নিয়ে যেতে পারেন। সফওয়ান ইবনু মুআত্তাল সুলামি (রদিয়াল্লাহু আনহু)। যাত্রাবিরতির স্থানে সেনাবাহিনী কিছু ফেলে গেল কি না, সেটা দেখাশোনার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছিল। সেনাদলের পায়ের ছাপ দেখে দেখে পরে আস্তেধীরে তিনি সবার সাথে গিয়ে যোগ দিতেন। হঠাৎ দূর থেকে তিনি সেখানে একজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে দেখতে পান। একটু অগ্রসর হলে চিনতে পারেন যে, ঘুমন্ত ব্যক্তিটি আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)। কারণ, পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগে তিনি তাকে দেখেছিলেন।

সফওয়ান (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে দেখেই বলে উঠলেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না

---

[৩৭৩] ইবনু হিশাম, ২/২৯০-২৯২।

ইলাইহি রজিউন! এ তো আল্লাহর রাসূলের স্ত্রী।" এ ছাড়া আর কোনও কথা বলেননি। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর এই আওয়াজ শুনে সাথে সাথে জেগে ওঠেন এবং উড়না দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেন। নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীর প্রতি সমীহবশত নীরবেই তাঁর উটটি নিয়ে আসেন। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) তাতে উঠে বসলে তিনি সামনে থেকে উটের লাগাম ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেন। ওদিকে মুসলিম সেনাদল পরবর্তী যাত্রাবিরতির জন্য আরেক জায়গায় গিয়ে থেমেছে। দুপুর নাগাদ সফওয়ান ও আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হন।

দু'জনকে একসাথে দেখে আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের মনে আবারও শয়তানি লাফিয়ে ওঠে। অবশেষে নবিজি ﷺ-এর হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করার এবং তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর চরিত্রে কালিমা লেপনের মোক্ষম সুযোগ মিলেছে। নিজের বন্ধুদের মধ্যে সে কানকথা ছড়িয়ে দেয় যে, ইচ্ছে করেই পেছনে রয়ে গিয়েছিল ওই দু'জন! এরপর সবক'টা মুনাফিক মিলে এর কান থেকে ওর কানে ছড়িয়ে দিতে লাগল অপবাদটি। মিথ্যে কথা বারবার বললে সেটাকেই একসময় সত্য বলে মনে হয়। তাই সরলমনা অনেক মুসলিমও এই অপপ্রচারে বিশ্বাস করে বসেন। গুজব, কানকথা, আর অপবাদে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা মদীনা।

ওদিকে আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু জানেনও না। মদীনায় ফেরার পরপরই অসুস্থ হয়ে প্রায় এক মাস বিছানায় কাটাতে হয় তাঁর। বাইরের দুনিয়ায় কী হচ্ছে, জানার মতো অবস্থা বা সুযোগ কোনোটিই হয়নি। কিন্তু একটি বিষয় ঠিকই প্রকটভাবে চোখে লাগছে। তার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ ইদানীং কেমন যেন অন্যরকম। আগে কত আদর দিয়ে কথা বলতেন, কাছে আসতেন। এখন শুধু শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েই চলে যান, পাশে এসে একটুও বসেন না। সালাম বিনিময় ছাড়া আর কোনও কথাও বলেন না।

ভিত্তিহীন একটা অভিযোগকে মুসলিম সমাজ কীভাবে বিশ্বাস করে আসছে, তা নিয়ে নবি ﷺ নিজেও যথেষ্ট আহত। উম্মুল মুমিনীনদের কারও চরিত্র নিয়েই প্রশ্ন ওঠা অসম্ভব। কিন্তু আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) যেহেতু অপবাদের শিকার হয়েই গেছেন, তাই নবিজিকেও ঘর ও সমাজের স্বার্থে আপাত নিরপেক্ষ আচরণ করতে হচ্ছে। আরও দুঃখের ব্যাপার হলো, পুরো সময়টায় তিনি একবারও ওহি লাভ করেননি। বিষয়টি নিয়ে বিশেষ বিশেষ সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন তিনি। আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) ইঙ্গিতে তালাকের কথা বললেও উসামা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-সহ বাকিরা বিপরীত মত দেন।

পরামর্শ শেষে রাসূল ﷺ মিম্বরে উঠে আসেন। ঘোষণা করেন যে, নবিজির নিজের ঘরকে ক্ষতবিক্ষতকারীর সাথে বোঝাপড়া করা এখন সমাজেরই দায়িত্ব। নবিজি ﷺ-এর এ কথাকে হৃদয়ঙ্গম করেন আওস গোত্রপতি। গুজবের মূল হোতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। কিন্তু ওদিকে ইবনু উবাই আবার খাযরাজ গোত্রের সদস্য। খাযরাজ গোত্রপতি এ ঘোষণাকে নিজের পুরো গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসেবে দেখেন। এর জের ধরে অনেক অনৈক্য ও প্রতিহিংসা ছড়িয়ে পড়ে। নবিজি ﷺ অতি কষ্টে বিষয়টি মিটমাট করে দিয়ে তাদের আবার এক করে দেন।

ততদিনে আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। একদিন রাতের বেলা তিনি শৌচাগারে যাচ্ছিলেন। সাথে ছিলেন উম্মু মিসতাহ্ (রদিয়াল্লাহু আনহা)। অন্ধকারে নিজের কাপড়ের সাথে পা বেঁধে হোঁচট খান তিনি। এ-রকম পরিস্থিতিতে নিজের সন্তানের নাম ধরে অভিশাপ দিয়ে বসাটা আরবদের একটি স্বাভাবিক বাচনভঙ্গি। উম্মু মিসতাহ্ও নিজের ছেলের ব্যাপারে এমনটিই বলে ওঠেন। কিন্তু প্রচলিত সব বাচনভঙ্গিই তো আর ইসলামের সাথে যায় না। তাই উম্মু মিসতাহ্র কথা শুনে তাকে ধমক দেন আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)। উম্মু মিসতাহ্ বলেন যে, 'ঠিকই আছে। কারণ, তার ছেলেও অন্য সবার সাথে মিলে ওসব মিথ্যা কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে।'

"কোন মিথ্যা কথা?" আয়িশার কৌতূহলী জিজ্ঞাসা। উম্মু মিসতাহ্ একটানে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন আর নীরবে শুনে চলেন আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)। তারপর চুপচাপ ঘরে গিয়ে তিনি বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি নেন নবি ﷺ-এর কাছ থেকে। বাড়িতে গিয়ে বাবা-মার কাছ থেকেও জানতে পারেন যে, তাকে আর সফওয়ান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ঘিরে সারা মদীনায় কানাকানি চলছে। তিন দিন ধরে নিদ্রাহীন একটানা কান্না করে চলেন আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা আর কান্না করা ছাড়া তার বাবা-মারও কিছু করার ছিল না।

তৃতীয় দিনে নবি ﷺ আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে দেখতে আসেন। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে নবি, সমাজপতি ও স্বামীসুলভ গম্ভীরতায় বলেন, "আয়িশা, তোমার ব্যাপারে তো এটা-ওটা শুনলাম। এখন তুমি যদি নির্দোষ হও, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই সেটার সত্যায়ন করবেন। আর যদি গুনাহ করে থাকো তাহলে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর দিকে ফিরে আসো। কেননা বান্দা যখন নিজ অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহর নিকট তাওবা করে তখন তিনি তার তাওবা কবুল করে নেন।"

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) চুপচাপ শুনে যান। সে সময় তাঁর অশ্রু থেমে গিয়েছিল। তারপর বাবা-মাকে অনুরোধ করেন তার পক্ষ থেকে উত্তর দিতে। কিন্তু তাঁরা এর

কী জবাব দেবেন ভেবে না পেয়ে দু'জনেই চুপ থাকেন। ফলে আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) নিজেই দৃঢ়কণ্ঠে বলেন,

"আল্লাহর শপথ! আমি জানি, এই কথা শুনতে শুনতে আপনাদের অন্তরে তা দৃঢ়ভাবে বসে গেছে এবং আপনারা তা সত্য মনে করছেন। সুতরাং এখন যদি বলি, আমি পবিত্র—আর আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন যে, আমি পবিত্র—তাহলে আপনারা তা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এই কথা স্বীকার করি—আর আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন যে, আমি পবিত্র—তাহলে আপনারা তা সঠিক বলে মেনে নেবেন। এই জন্য আমি কেবল সেই কথাই বলছি যেমন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর পিতা বলেছিলেন,

﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿٨١﴾

'সুতরাং এখন ধৈর্য ধরাই শ্রেয়। তোমরা যা বলছ সে ব্যাপারে আমি কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই।'[৩৭৪]

এ কথা বলার পর তিনি পাশ ফিরে শুয়ে পড়েন। ঠিক সেই মুহূর্তে ওহি লাভ করতে শুরু করেন নবি ﷺ। ওহি গ্রহণ শেষ হওয়ামাত্র নবিজি ﷺ বলেন, "আয়িশা, আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ বলেছেন।"

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে তাঁর মা বলেন, "উঠে নবিজির দিকে ফিরে বসো (শোকরিয়া জানাও)।"

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) জবাব দেন "না। ফিরব না, আমি শুধু আল্লাহ তাআলারই প্রশংসা করব।"

এ ঘটনায় নাযিল হওয়া আয়াতগুলো হলো সূরা নূরের ১১ নং থেকে ২০ নং আয়াত পর্যন্ত। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয় যে, সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীরা পাপাচারী। যারা তা ছড়িয়েছে ও বিশ্বাস করেছে, তারাও অপরাধী, পাপাচারী।

অপবাদদাতাদের জন্য শাস্তির বিধানও বর্ণিত হয়েছে এই আয়াতগুলোতে। সেই সাথে নারীদের ইজ্জত রক্ষার্থে মুসলিম সমাজকে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট আচরণবিধি। সন্দেহ এড়িয়ে চলা, অপবাদে বিশ্বাস করতে ও তা ছড়াতে অস্বীকৃতি জানানোকে ঈমানের

[৩৭৪] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১৮।

অঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِيْ تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ
﴿١١﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هَـٰذَا إِفْكٌ
مُّبِيْنٌ ﴿٢١﴾ لَّوْلَا جَاءُوْا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَـٰئِكَ
عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ ﴿٣١﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
لَمَسَّكُمْ فِيْ مَا أَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٤١﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ
بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ ﴿٥١﴾
وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُم مَّا يَكُوْنُ لَنَا أَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا سُبْحَانَكَ هَـٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ
﴿٦١﴾ يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٧١﴾ وَيُبَيِّنُ اللهُ
لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٨١﴾

“তোমাদের মধ্যকার একটি অংশই অপবাদটি উত্থাপন করেছিল। এতে তোমাদের জন্য মন্দ নয়; বরং ভালোই হয়েছে। প্রত্যেকেই পাবে নিজ নিজ অর্জিত পাপের ভাগ। আর প্রচণ্ড শাস্তি পাবে মূল হোতারা। বিশ্বাসীরা যখন গুজবটি শুনতে পেল, তখন কেন নিজেদের লোকদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করল না? কেন বলল না ‘এ এক নির্জলা অপবাদ’? অভিযোগ প্রমাণ করতে চার জন সাক্ষীই-বা আনল না কেন? সাক্ষ্য হাজির করতে না পারায় আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যেবাদী হিসেবে গণ্য হবে। যদি তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তাহলে ওসব কথার জন্য ভয়াবহ আযাব এসে ধরত তোমাদের। না জেনে তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে। ভেবেছিলে যে, ওটা তেমন কিছুই না। অথচ আল্লাহর কাছে তা গুরুতর। মিথ্যে অপবাদটি শোনার পর তোমাদের বলা উচিত ছিল, ‘আমরা এ নিয়ে কোনও কথাই বলব না। সুবহানাল্লাহ! এ তো বড় মারাত্মক অপবাদ!’ যদি সত্যিই মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে আর কক্ষনো এমন আচরণ করবে না। এটি আল্লাহর আদেশ। আর আল্লাহ তাঁর আদেশ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি তো সর্বজ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময়।”[৩৭৫]

---

[৩৭৫] সূরা নূর, ২৪ : ১১-১৮।

নবিজি ﷺ-এর বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল। উৎফুল্লচিত্তে সাহাবিদের কাছে গিয়ে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনালেন। ওহির নির্দেশনা অনুযায়ী দু'জন পুরুষ ও একজন নারী সাহাবির জন্য আশিটি করে বেত্রাঘাতের দণ্ড নির্ধারিত হয়। হাসসান ইবনু সাবিত, মিসতাহ্ ইবনু উসাসা এবং হামনা বিনতু জাহশ (রদিয়াল্লাহু আনহুম) এই দণ্ড ভোগ করে আখিরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যান। কিন্তু মিথ্যুক-নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সাথি-সঙ্গীদের শাস্তির আওতার বাইরে রাখা হয়।[৩৭৬]

আইনের চোখ ফাঁকি দিতে পেরেছে ভেবে অনুশোচনা থেকেও বিরত থাকে তারা। কিন্তু কিয়ামাতের দিন তাদের আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। যেদিন না কোনও সহায়-সম্পদ কাজে আসবে, আর না কোনও সন্তান-সন্ততি। সেদিন শুধু তারাই সফল হবে এবং মুক্তি পাবে, যারা 'কলবুন সালীম' সুস্থ ও শুভ্র অন্তর নিয়ে হাযির হবে।

হুদাইবিয়ার উমরা (যুল-কা'দা, ৬ষ্ঠ হিজরি)

• উমরা-যাত্রা এবং হুদাইবিয়ায় যাত্রাবিরতি

অপবাদের ঘটনার সুরাহা হওয়ার পর বেশিদিন অতিবাহিত হয়নি। নবি ﷺ-কে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, তিনি এবং সাহাবিগণ মক্কায় হারাম শরীফে ঢুকছেন, সালাত আদায় শেষে মাথার চুল কামাচ্ছেন। এ কাজগুলো হাজ্জ ও উমরার অংশ। রাসূল ﷺ তাই সাহাবিদের জানিয়ে দিলেন যে, শীঘ্রই সবাই মিলে উমরা করতে রওনা হব। আহ্বান করা হয় মদীনার আশপাশে বসবাসরত অন্যান্য আরবদেরও।

কিন্তু কুরাইশদের শক্ত ঘাঁটিতে গিয়ে সোজা ঢুকে পড়ার ব্যাপারে অন্যান্য আরবদের মনে ভয় কাজ করতে থাকে। নবি ﷺ ও সাহাবিরা সেখান থেকে নিরাপদে ফিরে আসবেন কি না, এ নিয়েও তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে। ফলে তারা চাষাবাদের এবং সন্তান ও সম্পদ নিয়ে ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে সেবারের মতো অপারগতা প্রকাশ করে। আর নবিজি ﷺ-কে অনুরোধ করে যেন তাদের জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

চৌদ্দ শ মুহাজির ও আনসারকে সাথে নিয়ে উমরা-যাত্রা আরম্ভ করেন আল্লাহর রাসূল ﷺ।[৩৭৭] দিনটি ছিল সোমবার, ষষ্ঠ হিজরি সনের প্রথম যুল-কা'দা। কুরবানির প্রাণীও নেওয়া হয় সাথে করে। যেন লোকেরা বুঝতে পারে যে, এ যুদ্ধ-যাত্রা নয়; বরং উমরা করাই মূল উদ্দেশ্য। 'যুল হুলাইফা' এলাকায় এসে প্রাণীগুলোকে মালা পরিয়ে কুঁজ

[৩৭৬] বুখারি, ২৬৬১, ইবনু হিশাম, ২/২৯৭-৩০৭; যাদুল মাআদ, ২/১১৩-১১৫।
[৩৭৭] বুখারি, ৪১৫৪।

চিরে দেওয়া হয়। কুরবানির প্রাণী চিহ্নিত করার জন্য সে-সময় এমনটিই করা হতো। তারপর ইহরাম বেঁধে নেন উমরা-যাত্রীরা।[৩৭৮]

'উসফানে' এসে পৌঁছান সবাই। একটি দলকে নবি ﷺ আগেই সামনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তথ্য সংগ্রহের জন্য। তারা ফিরে এসে জানালেন যে, 'যী-তুওয়া' অঞ্চলে কুরাইশরা শিবির গেড়ে বসে আছে। যেকোনও মূল্যে মুসলিমদের উমরা পালন প্রতিহত করতে তারা বদ্ধপরিকর। প্রয়োজনে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। উসফানের কাছেই অবস্থিত 'কুরাউল গমীম'। মক্কায় যাওয়ার একটি পথ। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের নেতৃত্বে কুরাইশ সেনাদল সেখানে অবস্থান নিয়েছে। প্রতিবেশী গোত্রগুলোকেও আহ্বান করেছে মদদ করার জন্য।

সাহাবিদের সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। সামনে কেবল দুটি বিকল্প। একটি হলো কুরাউল গমীমে সমাবিষ্ট জোটকে আক্রমণ করা। আরেকটি হলো সোজা মক্কায় রওনা হয়ে যাওয়া, পথে কারও বাধা পেলেই স্রেফ লড়াই করা।

আবূ বকর সিদ্দিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) মত দিলেন, "আমরা এখন বের হয়েছি উমরার উদ্দেশ্যে, যুদ্ধের জন্য নয়। তাই বাধাদানকারী ছাড়া আর কারও সাথে আগ বাড়িয়ে লড়াই করতে যাবার দরকার নেই।" নবি ﷺ সহমত পোষণ করলেন। সিদ্ধান্ত হলো মক্কা যাওয়ার।[৩৭৯]

দুপুরে মুসলিমরা জামাতের সাথে যুহরের সালাত আদায় করলেন। ওদিকে তাদের গতিবিধির ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখছেন অত্যন্ত সুচতুর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। দেখলেন যে, সালাতের সময় মুসলিমরা সবচেয়ে অরক্ষিত থাকে। বিশেষত রুকূ-সাজদার সময়। সৈনিকদের আদেশ দিলেন যে, আসরের সালাতের সময় তাদের ওপর আক্রমণ করা হবে।

কিন্তু যুহর আর আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নবি ﷺ একটি ওহি পেলেন। মুসলিমরা সবাই একই জামাআতে সালাত পড়বে না। একদল সালাত আদায় করবে, আরেকদল অস্ত্র হাতে থাকবে প্রহরায়। তারপর দ্বিতীয় দলটি সালাতে দাঁড়ালে প্রহরায় থাকবে প্রথম দলটি। বিপদের সময় সালাত আদায়ের এই বিশেষ বিধানের নাম 'সালাতুল খওফ' (ভয়-ভীতিকালীন সালাত)। এর ফলে নস্যাৎ হয়ে গেল খালিদের আক্রমণ পরিকল্পনা।[৩৮০]

---

[৩৭৮] বুখারি, ১৬৯৪, ১৬৯৫।

[৩৭৯] বুখারি, ৪১৭৮।

[৩৮০] আহমাদ, ৩/৩৭৪; আবূ দাউদ, ১২৩৬; নাসাঈ, ১৫৪৫; ফাতহুল বারি, ৭/৪৮৮।

অবরুদ্ধ সড়কটি পরিহার করে ভিন্ন পথে মক্কায় রওনা দিলেন নবি ﷺ ও সাহাবিগণ। 'সানিয়াতুল মুরার' হয়ে নেমে আসতে লাগলেন হুদাইবিয়ায়। এমন সময় নবিজি ﷺ-এর উটনী 'কাসওয়া' হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সাহাবিরা বারবার চেষ্টা করেও তাকে দাঁড়া করাতে পারলেন না। অস্থির হয়ে বলতে লাগলেন, "কাসওয়া কথা শুনছে না!"

নবি ﷺ শান্ত স্বরে বললেন,

"অবাধ্যতা কাসওয়ার স্বভাব নয়। কা'বা আক্রমণকারী সেই সে হস্তিবাহিনীকে যিনি থামিয়ে দিয়েছিলেন, তিনিই ওকে থামিয়ে রেখেছেন। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! কুরাইশরা যদি আমাকে এমন কোনও প্রস্তাব দেয়, যা আল্লাহর হকের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, অবশ্যই আমি তা মেনে নেব। যদি দয়ালু আচরণ করতে বলে, তবে তা-ই করব।"

এই বলে উটনীকে আবারও তাড়া দিলেন। এবারে কাসওয়া উঠে চলতে শুরু করল। হুদাইবিয়ায় এসে নবিজি ﷺ থামলেন।[৩৮১]

স্বগোত্রীয় কয়েকজন মানুষকে সাথে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন বুদাইল ইবনু ওয়ারাকা খুযাঈ। এরা নবিজির শুভাকাঙ্ক্ষী। মক্কাবাসীরা যে যেকোনও মূল্যে মুসলিমদের কা'বায় প্রবেশ ঠেকাতে বদ্ধপরিকর, সে খবর নিশ্চিত করলেন তিনি।

নবি ﷺ উত্তর দিলেন যে, তিনি উমরা করতে এসেছেন, যুদ্ধ করতে নয়। কিন্তু কুরাইশরা যদি যুদ্ধের ব্যাপারে গোঁয়ার্তুমি করে, তাহলে তিনিও পাল্টা জবাব দেবেন, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করেন অথবা তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৩৮২]

• রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরাইশদের মাঝে আলোচনা

নবি ﷺ-এর এই দৃঢ়প্রত্যয়ী বার্তা কুরাইশদের কাছে পৌঁছে দিলেন বুদাইল ইবনু ওয়ারাকা। কুরাইশরা তখন মিকরায ইবনু হাফসকে পাঠায় নবিজির আলাপ-আলোচনা করতে। তাকেও একই কথা জানানো হয়। তারপর এলেন কিনানা গোত্রের হুলাইস ইবনু ইকরিমা। হুলাইসকে আসতে দেখে নবি ﷺ সাহাবিদের বললেন, "এই লোকটি সেই গোত্রের, যারা কুরবানির পশুকে অত্যন্ত সম্মান করে। সুতরাং তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুগুলোকে দাঁড় করিয়ে দাও।"

সাহাবিরা পশুগুলোকে দাঁড় করান, সেই সাথে "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক"

---

[৩৮১] বুখারি, ২৭৩১।
[৩৮২] বুখারি, ২৭৩১।

ধ্বনিতে মুখরিত করে তোলেন চারপাশ। দৃশ্যটি হুলাইসকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বলেন, "সুবহানাল্লাহ! এই লোকগুলোকে আল্লাহর ঘরে যেতে বাধা দেওয়া কিছুতেই সঠিক কাজ হতে পারে না। লাখম, জুযাম আর হামির গোত্র ঠিকই হাজ্জ করতে পারবে, আর আবদুল মুত্তালিবের ছেলেরা তা করতে আসলে বাধা পাবে! কা'বার রবের শপথ! কুরাইশরা ধ্বংস হয়ে যাবে, এসব ব্যক্তি কেবল উমরাই করতে এসেছে।"

মুসলিমদের পক্ষে হুলাইসের ওকালতি শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে কুরাইশরা, "আপনি চুপচাপ বসে থাকেন। আপনি হলেন গাঁও-গেরামের সহজ-সরল বেদুইন। ওদের চালবাজি সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণাই নেই।"

তারপর তারা পাঠায় উরওয়া ইবনু মাসউদ সাকাফিকে। বুদাইলকে যা বলা হয়েছিল, উরওয়াকেও রাসূল ﷺ একই কথা বলে দেন। উরওয়া একটু ভিন্ন পথে চেষ্টা করে দেখে। বলে, "মুহাম্মাদ, পূর্বে কি কখনও কোনও আরবের ব্যাপারে শুনেছেন যে, তারা তাদের নিজ গোত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে? কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ যদি উল্টে যায়, যদি হেরে যান? আপনার চারপাশে তো দেখছি সব প্রতারকের দল বসে আছে। নিশ্চয়ই এরা বিপদের সময় আপনাকে ফেলে পালিয়ে যাবে।"

ক্ষুব্ধ আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) পাশ থেকে গর্জে উঠলেন, "যা, তোর লাত দেবীর যোনি চুষ গিয়ে! আমরা বুঝি আমাদের নবিকে ছেড়ে যাব? তাঁকে ফেলে পলায়ন করব?"

উরওয়া মুখের ওপর কিছু বলতে পারল না। কারণ, এই আবূ বকর এককালে তার অনেক উপকার করেছিলেন। আরবদের রীতি অনুযায়ী ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করতে কথার ফাঁকে ফাঁকে উরওয়া রাসূল ﷺ-এর দাড়ি ধরতে চাইছিল। কিন্তু পাশ থেকে মুগীরা ইবনু শু'বা (রদিয়াল্লাহু আনহু) তলোয়ারের বাট দিয়ে তার হাতে আঘাত করে সরিয়ে দেন এবং বলেন, "তোমার নাপাক হাত দিয়ে আল্লাহর রাসূলের দাড়ি ধরবে না।"

এবার উরওয়া পাল্টা জবাব দিল, "ওরে নিমকহারাম! তোর গাদ্দারির কারণে আমাকে কত দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে, সে খবর আছে?"

মুগীরা ইবনু শু'বা হলেন উরওয়ার ভাতিজা। মুগীরা (রদিয়াল্লাহু আনহু) কয়েকজনকে হত্যা করে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবিজি ﷺ তার ইসলাম গ্রহণকে অনুমোদন দিলেও তার সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। মুগীরার মুরব্বি হিসেবে উরওয়া তার পক্ষে মোকদ্দমা লড়ছে। নিহতদের পরিবারের

সাথে বিষয়টি সুরাহার চেষ্টা চালাচ্ছে। সে ওদিকে ইঙ্গিত করেই এই কথাটি বলে।

মূলত সুরাহার উদ্দেশ্যে এলেও নবিজি ﷺ-এর প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসা, আনুগত্য ও শ্রদ্ধা দেখে উরওয়ার মনে প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। কুরাইশদের কাছে গিয়ে জানায়,

"হে আমার সম্প্রদায়, আমি বহু রাজরাজড়ার দরবার দেখেছি, কায়সার, কিসরা আর নাজাশির জাঁকজমক দেখেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলছি, একটা রাজাকেও মুহাম্মাদের মতো সম্মান পেতে দেখিনি। কী আশ্চর্য! উনি থুতু ফেললেও সেটা নিজেদের হাতে-মুখে মাখতে অনুসারীদের মাঝে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। ওজুর পানির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। তিনি কিছু চাইলে সবাই সেটা এনে দিতে প্রতিযোগিতা করে। কিছু বললে সবাই নীরব হয়ে শোনে। খুব বেশি মুহাব্বতের কারণে তাঁর দিকে কেউ পরিপূর্ণভাবে চোখ তুলে তাকায় না। আমি বলি কি, ওদের দেওয়া শর্তগুলো খুবই যৌক্তিক। আপনারা মেনে নিন।"[৩৮৩]

সমঝোতার চেষ্টা চলাকালীনও একটি সহিংসতার অপপ্রয়াস চালানো হয়। সত্তর-আশি জন মাথা-গরম কুরাইশ তরুণদের একটি দল এর জন্য দায়ী। এক গভীর রাতে তারা তানঈম পর্বত দিয়ে নেমে মুসলিম শিবিরে ঢুকে পড়ে। তবে কোনও ক্ষতি করতে পারার আগেই ধরা পড়ে যায়। নবি ﷺ তাদের দুষ্কৃতি ক্ষমা করে সবাইকে মুক্তি দিয়ে দেন। আর কুরাইশরা এই নৈতিক পরাজয়ের পর শান্তিচুক্তির দিকে ঝোঁকে। এ প্রসঙ্গেই নাযিল হয় নিম্নোক্ত আয়াত:

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٤٢﴾

"তিনি মক্কার ভেতরে তাদের হাতকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের থেকে সংযত করেছেন, তাদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করার করার পর। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন।"[৩৮৪]

• উসমান ؓ-এর বার্তাবহন এবং বাইআতুর রিদওয়ান

দূত আসে-যায়, মুসলিমদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। কিন্তু কুরাইশরা কিছুতেই মানতে রাজি হয় না যে, নবি ﷺ স্রেফ উমরার জন্যই মক্কায় ঢুকতে

---

[৩৮৩] বুখারি, ২৭৩১, ২৭৩২।
[৩৮৪] সূরা ফাতহ, ৪৮ : ২৪।

চাচ্ছেন। নবিজি ﷺ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এবার নিজের পক্ষ থেকে দূত পাঠাবেন তিনি। উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) মক্কায় যাবেন। কুরাইশদের নিশ্চিত করবেন মুসলিমদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে। সেই সাথে ইসলামের দিকে আহ্বানও করবেন তাদের। আবার মক্কায় অবস্থানরত মুসলিমদেরও সুসংবাদ দেবেন যে, আল্লাহ তাআলা শীঘ্রই তাদের দ্বীনকে বিজয়ী করতে চলেছেন। অচিরেই তারা প্রকাশ্যে ও নির্ভয়ে ইসলাম পালন করতে পারবেন। তখন আর ঈমান গোপন করে রাখার কোনও প্রয়োজন পড়বে না।

আবান ইবনু সাঈদ উমাবির নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতির অধীনে মক্কায় প্রবেশ করেন উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু)। কুরাইশদের কাছে পৌঁছে দেন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বার্তা। কুরাইশরা তাকে কা'বা তওয়াফ করার অনুমতি দেয়। কিন্তু তিনি রাসূল ﷺ-কে বাদ দিয়ে একাকী তওয়াফ করতে অস্বীকৃতি জানান।

কুরাইশরা উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে একটু বেশি সময় ধরে রাখে। সম্ভবত তারা চাইছিল মুসলিমদের প্রতি সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবনা তৈরি করে তারপর তাকে ফেরত পাঠাতে। কিন্তু দেরি দেখে মুসলিম শিবিরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, উসমানকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। দূতহত্যা মানে খোলাখুলি যুদ্ধের ঘোষণা। নবি ﷺ যুদ্ধের পোশাক পরিধান করলেন। তারপর একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সাহাবিদের কাছ থেকে শপথ নেন। নবিজির হাতে হাত রেখে সবাই প্রতিজ্ঞা করেন আমৃত্যু লড়ে যাওয়ার এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে না পালানোর। নিজের এক হাতের ওপর আরেক হাত রেখে নবি ﷺ বলেন, "এটা উসমানের পক্ষ থেকে শপথ।" ঠিক এমন সময় উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) ফিরে আসেন। মুমিনদের যুদ্ধে যেতে হয়নি বটে, কিন্তু ততক্ষণে নিজেদের নিষ্ঠার স্বাক্ষর ঠিকই দিয়ে দিয়েছেন। এই শপথের সন্তুষ্টি ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"বৃক্ষতলে আপনার কাছে শপথ নেওয়া মুমিনদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট।"[৩৮৫]

সেদিন থেকে এই শপথটি 'বাইআতুর রিদওয়ান' নামে পরিচিত হয়। যার অর্থ 'সন্তুষ্টির শপথ'। শপথগ্রহীতারা সকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে নিয়েছেন বলেই এই নামকরণ।

---

[৩৮৫] সূরা ফাতহ, ৪৮:১৮।

- হুদাইবিয়ার সন্ধি

শপথ গ্রহণের ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে পারে কুরাইশরাও। তড়িঘড়ি করে তারা যেকোনও মূল্যে যুদ্ধ পরিহার করে শান্তি স্থাপনে সচেষ্ট হয়। এ উদ্দেশ্যে সুহাইল ইবনু আমরকে পাঠানো হয় পরবর্তী দূত হিসেবে। সুদীর্ঘ আলোচনার পর এই শর্তগুলোর ব্যাপারে সম্মত হয় উভয়পক্ষ:

প্রথমত, মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীরা সে বছর উমরা না করেই ফিরে যাবেন। পরের বছর উমরা করতে মক্কায় আসবেন। থাকতে পারবেন শুধু তিন দিন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের কারও সাথে খাপবদ্ধ একটি তরবারি ছাড়া অন্য কোনও অস্ত্র থাকতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, দশ বছর মেয়াদে একটি শান্তিচুক্তি কার্যকর থাকবে। তৃতীয় কোনও পক্ষ যদি মুসলিমদের সাথে চুক্তি করতে চায়, করতে পারবে। কুরাইশদের সাথে করতে চাইলেও করতে পারবে।

তৃতীয়ত, মক্কা থেকে কেউ মদীনায় পালিয়ে গেলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ-এর কোনও অনুসারী মক্কায় ফিরে এলে কুরাইশরা তাকে মদীনায় ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না।

চুক্তিনামাটি লেখার জন্য আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডাকিয়ে আনেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। বললেন, "লেখো, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।'"

বাগড়া দিয়ে বসল সুহাইল, "আমরা রহমানকে জানি না, চিনি না। আপনি 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' লেখেন।" নবি ﷺ তাতেই সম্মতি দিলেন।

এরপর লিখতে বলেন, 'এই কথার ওপর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ চুক্তি করেছেন...।'

আবারও সুহাইলের আপত্তি, "আপনাকে যদি আল্লাহর রাসূল বলে আমরা স্বীকারই করতাম, তাহলে তো আপনাকে বাইতুল্লাহয় যেতে বাধাও দিতাম না, আর আপনার সাথে যুদ্ধও করতাম না।"

নবি ﷺ বললেন, "তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেও আমি আল্লাহর রাসূল।" তারপর আলিকে বললেন, আগে লেখা "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ" অংশটা মুছে দিয়ে "মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ" লিখতে।

আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) অনুযোগ করলেন, "আল্লাহর কসম! আমি কখনও এমনটি

করতে পারি না।" পরে নবি ﷺ বললেন উল্লেখিত অংশটা কোথায় আছে দেখিয়ে দিতে। আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) তা দেখিয়ে দিলে নবিজি ﷺ নিজ হাতে সে অংশটুকু মুছে দেন।[৩৮৬]

তারপর চুক্তিনামার দুটি অনুলিপি লেখা হয়। একটি কুরাইশদের কাছে থাকবে, আরেকটি মুসলিমদের কাছে।

• আবূ জান্‌দালের ঈমানজাগানিয়া ঘটনা

চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা তখনো চলমান। এমন সময় দৃশ্যপটে হাজির হলেন সুহাইল ইবনু আমরের পুত্র আবূ জান্‌দাল। শেকলে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। কারণ, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তার বাবা সুহাইলের এককথা—তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। নবিজি ﷺ প্রতিবাদ করলেন, "চুক্তি তো এখনও চূড়ান্ত হয়নি!"

সুহাইল বলে উঠল, "তাহলে আপনার সাথে কোনও চুক্তিই করব না।"

নবি ﷺ বললেন , "অন্তত আমার ওয়াস্তে ওকে ছেড়ে দিন!"

"না, আপনার অনুরোধেও ছাড়া হবে না ওকে", এই বলে সুহাইল নির্দয়ভাবে আবূ জান্‌দালকে মারধর করতে থাকে। আবূ জান্‌দাল চিৎকার করে উঠলেন, "হে মুসলিমগণ, মুশরিকদের সাথে আমি কি আবার মক্কায় ফিরে যাব, যাতে তারা আমাকে আমার দ্বীনের কারণে জুলুম-নির্যাতন করতে পারে!"

নবি ﷺ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আবূ জান্‌দাল, ধৈর্য ধরো, তোমার এই কষ্টের বিনিময়ে তুমি আল্লাহর কাছে বিরাট প্রতিদান পাবে। তুমিসহ যত নিপীড়িত মুসলিম আছে, সবার জন্য আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয়ই প্রশস্ততা ও মুক্তির পথ বের করে দেবেন।"

উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) এসব দেখে এতটাই ক্রুদ্ধ হন যে, আবূ জান্‌দালকে বলেন তার বাবাকে খুন করে ফেলতে। তবে আবূ জান্‌দাল নিজেকে সংযত রেখে চুক্তির শর্তগুলো মেনে নেন।[৩৮৭]

• সন্ধি নিয়ে অসন্তোষ

শান্তিচুক্তি সম্পাদন শেষে নবি ﷺ সাহাবিদের বললেন, "উঠো, সবাই নিজ নিজ কুরবানি করে নাও।" কিন্তু কেউই উঠলেন না। পরপর তিন বার নবি ﷺ একই আদেশ

---

[৩৮৬] বুখারি, ২৭৩১, ২৭৩২।

[৩৮৭] বুখারি, ২৭৩১, ২৭৩২; ইবনু হিশাম, ৩/৩৩২।

দিলেন। তারপরও কারও মাঝে কোনও নড়াচড়া নেই। দুঃখভারাক্রান্ত মনে উম্মু সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে গিয়ে পুরো অবস্থা বর্ণনা করলেন তিনি। উম্মু সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহা) পরামর্শ দিলেন যে, নবি ﷺ যেন নিজে কুরবানি করে চুল কামিয়ে ফেলেন। আর কারও সাথে কোনও কথা না বলেন। নবিজি তা-ই করলেন। মুশরিকদের অন্তর্জ্বালা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবূ জাহলের কাছ থেকে হস্তগত হওয়া একটি উটও যবাই করেন তিনি। উটটির নাকে একটি রুপার নথ পরানো ছিল।

সাহাবিরা এবার সক্রিয় হয়ে উঠলেন। নিজ নিজ পশু কুরবানি শেষে মাথা মুণ্ডন করে নিলেন। কিন্তু সদ্য সম্পাদিত চুক্তিটির ভার কারও মন থেকে নামছেই না। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে কুরাইশরাই এ চুক্তি থেকে সব সুবিধা হাতিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রতি সমীহবশত কেউ মুখ ফুটে কিছু বলছেন না। অবস্থা এমন হয়েছিল যেন একে অপরকে হত্যা করে ফেলবে। সে সময় তাঁরা একটি গরু বা একটি উট সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছিল।[৩৮৮]

এই অসন্তোষের মূল কারণ দুটি। এক. উমরার নিয়তে এসে মক্কায় প্রবেশ করা ছাড়াই ফিরে যেতে হচ্ছে। দুই. উভয় পক্ষের মধ্যে সমতা রক্ষা না হওয়া। বিশেষ করে আগতদের ফিরিয়ে দেওয়া-না দেওয়ার ব্যাপারে রয়েছে অসম শর্ত। আবূ জান্দালের দুর্দশা তো সবাই নিজ চোখেই দেখলেন।

প্রথম কারণটির ব্যাপারে নবি ﷺ সবাইকে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে, পরের বছর ঠিকই উমরা পালন করতে পারবে সবাই। এটাই তাঁর সেই স্বপ্নের সঠিক বাস্তবায়ন।

দ্বিতীয় কারণটির ব্যাপারে বললেন যে, 'ইসলাম ত্যাগ করে আমাদের কেউ কুরাইশদের কাছে চলে গেলে, যেন আল্লাহ তাআলাই তাকে আমাদের থেকে দূর করে দিলেন। আর যারা কুরাইশদের থেকে পালিয়ে মদীনায় আসতে চাইবে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্যও কোনো-না-কোনো আশ্রয়স্থল তৈরি করে দেবেন।'[৩৮৯]

এটা কোনও ফাঁকা সান্ত্বনাবাণী ছিল না। আবিসিনিয়াতে তখনো কিছু মুসলিম রয়ে গিয়েছিলেন। তারা সবাই উক্ত চুক্তির আওতামুক্ত। সুতরাং মক্কা থেকে পালিয়ে আসা কেউ চাইলেই সেখানে চলে যেতে পারে।

নবি ﷺ এভাবে চুক্তির ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরেন। তারপরও চুক্তিটিকে

---

[৩৮৮] বুখারি, ২৭৩১।

[৩৮৯] মুসলিম, ১৭৮৪।

সার্বিকভাবে সবার কাছে কুরাইশদের জন্য সুবিধাজনক বলেই মনে হতে থাকে। উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তো জিজ্ঞেস করেই বসলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা সত্যের ওপর আর ওরা মিথ্যের ওপর, নয় কি?”

নবি ﷺ জানালেন, “হ্যাঁ, অবশ্যই।”

“আমাদের নিহত সাথিরা জান্নাতি আর ওদের নিহতরা জাহান্নামি, তাই না?”

“হ্যাঁ, কেন নয়!”

“তাহলে আমরা কেন আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে এই অপদস্থতা গ্রহণ করব? আর আমরা এই অবস্থাতেই ফিরে যাব অথচ এখনও আল্লাহ আমাদের ও তাদের মাঝে কোনও ফায়সালা করেননি।”

নবিজি জবাব দিলেন “ওহে খাত্তাবের ছেলে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। আর আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না। তিনিই আমার সাহায্যকারী এবং তিনি কখনোই আমাকে ধ্বংস করবেন না।”

এরপরও উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মন মানে না। তিনি আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে গেলেন এবং একই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তিনিও হুবহু একই উত্তর দিলেন। সেই সাথে আবূ বকর আরও যোগ করলেন, “মরণ অবধি রাসূলের হাত শক্ত করে ধরে রাখো। কেননা, আল্লাহর কসম! তিনি সত্যের ওপরই রয়েছেন।”

নবিজি ﷺ-এর মনোবল বাড়াতে ও মুসলিমদের সান্ত্বনা দিতে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾

“নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।”[৩৯০]

এই ওহি পাওয়ার পর উমরকে ডেকে পাঠান আল্লাহর রাসূল ﷺ। তাকে এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান। শুনে উমর বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল, এটাই কি সুস্পষ্ট বিজয়?”

নবি ﷺ বললেন, “হ্যাঁ।” এই দৃঢ় প্রত্যয়ন শুনে অবশেষে উমরের মন শান্ত হয়। কিন্তু এর আগে তিনি যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কথার পিঠে কথা বলে এসেছেন, সে কথা

---

[৩৯০] সূরা ফাতহ, ৪৮ : ১।

ভেবে পরে প্রচণ্ড অনুশোচনায় পুড়তে থাকেন তিনি। বেশি বেশি দান-সদাকা, নফল সিয়াম ও সালাত আদায় করে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।[৩১১]

• মুহাজির নারীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

হুদাইবিয়া চুক্তির কিছুদিন পরই কয়েকজন মুসলিম নারী এসে নবিজি ﷺ-এর কাছে আশ্রয় চান। মুশরিকরা যথারীতি তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করতে থাকে। তাদের দাবি ফিরিয়ে দিয়ে নবি ﷺ স্মরণ করিয়ে দেন যে, চুক্তিতে নারীদের ব্যাপারে কোনও কথাই উল্লেখ হয়নি। তারা চুক্তির বাইরে। আল্লাহ তাআলাও আদেশ নাযিল করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَآتُوْهُمْ مَّا أَنْفَقُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوْا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوْا مَا أَنْفَقُوْا ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

"হে বিশ্বাসীরা, কোনও বিশ্বাসী নারী হিজরত করে এলে তাদের যাচাই করে দেখো। আল্লাহ তো তাদের ঈমানের ব্যাপারে ভালো করেই জানেন। যদি নিশ্চিত হও যে, তারা ঈমানদার, তাহলে তাদের কুফফারদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না। কারণ, তারা এখন আর কাফিরদের বৈধ স্ত্রী নয়, কাফিররাও তাদের বৈধ স্বামী নয়। ওদের আগের স্বামীদের দেওয়া মোহর তাদের ফিরিয়ে দাও। আর তোমরা যদি মোহরের বিনিময়ে তাদের বিয়ে করে নাও, তাতেও দোষের কিছু নেই। অনুরূপভাবে, অবিশ্বাসী নারীদের সাথেও বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে ফেলো। ফিরিয়ে দিতে বলো পূর্বপ্রদত্ত মোহর। তোমাদের সাথে বিবাহবন্ধনে থাকাকালীন তারা যা খরচ করেছে, সেটিও ফেরত চাইতে বলো তাদের। এটি আল্লাহর সিদ্ধান্ত। তিনিই তোমাদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৩১২]

এভাবে মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে বিয়ে চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকে

---

[৩১১] বুখারি, ২৭৩১।

[৩১২] সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ১০।

হিজরত করে আসা মুসলিম নারীদের নবি ﷺ এই আয়াতের ভিত্তিতে যাচাই করতেন।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"হে নবি, মুমিন নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্য হবে না, তখন তাদের শপথ গ্রহণ করে নিন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সতত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩৯৩]

এই আসমানি বিধানগুলো মেনে চলার কথা প্রদান করলেই নবি ﷺ নারী মুহাজিরদের বাইআত কবুল করে নিতেন। পুরুষদের হাতে হাত রেখে বাইআত গ্রহণ করলেও নারীদের ক্ষেত্রে শুধু মৌখিক উচ্চারণ শোনা হয়। এই নারীদের আর মক্কায় কাফিরদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। তা ছাড়া মুসলিম পুরুষরাও তাদের কাফির স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেন এবং মুসলিম নারীরাও কাফির স্বামীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসেন।[৩৯৪]

• মুসলমানদের চুক্তিতে বানূ খুযাআ

চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বানূ খুযাআ মুসলিমদের সাথে সন্ধিবদ্ধ হয়। নবিজির বংশ বানূ হাশিমের সাথে বানূ খুযাআ গোত্রের মিত্রতা সেই জাহিলি যুগ থেকেই। ওদিকে খুযাআর প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র বানূ বকর। স্বভাবতই তারা কুরাইশদের পক্ষ নেয়। সেই সাথে নিজেদের অজান্তেই হয়ে ওঠে মুসলিমদের মক্কা বিজয়ের আসল অনুঘটক। তার বর্ণনা সামনে আসবে।

• আবূ বাসীর ﷺ-এর ঘটনা ও মক্কার দুর্বল মুসলিমদের মুক্তি

হিজরত করতে অপারগ মুসলিমদের ওপর কাফিরদের অত্যাচার কখনও থামেনি। এমনই এক অত্যাচারিত মুসলিম আবূ বাসীর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। মক্কা থেকে পালিয়ে

---

[৩৯৩] সূরা মুমতাহিনা, ৬০ : ১২।

[৩৯৪] বুখারি, ২৭৩১, ২৭৩২।

সোজা মদীনায় পৌঁছে যান। কুরাইশরা নবি ﷺ-এর কাছে দু'জন প্রতিনিধি পাঠিয়ে আবূ বাসীরকে ফেরত চায়। চুক্তির শর্তমতে নবিজি ফেরত পাঠাতে বাধ্য হন।

যুল হুলাইফায় এসে আবূ বাসীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের একজনকে কলে-কৌশলে হত্যা করে ফেলেন। অপরজন কোনোমতে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে মদীনায়। রাসূল ﷺ-এর নিকট অভিযোগ জানায়, "আমার সাথের জনকে সে মেরে ফেলেছে। আমাকেও হয়তো হত্যা করে ফেলবে।" এমন সময় আবূ বাসীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে এসে হাজির। নবিজির তিরস্কার শুনে এবং মুশরিকদের হাতে বন্দি হওয়ার ভয়ে এখান থেকেও পালিয়ে যান তিনি। আশ্রয় নেন উপকূলের কাছে একটি জায়গায়।

খবর পেয়ে আবূ জান্দাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-ও ছুটে এসে যোগ দেন আবূ বাসীরের সাথে। এভাবে একেকজন মুসলিম মক্কা থেকে পালিয়ে যান, আর এসে যোগ দিতে থাকেন এই জায়গায়। এদের হাতেই সেখানে গড়ে ওঠে মুসলিমদের আরেকটি ঘাঁটি। এভাবে শক্তি সঞ্চয় করে মাক্কি মুশরিকদের জন্য নতুন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ান তারা। কুরাইশের সিরিয়াগামী প্রত্যেকটা কাফেলাকে আক্রমণ করে তাদের মালপত্র ছিনিয়ে নিতে থাকেন তারা, বন্দি করতে থাকেন কাফেলার সদস্যদের।

ঘরের কাছে মুসলিমদের শক্ত দুর্গ গড়ে উঠতে দেখে কুরাইশদের হাঁটু কেঁপে ওঠে। নবিজি ﷺ-এর কাছে অনুনয় করে তিনি যেন এই দলটিকে মদীনায় ফিরিয়ে নেন। বিনিময়ে চুক্তির একটি শর্ত বাতিল করে দেয় তারা। এখন থেকে মদীনায় পালিয়ে যাওয়া আর কোনও মুসলিম মক্কায় ফিরে আসতে বাধ্য নয়। রাসূল ﷺ আবূ বাসীরের ঘাঁটিকে মদীনায় চলে আসতে বললে খুশিমনে আদেশ পালন করেন তারা।[৩৯৫]

• সন্ধি-চুক্তির প্রভাব

হুদাইবিয়া চুক্তির ফলে নিশ্চিত হওয়া শান্ত পরিবেশে চারদিকে প্রবলবেগে ছড়িয়ে পড়তে থাকে ইসলামের বার্তা। গত উনিশ বছরে যতজন মুসলিম হয়েছিল, তার চেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ এই দুই বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কারণ, এখন কোনও নিরাপত্তা-হুমকি ছাড়াই মুসলিমরা যেকোনও আরব গোত্রের সাথে মেলামেশা করতে পারে। এ-সময়ই আমর ইবনুল আস, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও উসমান ইবনু তালহা (রদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মতো গণ্যমান্য কুরাইশগণ রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণের সাক্ষ্য দেন। নিজেদের জীবন, সম্পদ আর ক্ষমতা অর্পণ করেন

[৩৯৫] বুখারি, ২৭৩১, ২৭৩২; ইবনু হিশাম, ২/৩০৮-৩২২; যাদুল মাআদ, ২/১২২-১২৭; ইবনুল জাওযি, তারীখু উমর, ৩৯-৪০।

আল্লাহর পথে। নবিজি ﷺ তাদের ইসলাম কবুলের ব্যাপারে বলেন, "মক্কা তার হৃদয়ের মণিকোঠাগুলো আমাদের কাছে সঁপে দিয়েছে।"[৩৯৬]

রাজা-বাদশা ও প্রশাসকদের প্রতি নবিজি ﷺ-এর চিঠিপত্র

হুদাইবিয়া চুক্তির পর থেকে শুধু সাধারণ আম-জনতা নয়, রাজা-বাদশা ও প্রভাবশালী নেতাদের কাছেও ইসলাম প্রচার নির্বিঘ্ন কণ্টকমুক্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের কাছে ইসলামের প্রতি আহ্বান করে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে চিঠি লেখেন আল্লাহর রাসূল ﷺ।

• আবিসিনিয়ার রাজা আসহামার প্রতি চিঠি

আবিসিনিয়ার খ্রিষ্টান রাজা আসহামা ইবনু আবজারের কাছে নবি ﷺ লিখেছেন:

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে আবিসিনিয়ার রাজা আসহামার প্রতি।

যারা সঠিক পথের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই, তিনি অদ্বিতীয় ও অংশীদারবিহীন, তিনি না স্ত্রী গ্রহণ করেছেন, না সন্তান। আরও সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও বার্তাবাহক—তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহর রাসূল হিসেবে আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, তাহলে শান্তি লাভ করবেন এবং নিরাপদ থাকবেন।

'হে কিতাবধারী সম্প্রদায়, এসো সেই বিষয়ে দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে অভিন্ন যে; আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করব না, কোনোকিছুকে তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।' কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলুন, 'সাক্ষী থেকো, আমরা মুসলিম।'[৩৯৭]

যদি আপনি এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আপনার অধীনস্থ জনগণের পাপের বোঝা আপনাকেও বইতে হবে।"[৩৯৮]

---

[৩৯৬] আলবানি, ফিকহুস সীরাহ, ২২১।

[৩৯৭] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৬৪।

[৩৯৮] বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ২/৩০৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ২/৬২৩।

আমর ইবনু উমাইয়া দামরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) এই চিঠি বহন করেন। আসহামা চিঠিটি নিয়ে ভক্তিভরে চোখে স্পর্শ করান। চিঠি পড়া শেষে জা'ফার ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর তত্ত্বাবধানে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি। ফিরতি চিঠিতে নবিজি ﷺ-এর প্রতি আনুগত্য ও নিজের ইসলাম কবুলের কথা জানান। নবিজি ﷺ-এর সাথে উম্মু হাবীবা বিনতু আবী সুফ্‌ইয়ান (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিয়েও দেন তিনি। নবিজির পক্ষ থেকে আসহামা চার শ দীনার মোহর পরিশোধ করেন। উম্মু হাবীবাসহ আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত সকল মুসলিমকে দুটি নৌকায় করে মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তত্ত্বাবধানে থাকেন আমর ইবনু উমাইয়া দামরি (রদিয়াল্লাহু আনহু)। নবি ﷺ খাইবারে থাকাকালে আবিসিনিয়ার মুহাজিররা মদীনা এসে পৌঁছান।[৩৯৯]

নবম হিজরি সনের রজব মাসে রাজা আসহামা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রয়াণ ঘটে। সেদিনই সাহাবিদের কাছে মৃত্যুসংবাদটি ঘোষণা করে তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়ান রাসূল ﷺ।[৪০০]

আসহামার পরবর্তী রাজাকেও ইসলামের দিকে আহ্বান করে নবি ﷺ চিঠি লেখেন। তবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কি না, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।[৪০১]

• আলেকজান্দ্রিয়া ও মিসরের সম্রাট মুকাওকিসের প্রতি চিঠি

কপ্টিক খ্রিষ্টান সম্রাট মুকাওকিসের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে নবি ﷺ বলেন,

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে কপ্টের শাসক মুকাওকিসের প্রতি।

হিদায়াতের অনুসারীদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম কবুল করুন, তাহলে শান্তি লাভ করবেন এবং নিরাপদ থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি আল্লাহর কথা প্রত্যাখ্যান করেন, তবে কপ্টিকদের সবার পাপের বোঝা বইতে হবে আপনাকেও।

'হে কিতাবধারী সম্প্রদায়, এসো সেই বিষয়ে দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে অভিন্ন যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা করব না, কোনোকিছুকে তাঁর

---

[৩৯৯] ইবনু হিশাম, ২/৩৫৯।

[৪০০] বুখারি, ৩৮৭৭; মুসলিম, ৯৫১।

[৪০১] মুসলিম, ১৭৭৪।

সাথে শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।' কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলুন, 'সাক্ষী থেকো, আমরা মুসলিম।'[৪০২]

হাতিব ইবনু আবী বালতাআ (রদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন এ চিঠির বাহক। মুকাওকিসের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তার সমীহ আদায় করে নেন তিনি। মুকাওকিস চিঠিটিকে সসম্মানে একটি গজদন্তনির্মিত বাক্সে রাখেন। নিজের সিলমোহরসহ সংরক্ষণ করেন এটিকে। নবিজি ﷺ-এর প্রতি জবাবে লেখেন যে, তিনিও একজন নবির আগমনের ব্যাপারে বিশ্বাস করেন। তবে তার ধারণা ছিল যে, তিনি আসবেন সিরিয়া থেকে।

নিজে ইসলাম গ্রহণ না করলেও রাসূল ﷺ-এর জন্য অনেক উপঢৌকন পাঠান মুকাওকিস। তার মাঝে ছিলেন দু'জন দাসী মারিয়া ও সিরীন। কপ্টিকদের মাঝে এরা দু'জন খুবই সম্মানিত ছিল। নবি ﷺ মারিয়াকে নিজের কাছেই রাখেন। যার গর্ভে নবিপুত্র ইবরাহীম (রদিয়াল্লহু আনহু) জন্ম নেন। আর সিরীনকে দেন হাসসান ইবনু সাবিত (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অধিকারে। এ ছাড়া কিছু কাপড় ও দুলদুল নামক একটি গাধাও ছিল সে উপঢৌকনগুলোর মাঝে।[৪০৩]

• পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের প্রতি চিঠি

নবি ﷺ পারস্যের সম্রাটকে উদ্দেশ্য করে যে চিঠি লেখেন, তা হলো:

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্য-অধিপতি খসরুর প্রতি।

যারা সঠিক পথের অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই, তিনি অদ্বিতীয় ও অংশীদারবিহীন এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও বার্তাবাহক—তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ, আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত। জীবিতদের সতর্ক করা এবং অবিশ্বাসীদের চোখে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা আমার কর্তব্য। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদ হয়ে যাবেন। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে সকল অগ্নিপূজারির পাপের বোঝা আপনাকেও বহন করতে হবে।"[৪০৪]

আবদুল্লাহ ইবনু হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এ চিঠিটি বাহরাইনের প্রশাসকের কাছে

---

[৪০২] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৬৪; যাদুল মাআদ, ৩/৬১।

[৪০৩] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ৩/৬১।

[৪০৪] যাদুল মাআদ, ৩/৬৮৮।

নিয়ে যান। তিনি তা পৌঁছে দেন খসরুর দরবারে। চিঠিটি তাকে পড়ে শোনানোমাত্রই খসরু তা ছিঁড়ে ফেলে বলে, "আমার প্রজাদের মধ্য থেকে তুচ্ছ এক দাস আমার নামের আগে নিজের নাম লেখে!!"[৪০৪]

চিঠি ছিঁড়ে ফেলার ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে পারার পর নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ ও তার সাম্রাজ্যকে এভাবেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবেন।" নবিজি ﷺ-এর কথাই সত্যি হয়। অল্প কিছুদিন পরই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রোমান সাম্রাজ্যের হাতে তিক্ত এক পরাজয়ের শিকার হয় পারস্য। এ ঘটনার পর খসরুর ছেলে শীরাওয়াই বিদ্রোহ করে বসে। বাবাকে খুন করে নিজে আরোহণ করে সিংহাসনে। এরপর থেকে একের পর এক বিভেদ আর অন্তঃকলহে পর্যদুস্ত হতে থাকে পারস্য সাম্রাজ্য। অবশেষে উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাতকালে এ সাম্রাজ্যটি চূড়ান্তভাবে মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়।

• রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি চিঠি

তার উদ্দেশে নবি ﷺ লিখেছেন,

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমানাধিপতি হিরাক্লিয়াসের প্রতি।

হিদায়াতের অনুসারীরা সৌভাগ্যবান। আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ করে নিন, নিরাপদ হয়ে যাবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি তাঁর বার্তা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে প্রজা ও অনুসারীদের পাপের ভার আপনাকেও বহন করতে হবে।

'হে কিতাবধারী সম্প্রদায়, এসো সেই বিষয়ে দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে অভিন্ন যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা করব না, কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে পালনকর্তা বানাব না।' কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলুন, 'সাক্ষী থেকো, আমরা মুসলিম।'[৪০৬]

দিহইয়া ইবনু খলীফা কালবি (রদিয়াল্লাহু আনহু) এই চিঠিটি বুসরার প্রশাসকের হাতে পৌঁছে দেন। তার কাছ থেকে সেটি যায় হিরাক্লিয়াসের কাছে। হিরাক্লিয়াস সিরিয়ার

[৪০৫] বুখারি, ৬৪।

[৪০৬] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৬৪; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ৩/৬৮৮।

হিমস থেকে পায়ে হেঁটে তীর্থস্থান জেরুসালেম এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, পারস্যের ওপর রোমের বিজয় উপলক্ষ্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। চিঠিটি হাতে পেয়েই তিনি এমন কারও সন্ধান করার আদেশ দেন, যে সরাসরি রাসূল ﷺ-কে চেনে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে আবূ সুফইয়ানের নেতৃত্বাধীন একটি কুরাইশ কাফেলা তখন সে এলাকায়। তাদেরই ডেকে আনা হয় হিরাক্লিয়াসের রাজদরবারে। রোম-সম্রাট জানতে চান, "আপনাদের মধ্যে আত্মীয়তার দিক দিয়ে মুহাম্মাদের সবচেয়ে নিকটজন কে?"

আবূ সুফ্ইয়ানকে দেখিয়ে দিল কাফেলার লোকেরা। তাকে সামনে এগিয়ে এনে আলাদা আসনে বসানো হলো। বাকি কুরাইশদের হিরাক্লিয়াস বললেন, "আমি তাকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব। যদি সে কোনও মিথ্যা তথ্য দেয়, তাহলে আপনারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবেন।" নড়েচড়ে বসলেন আবূ সুফ্ইয়ান। চাইলেও মিথ্যে বলা যাবে না এখন। হিরাক্লিয়াস ও আবূ সুফইয়ানের মধ্যকার কথোপকথনটি ছিল এমন:

হিরাক্লিয়াস : "তাঁর বংশ সম্পর্কে বলুন।"

আবূ সুফ্ইয়ান : "তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান।"

হিরাক্লিয়াস : "তাঁর মতো এই দাবি কি তাঁর আগে আপনাদের মধ্যে আর কেউ করেছিল?"

আবূ সুফ্ইয়ান : "জি না।"

হিরাক্লিয়াস : "তাঁর পরিবারের কেউ রাজা-বাদশা ছিলেন?"

আবূ সুফ্ইয়ান : "না।"

হিরাক্লিয়াস : "তাঁর অনুসারী কারা? দরিদ্র এবং দুর্বলেরা, নাকি সম্ভ্রান্ত লোকেরা?"

আবূ সুফ্ইয়ান : "তাদের সকলেই দরিদ্র এবং দুর্বল।"

হিরাক্লিয়াস : "তাঁর অনুসারী-সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, না কমছে?"

আবূ সুফ্ইয়ান : "বেড়েই চলেছে।"

হিরাক্লিয়াস : "তাঁর ধর্মগ্রহণকারীরা কি তাঁর প্রতি ঘৃণাবশত তাঁকে ছেড়ে চলে যায়?"

আবূ সুফ্ইয়ান : "জি না।"

হিরাক্লিয়াস : "নিজেকে নবি দাবি করার আগে কখনও কি তাঁকে মিথ্যে বলতে শুনেছেন?"

আবূ সুফ্ইয়ান : "জি না।"

হিরাক্লিয়াস : "তিনি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন?"

আবূ সুফ্ইয়ান : "এখন পর্যন্ত করেননি—এখানে একটি সংশয়পূর্ণ কথা ঢুকিয়ে দেওয়ার সুযোগ পায় আবূ সুফ্ইয়ান, বলেন—আসলে আমাদের সাথে তাঁর একটি শান্তিচুক্তি কার্যকর আছে বর্তমানে। ভবিষ্যতে তিনি কী করবেন, বলতে পারছি না।"

হিরাক্লিয়াস : "আচ্ছা। কখনও যুদ্ধ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে?"

আবূ সুফ্ইয়ান : "জি।"

হিরাক্লিয়াস : "ফলাফল?"

আবূ সুফ্ইয়ান : "কখনও আমরা জিতেছি, কখনও তিনি জিতেছেন।"

হিরাক্লিয়াস : "তিনি আপনাদের কী কী শিক্ষা দেন?"

আবূ সুফ্ইয়ান : "তিনি আমাদের এক আল্লাহ্‌র আরাধনা করতে বলেন। তাঁর সাথে যেন অন্যকিছুকে শরীক করতে নিষেধ করেন। আমাদের পূর্বপুরুষরা যা কিছুর উপাসনা করতেন, সেগুলোও প্রত্যাখ্যান করতে বলেন। আরও আদেশ করেন সালাত আদায় করতে, সত্যবাদী ও সৎ হতে এবং আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করতে।"

সব শুনে হিরাক্লিয়াস উপসংহার টানলেন,

"আপনি বললেন যে, তিনি সম্ভ্রান্ততম বংশের সদস্য। সকল নবিই সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হয়ে থাকেন। তাঁর আগে আর কেউ অনুরূপ দাবি করেনি আপনাদের ওখানে। যদি করতেন, তাহলে বলতাম তিনি আগেরজনকে অনুসরণ করছেন। তাঁর বংশে আগে কেউ রাজাও ছিলেন না। থাকলে বলতাম, তিনি হারানো প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করতে চাইছেন। বললেন যে, তাঁকে কখনও মিথ্যে বলতেও শোনেননি। মানুষের সাথে সত্যবাদী হয়ে ঈশ্বরের ব্যাপারে মিথ্যে বলা আসলেই অসম্ভব। আবার এটিও ঠিক যে, শুরুতে শুধু নির্বল ও দরিদ্ররাই নবির অনুসরণ করে থাকেন। তাঁর অনুসারী দিন দিন বেড়েই চলেছে। ঈমানের ব্যাপারটি এমনই। সংখ্যাবৃদ্ধি করতে করতেই একসময়

এটি বিজয়ী শক্তিতে পরিণত হয়। আর একবার অন্তরে ঈমান প্রোথিত হলে তা আর কখনও উপড়ানো যায় না। এ কারণেই তাঁকে ত্যাগ করে তাঁর অনুসারীরা চলে যান না। তিনি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি, তাও বলেছেন। বাস্তবিকই নবিগণ কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। আরও বলেছেন যে, তিনি এক আল্লাহর আরাধনা করতে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে, মূর্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে, সালাত আদায় করতে, সত্য ও সততার চর্চা করতে আদেশ দেন।

যদি তা-ই হয়ে থাকে, তবে শীঘ্রই তিনি আমার পায়ের নিচের এ মাটিও জয় করে নেবেন। একজন নবি আবির্ভূত হবেন, তা আমিও জানতাম। কিন্তু তিনি যে আপনাদের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন, তা আমার কল্পনাতেও আসেনি। আমি নিশ্চিতভাবে যদি তাঁর নিকট পৌঁছতে পারতাম তাহলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতাম। আর তাঁর কাছে থাকতে পারলে তাঁর পদদ্বয় জল দিয়ে ধুয়ে দিতাম।"

এই বলে হিরাক্লিয়াস আবারও নবিজি ﷺ-এর চিঠিটি আনিয়ে জোরে জোরে পড়ে শোনান। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বার্তা শুনে শ্রোতাদের মাঝে বিস্ময় ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিরাক্লিয়াস আবূ সুফ্‌ইয়ান ও তার সহচরদের বিদায় দিয়ে দেন। বাইরে এসে আবূ সুফ্‌ইয়ান নিজে নিজে বলতে থাকেন, "আবূ কাবশার পুত্রের প্রতিপত্তি এত দূর ছড়িয়ে পড়েছে! বানূ আসফার (রোমান) সম্রাটও দেখি তাঁকে ভয় করছে!" দিনে দিনে আবূ সুফ্‌ইয়ান উপলব্ধি করতে থাকেন যে, বিরোধীদের শত চেষ্টার পরও ইসলাম বিজয়ী হবে। এভাবে একসময় তিনি নিজেও ইসলাম গ্রহণের নিয়ামাত লাভ করেন।

রাসূল ﷺ-এর বার্তায় হিরাক্লিয়াস এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, পত্রবাহক দিহইয়া ইবনু খলীফা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বিপুল অর্থ ও দামি পোশাক উপঢৌকন দেন। তারপর তিনি হিমসে ফিরে এসে সভাসদদের ডাকিয়ে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। সবার উদ্দেশে বলেন, "দেখুন! আপনাদের এই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা ও সঠিক পথ পেতে চাইলে এই নবির অনুসরণ করুন।" সমবেত সভাসদরা খেপে গিয়ে পাগলা গাধার মতো দরজার দিকে ছুটে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে তা বন্ধ।

ইসলামের বার্তার বিরুদ্ধে সভাসদদের এই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখে আবার তাদের ডাক দেন হিরাক্লিয়াস এবং বলেন, "আসলে আপনারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসে কতটা দৃঢ় তা পরখ করার জন্যই এই কথাটি বলেছিলাম। আমি আপনাদের এই দৃঢ়তা ও

ধার্মিকতা দেখে সন্তুষ্ট।" এ কথা শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সবাই।[৪০৭]

হিরাক্লিয়াস স্পষ্টতই নবি ﷺ-এর বার্তার সত্যতা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু মসনদের মোহ প্রবলতর হয়ে ওঠায় তার আর ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি। আল্লাহর দৃষ্টিতে তাই হিরাক্লিয়াস নিজের ও প্রজাদের পথভ্রষ্টতার জন্য দায়ী আসামি। যেমন রাসূল ﷺ তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

কাজ শেষে দিহইয়া ইবনু খলীফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) 'হিসমা' হয়ে মদীনায় ফিরছিলেন। ওই জায়গায় বানূ জুযাম তাকে আক্রমণ করে সাথের সব উপঢৌকন ছিনিয়ে নেয়। প্রাণ নিয়ে মদীনায় পালিয়ে এসে তিনি নবিজি ﷺ-কে পুরা ঘটনা জানান।

নবি ﷺ ঘটনা শুনে যাইদ ইবনু হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে পাঁচ শ জনের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। বানূ জুযামের ওই দুষ্কৃতকারী দলটিকে আক্রমণ করে অনেককে হত্যা করেন যাইদ ও তার বাহিনী। বন্দি করেন প্রায় শ-খানেক নারী ও শিশু। এক হাজার উট এবং পাঁচ শ ছাগলও হস্তগত হয় গনীমাত হিসেবে।

এ ঘটনার পর বানূ জুযাম গোত্রের এক নেতা যাইদ ইবনু রিফাআ জুযামি ছুটে আসেন মদীনায়। তিনিসহ তার গোত্রের কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত দিহইয়াকে সাহায্যও করেছিলেন তিনি। তাই নবি ﷺ তার সাথে সমস্ত গনীমাত ও বন্দিকে ফিরিয়ে দেন।[৪০৮]

• হারিস ইবনু আবী শিম্‌র গাসসানির প্রতি চিঠি

নবিজি ﷺ এর পরের চিঠিটি শুজা' ইবনু ওয়াহাব আসাদি (রদিয়াল্লাহু আনহু) নিয়ে যান দামেশকে। হিরাক্লিয়াসের প্রতিনিধি হারিস ইবনু আবী শিম্‌র গাসসানি সেখানকার প্রশাসক ছিলেন।

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হারিস ইবনু আবী শিম্‌র-এর নিকট।

যারা সত্যের অনুসারী এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী তাদের ওপর শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি আপনাকে আহ্বান করছি যে, আপনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনুন, যিনি একক,

---

[৪০৭] বুখারি, ৭; মুসলিম, ১৭৭৩।

[৪০৮] ইবনুল কাইয়িম, ২/১২২।

অংশীদারবিহীন। তাহলে আপনার রাজত্ব টিকে থাকবে।"[৪০৯]

হারিসের জবাব ছিল ক্ষোভে ভরা। চিঠিটি ছুড়ে ফেলে তিনি বলেন, "কার এত বড় সাহস, আমার রাজ্য দখল করতে চায়?" শুজা'কে বলেন যে, তিনি যেন নবিজিকে আসন্ন এক যুদ্ধের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। ওপরমহলের কাছে তিনি অনুমতি চান নবিজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। কিন্তু হিরাক্লিয়াস সে অনুরোধ নাকচ করে দেন। ফলে হারিস আগের যুদ্ধংদেহী অবস্থান থেকে সরে আসেন। সেই সাথে অর্থ ও দামি কাপড় উপঢৌকন দিয়ে শুজা' ইবনু ওয়াহাবকে সৌজন্য সহকারে ফিরিয়ে দেন।[৪১০]

• বুসরার আমীরের প্রতি চিঠি

এরপর বুসরার প্রশাসককে ইসলামের দিকে আহ্বান করে চিঠি লেখেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। হারিস ইবনু উমাইর আযদি (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেটি প্রাপকের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ জর্দানের 'মূতা' অঞ্চলে আসতেই শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানি তার শিরশ্ছেদ করে তাকে হত্যা করে। হারিস ইবনু উমাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-ই একমাত্র সাহাবি, যিনি চিঠিবহনের কাজ করতে গিয়ে শহীদ হন। হারিসের মৃত্যুতে নবি ﷺ অত্যন্ত ব্যথিত হন। এমনকি পরে তিনি শুরাহবীলের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেন। যা 'মূতার যুদ্ধ' নামে পরিচিতি পায়।

• ইয়ামামা-অধিপতি হাওযা ইবনু আলির প্রতি চিঠি

তাকে উদ্দেশ্য করে নবি ﷺ চিঠিতে লেখেন,

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাওযা ইবনু আলির প্রতি।

হিদায়াতের অনুসারীদের ওপর শান্তি অবতীর্ণ হোক। জেনে রাখুন! উট আর ঘোড়া যত জায়গায় পৌঁছাতে সক্ষম, আমার দ্বীন সেই সবক'টি জায়গায় প্রবল হবে। ইসলাম গ্রহণ করুন, তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবেন। আপনার অধিকারে যা আছে, তার কোনও ক্ষতি করব না, তা আপনার অধীনেই থাকবে।"[৪১১]

সুলাইত ইবনু আমর আমিরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) এ চিঠিটি বহন করেন। সসম্মানে চিঠিটি গ্রহণ করে তাকে উপঢৌকন দেন হাওযা। জবাবে লেখেন,

---

[৪০৯] যাদুল মাআদ, ৩/৬৯৭।

[৪১০] যাদুল মাআদ, ৩/৬৯৮।

[৪১১] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ৩/৬৩।

"আপনার আহ্বায়িত আদর্শের প্রশংসায় কীই-বা বলতে পারি? আমি নিজ জাতির কবি ও কথক। পুরো আরবজুড়ে আমার খ্যাতি বিস্তৃত। আপনার রাজ্যের একাংশের দায়িত্ব আমাকে দিন, আমি আপনার অনুসারী হয়ে যাব।"

চিঠিটি গ্রহণ করে নবি ﷺ মন্তব্য করেন, "সে চাওয়া মতো এক টুকরো ভূমিও আমি তাকে দেবো না। সে নিজেও ধ্বংস হবে এবং যা তার অধীনে আছে তাও সমূলে ধ্বংস হবে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা বিজয়ের পর সেখান থেকে ফিরে আসেন তখন হাওয়া মারা যায়।[৪১২]

• বাহরাইনের প্রশাসক মুনযির ইবনু সাওয়া'র প্রতি চিঠি

আলা ইবনুল হাদরামি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে করে নবি ﷺ আরেকটি চিঠি পাঠান বাহরাইনের প্রশাসক মুনযির ইবনু সাওয়াকে। তাকেও অনুরূপভাবে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। এতে মুনযির ও তার কয়েকজন প্রজা ইসলাম কবুল করে নেন। তবে অধিকাংশই ইয়াহূদি ধর্ম ও অগ্নিপূজার ধর্মে অটল থাকে। মুনযির ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নবি ﷺ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা। তাই তাঁর কাছেই জানতে চান নিজ শাসনাধীনে বসবাসরত অমুসলিমদের সাথে তাঁর আচরণবিধি সম্পর্কে। নবি ﷺ উত্তরে লেখেন যে, ইয়াহূদি ও অগ্নিপূজকদের কাছ থেকে জিযইয়া আদায় করা হবে। তা ছাড়া কারও অবস্থানের অনুমতি নেই।[৪১৩]

• ওমানের শাসক জাইফার ও তার ভাইয়ের প্রতি চিঠি

ওমানের শাসক ছিলেন যৌথভাবে দুই ভাই আব্‌দ এবং জাইফার। তাদের পিতার নাম ছিল জুলানদার। নবিজি ﷺ-এর সব চিঠি পাঠানো হয়েছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির ঠিক পরপর। শুধু এই চিঠিটি পাঠানো হয় মক্কা বিজয়ের পর। বাহক ছিলেন আমর ইবনুল আস (রদিয়াল্লাহু আনহু)। এ চিঠিতে নবি ﷺ ওই দুই ভাইকে জানান যে, তাঁর দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে সত্যের সাথে পরিচিত করানো এবং কুফরের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা। তাদের আরও সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, তারা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করলে দুনিয়া-আখিরাত উভয় স্থানেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, ইসলাম সর্বত্রই বিজয়ী হবে। ফলে তারা তাদের রাজত্বও হারাবে।[৪১৪]

---

[৪১২] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ৩/৬৩।

[৪১৩] যাদুল মাআদ, ৩/৬১-৬২।

[৪১৪] যাদুল মাআদ, ৩/৯২।

পত্রবাহক আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে প্রথমে আব্দ ইবনু জুলানদারের সাক্ষাৎ হয়। দু'জনের মাঝে হয় দীর্ঘ কথোপকথন।

আব্দ জিজ্ঞেস করেন "আপনারা কিসের আহ্বান জানান?"

আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) জবাব দেন, "আমরা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকি, যিনি অদ্বিতীয়, সমকক্ষবিহীন। আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করতে বলি এবং এই সাক্ষ্য দিতে বলি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

"আল্লাহর রাসূল আপনাদের কিসের আদেশ করেন?"

"তিনি আমাদের আল্লাহর আনুগত্য করতে আদেশ করেন। তাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ করেন। সৎকাজ করতে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতেও আদেশ করেন। আর নিষেধ করেন অপচয়, ব্যভিচার, মদ্যপান এবং পাথর, মূর্তি ও ক্রুশের পূজা করা থেকে।"

"বাহ! এগুলো কত চমৎকার বিষয় যেগুলোর প্রতি তিনি আহ্বান করেন। আমার ভাইও যদি রাজি হয়ে যেতেন, তাহলে আমরা একসাথে গিয়ে মুহাম্মাদের কাছে আনুগত্য স্বীকার করতাম, আর তাঁর নুবুওয়াতের সত্যতার সাক্ষ্য দিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার ভাই মসনদের মোহে আবিষ্ট। অন্যের আদেশ তিনি মানতে চান না।"

আমর বলেন, "আপনার ভাই যদি ইসলাম গ্রহণ করে নেন, তাহলে নবি ﷺ আপনাদের রাজ্য অক্ষত রাখবেন। তবে ধনীদের থেকে যাকাত হিসেবে কিছু সম্পদ নিয়ে দরিদ্র ও অভাবীদের দান করবেন।"

"খুব সুন্দর। কিন্তু যাকাত কী?"

আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) যাকাতের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু গবাদি পশুও যাকাতের অন্তর্ভুক্ত জানার পর আব্দ শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, "আমার সম্প্রদায় এটা মানবে কি না, কে জানে!"

তারপর তিনি আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিজের সহোদর ভাই জাইফারের কাছে নিয়ে যান। তিনি চিঠিটি তাকে দেন। জাইফার, আমরকে জিজ্ঞেস করেন, 'কুরাইশরা কী করেছে?'

আমর জবাবে বলেন, "তাদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। যদি আপনিও ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে নিরাপদ হয়ে যাবেন। নাহলে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হবে

আপনার রাজত্ব, ধ্বংস করে দেওয়া হবে এর সমস্ত সম্পদ।"

জাইফার ভাবনা-চিন্তার জন্য একদিন সময় চান। পরদিন তিনি ইচ্ছে করে সামরিক শক্তির একটি প্রদর্শনী করেন। কিন্তু গোপনে পরে ভাইয়ের সাথে সলা-পরামর্শ করেন। আলাপ-আলোচনা করার পর অবশেষে ইসলাম কবুল করেন দু'জনেই। তারা আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে যাকাত সংগ্রহের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেন। যারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল, তাদের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্যও করেন তারা।[৪১৫]

যী কারাদ বা গাবার যুদ্ধ (মুহাররম, ৭ম হিজরি)

হুদাইবিয়ার চুক্তির পর কুরাইশদের শত্রুতার গোদ সেরে যায়। কিন্তু বিষফোঁড়া হয়ে টিকে থাকে ইয়াহূদি গোত্রগুলো। অহরহই তারা চুক্তি ভাঙতে থাকে। অন্যান্য গোত্রকেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হওয়ার জন্য ফুসলাতে থাকে। গোটা খাইবার এবং এর উত্তর দিকের এলাকাটি তাদের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখান থেকেই পরিচালিত হতে থাকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সকল ষড়যন্ত্র। নবি ﷺ খাইবার আক্রমণ করার ঠিক তিন দিন আগে ছোট আরেকটি সংঘর্ষ বাধে। এটি গাবার যুদ্ধ নামে পরিচিত। সময়টি ছিল সপ্তম হিজরি সনের মুহাররম মাস।

উহুদের কাছে গাবা চারণভূমিতে রাসূল ﷺ তাঁর উটগুলো পাঠান। নবিই ﷺ-এর দাস রাবাহ এবং একজন রাখাল সাথে ছিল। আবূ তালহার ঘোড়ার পিঠে করে তাদের সাথে সালামা ইবনুল আকওয়া'ও ছিলেন। রদিয়াল্লাহু আনহুম।

এমন সময় অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে আবদুর রহমান ইবনু উয়াইনা ফাযারি ও তার গুন্ডারা। রাখালকে হত্যা করে সবগুলো উট ছিনিয়ে নিয়ে যায় তারা। সালামা ইবনুল আকওয়া' ঘোড়াটি রাবাহকে দিয়ে মদীনায় দ্রুত সংবাদ পাঠান এবং নিজে একটি পাহাড়ে উঠে মদীনার দিকে ফিরে খুব উঁচু স্বরে তিনবার বিপদসংকেত দেন, "ইয়া সাবাহা!" তারপর চোরদের তির মারতে মারতে ধাওয়া করলেন। দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে একা হওয়া সত্ত্বেও গাইতে লাগলেন সামরিক সংগীত:

"ধর এটা! আমি হলাম পুত্র আকওয়া'র!

আজ আমার হাত থেকে তোদের নেই নিস্তার।"

সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) একটার পর একটা তির ছুড়ছিলেন। 'ধর এটা' বলে

---

[৪১৫] যাদুল মাআদ, ৩/৬২৬৩।

তিনি অবিরাম ধাবিত সে তিরগুলোকেই বুঝিয়েছেন। যখন কেউ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পাল্টা ধাওয়া করতে আসে তখন তিনি গাছের আড়ালে গিয়ে সেখান থেকে তির ছুড়ে মারেন। একসময় তারা পর্বতগিরির সংকীর্ণ রাস্তায় ঢুকে গেলে পাহাড়ের চূড়ার উঠে তিনি কয়েকটি পাথর গড়িয়ে তাদের গায়ে ফেলার ব্যবস্থা করেন।

সালামা ইবনুল আকওয়া' তাদের ধাওয়া করতেই থাকেন ফলে একসময় তারা সবগুলো উট ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সালামার তির-বর্ষণ তাতে থামে না। বোঝা হালকা করতে নিজেদের ত্রিশটি কাপড় এবং ত্রিশটি বর্শাও ফেলে দেয় তারা। সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) সবগুলোর ওপর ছোট ছোট পাথর চাপা দিয়ে চিহ্নিত করে রাখেন, যাতে পরে এসে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। তারপর আবারও ধাওয়া দেন দুর্বৃত্তদের।

চোরেরা এরপর একটি পর্বতগিরির সংকীর্ণ একটি বাঁকে বসে পড়ে। আর সালামা অপেক্ষায় থাকেন পাহাড়ের চূড়ায়। তাকে দেখতে পেয়ে চার জন এগিয়ে আসতে থাকে তাঁর দিকে। সালামা হাঁক ছাড়েন, "তোরা জানিস আমি কে? আমি সালামা ইবনুল আকওয়া'। তোদের সবক'টাকে আমি সহজেই ধরে ফেলতে পারি, তা যত জোরেই দৌড়াস না কেন। কিন্তু তোরা কখনও আমাকে ধরতে পারবি না।" হুমকি শুনে আগুয়ান চোরগুলো পিছিয়ে যায়।

একটু পরেই সালামা দেখতে পান দূরে গাছের আড়াল থেকে নবিজি ﷺ-এর পাঠানো অশ্বারোহীরা দৌড়ে বেরিয়ে আসছেন। আখরাম, আবূ কাতাদা, মিকদাদ (রদিয়াল্লাহু আনহুম) সবাইকে একে একে দেখা গেল। এবার আখরামের সাথে মুশরিক আবদুর রহমানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধে। আবদুর রহমানের ঘোড়াটিকে জখম করে দিতে পারলেও তার হাতে শহীদ হন আখরাম (রদিয়াল্লাহু আনহু)। সে পরে আখরামের ঘোড়াটি নিয়ে নেয়। আবূ কাতাদা উঠে এসে বর্শার আঘাতে খতম করে জাহান্নামে পাঠান নরাধম আবদুর রহমানকে। পালের গোদাকে পটল তুলতে দেখে বাকি গুন্ডাবাহিনী লেজ তুলে পালাতে শুরু করে। মুসলিম অশ্বারোহীরা পিছু ধাওয়া করেন তাদের। এখনও দৌড়ে দৌড়ে তাদের সাথে আসছেন সালামা ইবনুল আকওয়া' (রদিয়াল্লাহু আনহু)!

সূর্যাস্তের একটু আগে যু-কারাদ পর্বতগিরিতে গিয়ে পৌঁছায় দুর্বৃত্তরা। সারাদিনের পরিশ্রমে তারা ক্লান্ত-বিধ্বস্ত, সেই সাথে প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত। কিন্তু জলাধারের কাছেও ঘেঁষতে পারছে না শুধু একটি সমস্যার কারণে—সালামার ছোড়া তির। সূর্যাস্তের পর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসে সাহাবিদেরসহ সালামার সাথে সাক্ষাৎ করলেন নবি ﷺ। সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) আরজ করলেন, "নবিজি, ওদের দম ফুরিয়ে এসেছে। আমাকে স্রেফ এক শ জন লোক দিন। আমি তাদের তাদের পশুগুলোসহ আপনার

কাছে হাযির করি।"

নবি ﷺ বললেন, "আকওয়া'র পুত্র! জিতেছ তো তুমিই। এবার শত্রুদের একটু দয়া করো। এরপর বললেন, "এখন তাদের বানূ গতফানে মেহমানদারী করানো হচ্ছে।"

সেদিনের দুর্দান্ত বীরত্বের কারণে রাসূল ﷺ সালামা ইবনুল আকওয়া' (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে পদাতিক ও অশ্বারোহী দুই দলেরই মর্যাদা দেওয়া হয় এবং দুটি অংশই তাঁকে দেওয়া হয়। স্বয়ং নবিজির পেছনে ফিরতি যাত্রায় 'আদবা' উটের পিঠে বসার সৌভাগ্যও লাভ করেন তিনি। একদম কাছ থেকে শোনেন নবিজির ঘোষণা, "আজকের সেরা ঘোড়সওয়ার আবূ কাতাদা, আর সেরা পদাতিক সালামা ইবনুল আকওয়া'।"

নবি ﷺ এই যুদ্ধে বের হওয়ার সময় মদীনার দায়িত্ব ইবনু উম্মি মাকতূম (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দিয়েছিলেন। আর পতাকা বাহক ছিল মিকদাদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)।[৪১৬]

খাইবার বিজয় (মুহাররম, ৭ম হিজরি)

একই মাসে খাইবার অভিযানের ঘোষণা দেন মুহাম্মাদ ﷺ। হুদাইবিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করতে না পারা ব্যক্তিরা এবার সাথে যাওয়ার অনুমতি চান। কিন্তু তিনি জানিয়ে দেন যে, যারা ইতিমধ্যেই নিজেদের জিহাদের প্রত্যয় প্রমাণ করেছেন, এবার তারাই শুধু যেতে পারবে। পেছনে পড়ে থাকা লোকেরা অভিযান থেকেও বঞ্চিত হলেন, গনীমাত থেকেও। তাই এবারও বের হলেন হুদাইবিয়ার বৃক্ষতলের সেই চৌদ্দ শ জন শপথ গ্রহণকারী সাহাবি।

মদীনার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক নিযুক্ত হলেন সিবা' ইবনু উরফুতা গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু)।[৪১৭]

সুপরিচিত একটি পথ ধরে প্রথমে নবি ﷺ যাত্রা শুরু করলেন। অর্ধেক পথ গিয়ে সেনাদলকে ঘুরিয়ে দিলেন আরেকটি রাস্তা অভিমুখে। যার ফলে বন্ধ হয়ে যায় ইয়াহূদিদের সিরিয়া পালানোর পথ।

যাত্রাপথের শেষ-রাতে নবি ﷺ ও সাহাবিরা খাইবারের খুব কাছেই একটি জায়গায় শিবির খাটান। কিন্তু খাইবারবাসী ইয়াহূদিরা টেরও পায়নি তাঁদের উপস্থিতি। আঁধার থাকতেই ফজরের সালাত সম্পন্ন করে পুনরায় বাহনে আরোহণ করেন নবিজি ﷺ

---

[৪১৬] বুখারি, ৩০৪১; মুসলিম, ১৮০৬, ১৮০৭; যাদুল মাআদ, ২/১৩৩।

[৪১৭] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ৭/৪৬৫; যাদুল মাআদ, ২/১৩৩।

ও সাহাবিগণ। আর ইয়াহূদিরা তখন টুকরি-কোদাল নিয়ে খেতে যাওয়ার জন্য রওনা হচ্ছে। মুসলিম বাহিনীদের দেখে নিজের অজান্তেই তাদের হাত থেকে সবকিছু পড়ে যায়। "মুহাম্মাদ চলে এসেছে! মুহাম্মাদ তার সেনা নিয়ে চলে এসেছে!!" বলে চিৎকার করতে করতে লোকালয়ে দৌড় দেয় তারা। নবি ﷺ সাথিদের বললেন, "আল্লাহু আকবার! আজ ধ্বংস হয়েছে খাইবার। আমরা যেদিন কোনও লোকালয়ের আঙ্গিনায় অবতীর্ণ হই, যাদের ইতিপূর্বে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য সেদিনের সকাল বিষণ্ন ও মন্দ হয়ে যায়।"[৪১৮]

মদীনা থেকে ১৭১ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত খাইবার। এর জনবসতি মূলত তিনটি এলাকা জুড়ে। নাতাহ, কাতিবাহ এবং শাক।

নাতাহ এলাকাতে ছিল তিনটি দুর্গ—হিসনু[৪১৯] নাইম, হিসনুস সা'ব ইবনি মুআয এবং হিসনুয যুবাইর।

শাক এলাকাতে দুটি দুর্গ—হিসনু উবাই এবং হিসনু নিযার।

আর কাতিবাহতেও ছিল তিনটি দুর্গ— হিসনু কামূস, হিসনু ওয়াতীহ এবং হিসনু সালালাম।

এ ছাড়াও তখন খাইবারে ছোট ছোট এবং কম সুরক্ষিত আরও কিছু দুর্গ ছিল।

• নাতাহ এলাকার বিজয়

নাতাহ এলাকার দুর্গগুলোর পূর্বদিকে তাদের তির-সীমানার বাইরে তাঁবু স্থাপন করলেন নবি ﷺ। তারপর আক্রমণ করেন নাইম দুর্গে। ইয়াহূদিদের এই উঁচু ও শক্ত ঘাঁটিটির নিরাপত্তাব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী, বলতে গেলে অভেদ্য। খাইবার-প্রতিরক্ষার এই প্রথম সারিতেই তাদের কিংবদন্তি যোদ্ধা মারহাবের বসবাস। কথিত আছে, তার শরীরে নাকি এক হাজার জনের শক্তি!

উভয়পক্ষে তির-বিনিময় করে কয়েকদিন কেটে যায়। তারপর একদিন নবি ﷺ বিজয়ের ঘোষণা দেন, "আগামীকাল এমন একজনের হাতে পতাকা দেবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন।"

এই ঘোষণা শুনে আনসার ও মুহাজিরদের প্রত্যেকেই এই প্রত্যাশায় রাত অতিবাহিত

---

[৪১৮] বুখারি, ৩৭১, ৪১৯৭, ৪১৯৮।

[৪১৯] আরবি শব্দ 'হিসন' অর্থ : দুর্গ, কেল্লা।

করে যে, আগামীকাল হয়তো তার হাতেই পতাকা প্রদান করা হবে। পরদিন সকালবেলা। নবি ﷺ বললেন, "আলি কোথায়?" সাহাবিগণ জবাব দিলেন, "আলির তো চোখের অসুখ!" এরপরেও নবি ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর চোখে নিজের মুখের লালা মাখিয়ে দেন, ফলে আলির চোখ ভালো হয়ে যায়, যেন কোনও অসুখই ছিল না। তারপর তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বলেন, "তাদের সাথে লড়াই করার আগে তাদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেবে।"[৪২০]

এদিকে ইয়াহূদিরা তাদের নারী ও শিশুদের শাক দুর্গে স্থানান্তর করতে থাকে এবং ওই দিন সকালেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, খোলা ময়দানেই যুদ্ধ হবে। সুতরাং আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) সৈন্যদের নিয়ে তাদের নিকট পৌঁছে দেখেন, তারা যুদ্ধের জন্য একেবারে প্রস্তুত। প্রথমে আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন। কিন্তু তারা পরিষ্কারভাবে তা অস্বীকার করে। তখন তাদের বীরপুরুষ মারহাব তরবারি হাতে নিয়ে অহংকার ও দম্ভের সাথে দাঁড়িয়ে যায় এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে বলে,

'আমি মারহাব, খাইবার আমাকে জানে
অস্ত্রে সুসজ্জিত, সাহসী আর অভিজ্ঞ বলে;
যখন যুদ্ধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে।'

এর বিপরীতে আমির ইবনুল আকওয়া' (রদিয়াল্লাহু আনহু) সামনে এগিয়ে আসে আর তার কথার জবাবে বলে,

'খাইবার জানে, আমি আমির
সম্পূর্ণ সশস্ত্র, অতি সাহসী, নির্ভীক বীর।'

অতঃপর তারা দু'জন একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মারহাবের তরবারি আমির (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঢালে আটকে যায়। ফলে তিনি তাঁর তরবারি দিয়ে অভিশপ্ত এই ইয়াহূদির পায়ের গোছা কেটে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার পায়ে আঘাত করেন। কিন্তু তরবারিটি ছোট হওয়ার কারণে তাঁর নিজের হাঁটুতেই এসে লাগে এবং পরে ওই আঘাতের কারণেই তিনি শহীদ হয়ে যান। আমির (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যাপারে নবি ﷺ বলেন, "নিশ্চয়ই তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব। সে জানবাজ যোদ্ধা ছিল। এই জমীনে বর্তমান তার মতো একজন আরবও খুঁজে পাওয়া বিরল।"

---

[৪২০] বুখারি, ৪২১০।

এবার মারহাবের মুকাবিলা করতে আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) নিজেই বেরিয়ে আসেন এবং একটি কবিতা পাঠ করেন; যার অর্থ:

'আমি সেই ব্যক্তি, যার মা তার নাম রেখেছে হায়দার (সিংহ)।

দেখতে বনের সিংহের মতোই ভয়ংকর।

আমি প্রতিপক্ষকে দিই অধিক হিংস্র আঘাত।'

তারপর মারহাবের মাথায় তরবারি দিয়ে এত জোরে আঘাত করেন যে, সে সাথে সাথে সেখানেই মারা যায়।[৪২১]

এরপর মারহাবের ভাই ইয়াসির দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য ডাক দেয়। তার বিরুদ্ধে লড়তে আসেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাকেও তার ভাইয়ের কাছে নরকে পাঠিয়ে দেন।[৪২২]

তারপর শুরু হয় তীব্র লড়াই। মুসলিমরা তাদের কোণঠাসা করে ফেলে। তাদের সর্দার শ্রেণির কিছু ইয়াহূদি মারা পড়লে তাদের শক্তি ও মনোবল উবে যায়। তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে শুরু করে। মুসলমানরাও তাদের পিছু নিয়ে তাদের দুর্গে ঢুকে পড়ে। ইয়াহূদিরা দ্রুত সে দুর্গ ছেড়ে তার কাছেই হিসনুস সা'ব-এ পালিয়ে যায় এবং তাতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মুসলমানরা হিসনু নাইমে অনেক ফসলি সম্পদ, খেজুর ও হাতিয়ার গনীমাত হিসেবে পেয়ে যায়।

এরপরে মুসলিম বাহিনী হুবাব ইবনুল মুনযির (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে হিসনুস সা'ব অবরোধ করে। এই অবরোধ তিন দিন পর্যন্ত চলমান থাকে। তৃতীয় দিন নবি ﷺ বিজয়ের এবং গনীমাতের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণের আদেশ দেন। আদেশ পেয়ে সাহাবায়ে কেরাম প্রচণ্ড শক্তিশালীভাবে তাদের আক্রমণ করেন। বিরতিহীন লড়াই চলতে থাকে দুইপক্ষের মাঝে। অবশেষে ইয়াহূদিরা পরাজিত হয় এবং মুসলমানরা সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই সেই দুর্গ জয় করে নেন। এই দুর্গেও প্রচুর পরিমাণে ফসলি সম্পদ হস্তগত হয়। তবে অন্যান্য দুর্গের তুলনায় এখানে সবচেয়ে বেশি খাদ্য ও চর্বি ছিল যা মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি উপকারে এসেছিল। এর পূর্বে মুসলিমদের অনেক ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। এমনকি অনেকে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বাহনের গাধা যবাই করে চুলায় বসিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ গাধার গোশত খেতে নিষেধ করায়

---

[৪২১] বুখারি, ৪১৯৬; মুসলিম, ১৮০৭।

[৪২২] ইবনু হিশাম, ২/৩৩২।

তারা জ্বলন্ত চুলা থেকে ফুটন্ত গোশত ভরা পাতিল ফেলে দিয়েছিল।[৪২৩]

ইয়াহূদিরা সেখান থেকে পালিয়ে হিসনুয যুবাইরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই দুর্গটিই নাতাহ এলাকার শেষ দুর্গ। মুসলমানরা এগিয়ে এসে এটিকেও অবরোধ করে। চতুর্থ দিন এক ইয়াহূদি এসে পানির ড্রেন ঠিক করে দিয়ে যায়, যার থেকে তারা পানি নিত। মুসলমানগণ সেই ড্রেনটি কেটে দেয়। ফলে ইয়াহূদিরা বের হয়ে মুসলিমদের ওপর তীব্র ক্ষোভে শক্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর সাথে দমে টিকতে না পেরে নাতাহ এলাকা ছেড়ে শাক অঞ্চলের হিসনু উবাইয়ে চার দেওয়ালের বন্দি জীবন গ্রহণ করে।

- **শাক এলাকার বিজয়**

মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে সেখানেও অবরোধ করে ফেলেন। কিন্তু সেখান থেকে তারা অত্যন্ত মযবুত মুকাবিলার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তাদের এক বাহাদুর সামনে অগ্রসর হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায়। আবূ দুজানা সিমাক ইবনু খরাশা আনসারি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর তরবারির নিচে কতল হয়ে যায়। এরপর আরেকজন বেরিয়ে আসে। তাকেও আবূ দুজানা (রদিয়াল্লাহু আনহু) নিমিষেই শেষ করে দেয়। এই অবস্থা দেখে বাকি সেনারা দুর্গে ঢুকে পড়ে। তাদের সাথে সাথে মুসলিমরাও সেখানে ঢুকে পড়ে এবং প্রচণ্ড লড়াই শেষে তাদের সেখান থেকেও বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। ফলে আবারও বিশাল পরিমাণ শস্য ও গবাদি পশু তাদের হস্তগত হয়।

ইয়াহূদিরা অগত্যা শাক এলাকার শেষ দুর্গ নিযারে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। অপ্রতিরোধ্য মুসলিমরা এবার অবরোধ করেন নিযার দুর্গ। এ কেল্লাটাই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় মনে হচ্ছিল। কারণ, উঁচু এক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত হওয়ায় সেখানে আক্রমণকারীদের পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। ইয়াহূদিরা তাই নারী-শিশুদের এই কেল্লাটাতে রেখেছিল। কোনও মুসলিম সেনাকে পাহাড়ে উঠতে দেখলে সাথে সাথে দুর্গ থেকে পাথর ও তির ছুড়ে মারতে থাকে তারা।

নতুন এই পরিস্থিতি সামাল দিতে মুসলিমরাও তৈরি করেন নতুন যুদ্ধাস্ত্র। নতুন সেই অস্ত্রটির নাম মিনজানীক। এটাকে গুলতির বড় সংস্করণ এবং ট্যাংকের আদিরূপ বলা চলে। এই মিনজানীক ব্যবহার করে বিরাট বিরাট পাথর ছুড়ে মারা হয় নিযারের দেয়ালে। বুদ্ধিটি বেশ কার্যকর প্রমাণিত হয়। এত কঠোরভাবে সুরক্ষিত দুর্গেরও অবশেষে পতন

---

[৪২৩] বুখারি, ৪২২০।

ঘটে। আরও একটি জনবসতির দখল হারিয়ে ইয়াহূদিরা সরে যায় কাতিবাহ অঞ্চলে। আর দখলকৃত দুর্গে মুসলিমরা পান তামা ও মাটির তৈরি মূল্যবান তৈজসপত্র। রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে তারা তা পরিষ্কার করে নেয় এবং রান্নার কাজে ব্যবহার করে।

• কাতিবাহ এলাকার বিজয়

আর একটি মাত্র ঘাঁটি বাকি। ক্লান্তিহীন মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী সেখানেও হানা দেন। লক্ষ্য সেখানকার বাকি তিনটি দুর্গ। প্রায় দু-তিন সপ্তাহের এক দীর্ঘ অবরোধের পর কামূস দুর্গের পতন হয়। ইয়াহূদিরা এবার দেখল যে, ওয়াতীহ এবং সালালাম দুর্গও একসময় আক্রান্ত হতে বাকি রইবে না। তাই তারা এগিয়ে আসে শান্তিচুক্তির আলোচনায়। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার শর্তে তারা সদলবলে নির্বাসনে যেতে রাজি হয়। নবি ﷺ অনুমতি দেন। সেই সাথে সোনা, রুপা, ঘোড়া ও অস্ত্র ব্যতীত যা কিছু নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তাও নেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।[৪২৪]

কিন্তু যদি তারা কোনও কিছু লুকিয়ে রাখে কিংবা গোপনে সেগুলো নেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এরপর ইয়াহূদিরা দুটি কি তিনটি দুর্গ মুসলিমদের কাছে সমর্পণ করে দেয়। ফলে একশটি বর্ম, চারশটি তলোয়ার, এক হাজার বর্শা এবং পাঁচ শ আরব্য ধনুক হস্তগত হয় মুসলিমদের। হিব্রু ভাষায় লেখা কিছু পুস্তিকাও উদ্ধার করা হয়, তবে ইয়াহূদিদের অনুরোধে দয়াবশত সেগুলো তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

তখনো আত্মসমর্পণ পুরোপুরি নির্ঝঞ্ঝাট হয়নি। কিনানা ইবনু আবিল হুকাইক ও তার ভাইসহ কয়েকজন গোত্রপতি মুসলিমদের না জানিয়ে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ, রুপা ও গহনা নিয়ে সটকে পড়তে চাইছিল। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে নিরাপদ-মুক্তির শর্ত বাতিল করে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বন্দিও করা হয় কয়েকজনকে। বন্দিদের মাঝে কিনানার বিধবা স্ত্রী সফিয়্যা বিনতু হুয়াই ইবনি আখতাবও ছিলেন।[৪২৫] নবি ﷺ পরে তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করে উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদায় উন্নীত করেন। রদিয়াল্লাহু আনহা।

এভাবেই শেষ হয় দীর্ঘ এক যুদ্ধাভিযানের। একবারে শেষ হয়ে না গিয়ে এরপরে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধও হয়।

অধ্যায়ের যবনিকাপাতের সময় মুসলিম শহীদের সংখ্যা ছিল পনেরো থেকে ১৮ জন, আর ইয়াহূদিদের নিহতের সংখ্যা ছিল ৯৩ জন।

---

[৪২৪] আবূ দাউদ, ৩০০৬।

[৪২৫] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ২/৩৩১-৩৩৭; যাদুল মাআদ, ২/১৩৬।

• আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ও আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু)–এর আগমন

ওদিকে আবিসিনিয়ার রাজার কাছে নবিজি ﷺ-এর প্রেরিত দূত আমর ইবনু উমাইয়া দামরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেখানকার সব মুহাজিরকে সাথে নিয়ে ফিরে এসেছেন। এসেই তারা খবর পান যে, নবি ﷺ খাইবার অভিযানে গেছেন। তাই তাদের একাংশ খাইবারের পথে রওনা হন আর বাকিরা মদীনার অভিমুখে। খাইবারগামীদের মাঝে জা'ফার ইবনু আবী তালিব এবং আবূ মূসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-ও ছিলেন।

কিন্তু সেখানে পৌঁছে তারা দেখেন যে, যুদ্ধ ইতিমধ্যে জয় হয়ে গেছে। তবে গনীমাত বণ্টন তখনো বাকি। জা'ফারের কপালে চুমু দিয়ে স্বাগত জানান নবিজি ﷺ। তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম! খাইবার-বিজয়, নাকি জা'ফারের আগমন—কোনটাতে যে বেশি খুশি হয়েছি, আমি জানি না!"[৪২৬]

জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের সাথে জা'ফার (রদিয়াল্লাহু আনহু)-ও গনীমাতের অংশ লাভ করেন। কারণ, তিনিও অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছিলেন।[৪২৭]

সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবি আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) খাইবার জয়ের পর নবিজি ﷺ-এর নিকট আগমন করেন। নবি ﷺ খাইবার অভিযানে বেরিয়ে পড়ার পর তিনি মদীনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। পরে মদীনার ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন সেনাদলে নাম লেখাতে। কিন্তু এসে পৌঁছান যুদ্ধ শেষে। তিনিও খাইবারের গনীমাতের অংশ পেয়েছিলেন।

পরে আসা আরেকজন সাহাবি আবান ইবনু সাঈদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি নাজদ অঞ্চলে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের একটি অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তবে নবি ﷺ তাকে ও তার দলকে খাইবারের গনীমাতের কোনও অংশ দেননি।

• খাইবারের গনীমাত বণ্টন

বিজিত অঞ্চলের শত্রুদের মৃত্যুদণ্ডের বদলে নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল প্রথমে। তবে অধিকাংশ ইয়াহূদি এই ভূমি ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক। নিরাপত্তা লাভের পর তারা নতুন এক প্রস্তাব দেয় রাসূল ﷺ-কে—"মুহাম্মাদ, আমাদের এ

---

[৪২৬] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৩/২১১; বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ৪/২৪৬।

[৪২৭] বুখারি, ৩১৩৬।

এলাকায় থাকতে দিন। দেখুন, জায়গাটা আমরা আপনাদের চেয়ে ভালো চিনি। আমরা এখানে চাষাবাদের কাজ করে যত ফল ও ফসল উৎপন্ন হবে তার অর্ধেক আমরা আপনাদের দিয়ে দেবো।”

নবি ﷺ এই শর্তে তাদের অনুরোধ গ্রহণ করেন যে, মুসলমানদের যখন ইচ্ছা তাদের সেখান থেকে বের করে দেবে। ইয়াহূদিরা এই শর্ত মেনে নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের করদ হিসেবে দীর্ঘকাল সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে বসবাস করে। তবে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাতকালে আবারও শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ড শুরু করেছিল তারা। ফলে তখন তিনি তাদের চূড়ান্তভাবে নির্বাসিত করে সেখান থেকে বের করে দেন।[৪২৮]

নবি ﷺ খাইবারের পুরো গনীমাতকে ছত্রিশটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রতিটি ভাগে থাকে একশটি করে উপভাগ। নবি ﷺ আঠারো রেখে দেন ভাগ মুসলিম সমাজের টানাপড়েন ও দুর্দিনের জন্য। আর বাকি আঠারো ভাগ বণ্টন করে দেওয়া হয় মুজাহিদদের মাঝে। পদাতিক সেনারা পান এক অনুপাতে, আর অশ্বারোহীরা পান তিন অনুপাতে। সে হিসেবে দুই শ অশ্বারোহী মিলে পান ছয়টি ভাগ, আর বারো শ পদাতিক সেনারা পান বাকি বারোটি ভাগ।[৪২৯]

খাইবারের উর্বরতা তুলনাহীন। খেজুর ও শস্যে শ্যামলা এ ভূমি জয় করার পর মুসলিমদের প্রাচুর্যতা ও সচ্ছলতা ফিরে আসে। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) খুশিতে বলেছিলেন, “বাহ! এবার তাহলে পেটভরে খেজুর খেতে পারব!”[৪৩০] খাইবার থেকে ফিরে আসার পর দরিদ্র মুহাজিরদের অভাব দূর হয়ে যায়। আনসারদের থেকে নেওয়া খেজুর গাছগুলো ফিরিয়ে দেন তারা। কারণ, খাইবারের গনীমাতের কল্যাণে তারা এখন আর্থিকভাবে বেশ স্বাবলম্বী।[৪৩১]

• নবিজি ﷺ-কে বিষ প্রয়োগ

শান্তিপূর্ণ অবস্থাও নিশ্চিত হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড বা নির্বাসনের হুমকিও নেই। এই সুযোগে ইয়াহূদিরা নতুন আরেক ধরনের যুদ্ধ শুরু করল। রাসূল ﷺ-কে গোপনে হত্যার প্রচেষ্টা! সাল্লাম ইবনু মিশকামের স্ত্রীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত করে তার কাছে তারা

[৪২৮] বুখারি, ২৩৩৮।

[৪২৯] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ২/১৩৭-১৩৮।

[৪৩০] বুখারি, ৪২৪২।

[৪৩১] বুখারি, ২৬৩০; ইবনু হিশাম, ২/৩৩৭-৩৩৮।

একটি ভুনা ছাগল পেশ করে। নবিজির বেশি পছন্দ কাঁধের গোশত। তাই ঠিক ওই টুকরোটিতে ইচ্ছেমতো বিষ মাখিয়ে নেয় মহিলাটি। এক টুকরো গোশত মুখে দিতেই নবি ﷺ বিষয়টি জেনে যান। মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বলেন, "এটা বিষ-মিশ্রিত বকরি।"

স্বীকারোক্তি আদায়ের লক্ষ্যে সেই নারীসহ আয়োজক ইয়াহূদিদের ডাকিয়ে আনেন নবি ﷺ। তারা স্বীকার করে বলে, "ভেবেছিলাম যে, আপনি ভণ্ড হলে বিষ প্রয়োগে আপনার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যাব। আর যদি সত্যিই নবি হয়ে থাকেন, তাহলে বিষ আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।" তাদের এই বক্তব্য শুনে নবি ﷺ সেই নারীটিকে ও ইয়াহূদিদের ক্ষমা করে দেন। কিন্তু আরেক সাহাবি বিশর ইবনু বারা ইবনি মা'রূর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ওই বিষের কারণে ইন্তিকাল করেছিলেন। তাই শাস্তি হিসেবে নারীটিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।[৪৩২]

• ফাদাকবাসীর আত্মসমর্পণ

খাইবারে পৌঁছানোর পর রাসূল ﷺ মুহাইয়িসা ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাঠিয়েছিলেন পূর্ব দিকের আরেকটি শহর ফাদাকে। খাইবার থেকে প্রায় দুই দিনের দূরত্বে অবস্থিত এই স্থানটির বর্তমান নাম 'হাইত'। বর্তমান সৌদি আরবের হাইল অঞ্চলে অবস্থিত এটি। সেখানকার ইয়াহূদিদেরও ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। কিন্তু তারা তৎক্ষণাৎ জবাব না দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে খাইবারের পানি কোন দিকে গড়ায়, তা পর্যবেক্ষণ করতে।

কিছুদিনের মাঝেই খবর চলে এল যে, মুসলিমদের হাতে খাইবারের পতন হয়েছে। ফলে ফাদাকবাসীরাও দ্রুত চুক্তি করতে এগিয়ে আসে। অনুরোধ করে খাইবারবাসীদের মতো তাদেরও একই সুযোগ দিতে। সে অনুরোধও গ্রহণ করেন নবি ﷺ। ফাদাকের ভূমি নবি ﷺ নিজের মালিকানায় নেন। এখান থেকে প্রাপ্ত আয় তিনি ব্যয় করতেন নিজের ও নিজ গোত্র বানূ হাশিমের ব্যয়ভার বহনে। এ ছাড়া অভাবী যুবকদের বিয়েসহ অন্যান্য দাতব্য খাতেও এ অর্থ ব্যয় করেন তিনি।[৪৩৩]

• ওয়াদিল কুরা

খাইবার-দমনের পর নবি ﷺ মনোযোগ দেন ওয়াদিল কুরার অধিবাসীদের প্রতি। সেখানকার ইয়াহূদিরা ইসলামও গ্রহণ করেনি, চুক্তিতেও আসেনি। তারা বেছে নিয়েছে

---

[৪৩২] বুখারি, ৩১৬৯।
[৪৩৩] ইবনু হিশাম, ২/৩৩৭-৩৫৩।

যুদ্ধ। প্রথম দ্বন্দ্বযুদ্ধেই তাদের শ্রেষ্ঠ দুই বীর কতল হয় যুবাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে। আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে প্রাণ হারায় তৃতীয়জন। এভাবে একে একে তাদের এগারো জন জাহান্নামের পথ ধরে।

প্রত্যেকটি দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষে নবি ﷺ তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। প্রতিওয়াক্ত সালাতের পরও তা-ই করেন। এভাবে শেষ হয় সে দিনটি। পরেরদিন সূর্য বেশি দূর ওঠার আগেই যুদ্ধের মাধ্যমে ইয়াহূদিদের শায়েস্তা করে ফেলা হয়। যথেষ্ট পরিমাণ ভূমি হস্তগত হয় মুসলিমদের।

এবারে ওয়াদিল কুরার ইয়াহূদিরাও খাইবারের মতো শান্তিচুক্তির অনুরোধ নিয়ে আসে। নবিজি ﷺ সেটাও গ্রহণ করেন। আরও একটি অঞ্চল চলে আসে সম্পূর্ণ মুসলিম নিয়ন্ত্রণাধীনে।[৪৩৪]

• তাইমাবাসীদের সাথে বোঝাপড়া

খাইবার, ফাদাক এবং ওয়াদিল কুরায় স্বধর্মীয়দের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে তাইমার ইয়াহূদিরা। তারাও শত্রুতা ছেড়ে দিয়ে জিযইয়া প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম সেনাদের নিরাপত্তা-ছায়ায় আসে।[৪৩৫]

• সফিয়্যার সাথে নবিজির পরিণয়

চার-চারটে অঞ্চল বিজয় শেষে নবি ﷺ মদীনায় ফিরতি যাত্রা শুরু করেন। এ যাত্রার মাঝেই 'সাহবা' উপত্যকার কাছে থাকাকালে সফিয়্যা বিনতু হুয়াই ইবনু আখতাব (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে নবি ﷺ-এর বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিধবা হিসেবে বন্দি হওয়া এই নারীকে দিহইয়া ইবনু খলীফা কালবি (রদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল ﷺ-এর অনুমতিতে নিজ বণ্টনে নিয়ে নেন। কিন্তু সাহাবিরা প্রস্তাব দেন যে, একজন গোত্রপতির প্রাক্তন স্ত্রী হিসেবে তাকে বরং নবিজি ﷺ-এর সাথেই বেশি মানায়। এরপর নবিজি ﷺ-এর আহ্বানে সফিয়্যা ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে নবি ﷺ তাকে স্বাধীন করে দেন। আর এই স্বাধীনতা প্রদানকেই নবিজি তার সাথে বিয়ের মোহর হিসেবে নির্ধারণ করেন।

বিয়ের পরদিন ওলিমা অনুষ্ঠিত হয়। খেজুর, পনির এবং ঘি দিয়ে মিশ্রিত একপ্রকার খাদ্য দ্বারা আপ্যায়ন করা হয় সবাইকে। নববধূর সাথে তিন রাত অতিবাহিত করার পর

---

[৪৩৪] ইবনু সা'দ, তবাকাত, ১/২৭৯; যাদুল মাআদ, ২/১৪৬।

[৪৩৫] যাদুল মাআদ, ২/১৪৭।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যাত্রা পুনরারম্ভ করেন।[৪৩৬] সপ্তম হিজরি সনের সফর মাসের শেষ এবং রবীউল আউয়ালের শুরুতেই মদীনা এসে পৌঁছান তিনি।

যাতুর রিকা'র যুদ্ধ (জুমাদাল ঊলা, ৭ম হিজরি)

এক শত্রুকে শায়েস্তা করে আসতে-না-আসতেই খবর এল, আরেকটি জোট নবিজি ﷺ-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনাচ্ছে। বানূ আনমার, সা'লাবা এবং মুহারিবের বেদুইন জোটকে উচিত শিক্ষা দেওয়া এখন সময়ের দাবি।

এবারে মদীনার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক উসমান ইবনু আফফান (রদিয়াল্লাহু আনহু)। আর নবি ﷺ অভিযানে বেরোলেন সাত শ সেনা নিয়ে। গন্তব্য মদীনা থেকে দু-দিনের দূরত্বে অবস্থিত নাখলা। বানূ গতফানের যোদ্ধাদের সাথে দেখা হয় সেখানে। উভয়পক্ষই মুখোমুখি সংঘর্ষে যাওয়ার বদলে পরস্পরকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সালাতের ওয়াক্ত হলে সালাত আদায় করা হয় সালাতুল খওফের বিশেষ নিয়মে। নবি ﷺ ইমাম হিসেবে একটানা চার রাকাআত আদায় করেন। দুই-দুই রাকাআত করে তাঁর সাথে শরীক হন একেকদল সেনা, আর অপরদল থাকে প্রহরায়।[৪৩৭]

বানূ গতফানের সাথে এই সংঘর্ষ হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যায়। শত্রুরা আচমকা ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় চারিদিকে। কোনও প্রাণহানি ছাড়াই সন্তোষজনকভাবে অভিযান শেষ করে নবি ﷺ মদীনা ফিরে আসেন। অভিযানটি পরবর্তী সময়ে যাতুর রিকা' নামে পরিচিতি লাভ করে। রিকা' অর্থ কাপড়ের টুকরা। দীর্ঘ এ সফরে পা ছিলে যাওয়ায় সাহাবিরা এ সময় পায়ে কাপড়ের টুকরো বেঁধে নিয়েছিলেন। তাই এ নাম।[৪৩৮]

অবশ্য অন্যান্য কিছু সূত্রমতে, অভিযানটির নাম হয়েছে সেই স্থানের নাম অনুযায়ী। বিস্তীর্ণ এই ভূমিটি দেখতে ছিল অনেকটা প্যাঁচানো কাপড়ের মতো।

• আমার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবে কে!

একটি যাত্রাবিরতির সময় নবি ﷺ একটি গাছের ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তরবারিটি একটি ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। অন্যরাও একেকজন একেক গাছের নিচে শুয়ে পড়েন। এমন সময় চুপে চুপে ভেতরে ঢুকে পড়ে এক মুশরিক। ডাল থেকে

---

[৪৩৬] বুখারি, ৩৭১।

[৪৩৭] বুখারি, ৪১৩১; মুসলিম, ৭৪০।

[৪৩৮] বুখারি, ৪১২৮; মুসলিম, ১৮১৬।

নামিয়ে নেয় নবিজি ﷺ-এর তলোয়ারটি। ইতিমধ্যে নবিজিও ﷺ জেগে উঠেছেন। তরবারি নবিজির দিকে তাক করে সে বলল, "আপনি কি আমাকে ভয় করছেন?"

নবিজি ﷺ তখনো পুরোপুরি উঠে বসেননি। কিন্তু হাবভাবে ভয়ের কোনও লক্ষণও নেই! বললেন, "মোটেও না!"

মুশরিক ব্যক্তি দম্ভভরে জিজ্ঞাসা করেন, "এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?"

আল্লাহর রাসূল ﷺ শান্তকণ্ঠে বললেন, "আল্লাহ!" এই কথা শুনে ভয়ে মুশরিকটির হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। উল্টে গেল পাশার দান। নবি ﷺ এবার তরবারিটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "এবার তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?"

ভীত-সন্ত্রস্ত মুশরিকটি অনুনয় করে প্রাণভিক্ষা চায়। নবি ﷺ তাকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেন। লোকটি ঈমান আনেনি বটে। কিন্তু আর কখনও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার এবং ইসলামবিরোধীদের সাহায্য না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নেয়। মুক্তি পেয়ে ফিরে যায় নিজ জাতির কাছে। ঘোষণা করে, "আজ আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষটির সাথে দেখা করে এলাম।"[৪৩৯]

কাযা উমরা পালন (যুল-কা'দা, ৭ম হিজরি)

হুদাইবিয়া চুক্তির পর এক বছর কেটে গেছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুসলিমরা এবার নির্বিঘ্নে উমরা করতে পারবেন। আবূ রুহ্ম কুলসূম ইবনুল হুসাইন গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে মদীনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নবি ﷺ মক্কাভিমুখে যাত্রা করেন। নাজিয়া ইবনু জুনদুব আসলামি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর তত্ত্বাবধানে আছে নবিজির কুরবানির ষাটটি উট। কুরাইশদের বিশ্বাসঘাতকতার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। তাই সতর্কতাবশত মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর তত্ত্বাবধানে রেখেছেন অস্ত্রশস্ত্রসহ একশটি ঘোড়া।

যুল হুলাইফায় এসে সাহাবিরা ইহরাম বেঁধে নেন। নবি ﷺ-এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, "লাব্বাইক! আল্লাহুম্মা লাব্বাইক!" সহস্র কণ্ঠে তা প্রতিধ্বনিত করেন সাহাবিগণ। শুরু হলো আল্লাহর ঘরে যাত্রার আনুষ্ঠানিকতা। 'ইয়াজাজ' উপত্যকায় পৌঁছে উমরাযাত্রীরা নিরস্ত্র হন। আওস ইবনু খাওলা আনসারি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে দুই শ

---

[৪৩৯] বুখারি, ২৯১০।

জনের একটি দলের কাছে অস্ত্রশস্ত্র জমা থাকে। পেছনে অবস্থান করে উমরাকারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি দেখভাল করবেন তারা। মক্কার কাছাকাছি এসে পৌঁছানোর সময় উমরা পালনকারীদের প্রত্যেকের কাছে থাকে একটিমাত্র কোষবদ্ধ তরবারি।[৪৪০]

হুদাইবিয়া চুক্তির শর্তে এমনটিই বলা ছিল। 'হাজূন' হয়ে 'কাদা' দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন তারা। মুখে লাব্বাইক ধ্বনি আর চতুষ্পার্শ্বে তরবারিধারী সাহাবিদের নিয়ে কাসওয়া উটের পিঠে করে মক্কায় ঢোকেন নবি ﷺ।[৪৪১] সবার গন্তব্য কা'বা। উটনীর পিঠে বসেই নবি ﷺ একটি লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেন এবং ওভাবেই কা'বার তওয়াফ করেন।[৪৪২] তাঁর সাথে সাথে সব মুসলিমরাও তওয়াফ করেন।

ডান কাঁধ উন্মুক্ত রেখে সবার ইহরাম বাঁধা। উদ্দেশ্য বীরত্ব প্রদর্শন। আল্লাহর পবিত্র ঘরে এক আল্লাহরই উপাসনার অধিকার আদায় করে নিয়েছেন তারা, তাও মুশরিকদের একদম চোখের সামনে দিয়ে।

নবিজি ﷺ-এর সামনে সামনে চলছেন আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। কাঁধে ঝোলানো তরবারি আর মুখে আবৃত্তি:

'কাফিরজাদারা, সরে দাঁড়া! জায়গা ছেড়ে দে!
মর্যাদা আজ নবিজির, চোখ মেলে দেখে নে!
আগেও তোদের মেরেছি যাঁহার ঐশী আদেশে,
আজও তোদের মারব তাঁরই মহান নির্দেশে।
চরম আঘাতে ফাটিয়ে দেবো তোদের মাথার খুলি,
আঘাতের চোটে বন্ধুকে আজ বন্ধুও যাবে ভুলি।'[৪৪৩]

কা'বার উত্তরে 'কুআইকিআন' পাহাড়ে বসে মুশরিকরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল নবাগতদের। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখে প্রশংসা। এতদিন শুনে এসেছিল যে, ইসলাম নামক ধর্মটার অনুসারীরা কতগুলো জীর্ণ-শীর্ণ-দুর্বল লোক। ইয়াসরিবের বৈরী আবহাওয়ায় সারাক্ষণ রোগ-শোকে ভোগে। কিন্তু আজ নিজেদের চোখে দেখছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য!

---

[৪৪০] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ৭/৫০০; যাদুল মাআদ, ২/১৫১।
[৪৪১] বুখারি, ১৫৭৫।
[৪৪২] বুখারি, ১৬০০।
[৪৪৩] তিরমিযি, ২৮৪৭।

এরা যে শক্তপোক্ত, উন্নত শিরের যোদ্ধা! মক্কার সবচেয়ে সুঠাম লোকগুলোর সমানে সমান।

নবিজি ﷺ-এর বুদ্ধিটি কাজে দিয়েছে। কুরাইশদের মন-মেজাজ সম্পর্কে ভালো করেই জানতেন তিনি। তাই আগেই সাহাবিদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, যেন তওয়াফের সময় জোরে জোরে দৌড়ায় সবাই। এতে মুশরিকরা স্বচক্ষে দেখবে মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ্য। তবে ইয়েমেনি খুঁটি এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী অংশটিতে দৌড়াতে হবে না।[৪৪৪] এটি দক্ষিণ দিকে, মুশরিকদের দৃষ্টিসীমার বাইরে অবস্থিত।

তওয়াফ শেষে সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করেন নবি ﷺ। সাতবার সাঈ শেষে মারওয়ায় এসে পশু কুরবানি করেন। তারপর মাথার চুল কামিয়ে নেন। সাহাবিরাও তাঁর অনুকরণে একই কাজ সম্পাদন করেন। রাসূল ﷺ তারপর কয়েকজনকে ইয়াজাজে পাঠিয়ে দেন। যারা অস্ত্রশস্ত্র দেখভালের দায়িত্বে ছিল, তারা এসে এখন উমরা সম্পাদন করবে; আর নতুন এই দলটি গিয়ে অস্ত্রাগারের দায়িত্ব নেবে।[৪৪৫]

মুসলিমরা তিন দিন অবস্থান করেন মক্কায়। এর মধ্যে মাইমূনা বিনতুল হারিস হিলালিয়্যা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিয়ে করেন নবি ﷺ।[৪৪৬] তিনি হামযা ইবনু আবদিল মুত্তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ফুপু। নবি ﷺ তাকে প্রস্তাব পাঠালে তিনি তা আব্বাসকে জানান। আব্বাস তখন এই শুভকাজটি সম্পাদন করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। নবি ﷺ সে সময় 'হালাল' অবস্থায় ছিলেন। কারণ, তিনি মক্কায় প্রবেশ করে সর্বপ্রথম উমরা করেন তারপর হালাল হয়ে যান এবং হালাল অবস্থাতেই থাকেন।

চতুর্থ দিনের সকালে নবি ﷺ ফিরতি যাত্রা শুরু করেন মদীনা অভিমুখে।[৪৪৭] মক্কা থেকে নয় মাইল দূরে 'সারিফ' নামক স্থানে প্রথম যাত্রাবিরতি হয়। আর ওখানেই তাঁর কাছে বধূবেশে প্রেরিত হন মাইমূনা (রদিয়াল্লাহু আনহা)। আল্লাহর এমনই ইচ্ছে, পরিণয়ের স্থানই তার প্রয়াণের স্থান হিসেবে নির্ধারিত ছিল।[৪৪৮]

মদীনায় ফিরে পুনরায় প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত হন রাসূল ﷺ। প্রেরণ করেন কয়েকটি

---

[৪৪৪] বুখারি, ১৬০২।
[৪৪৫] বুখারি, ৪২৫৭।
[৪৪৬] বুখারি, ১৮৩৭।
[৪৪৭] বুখারি, ৪২৫১।
[৪৪৮] বুখারি, ৫০৬৭।

সশস্ত্র অভিযান। তার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি হলো মূতা এবং যাতুস সালাসিল অভিযান।

মূতা অভিযান (জুমাদাল ঊলা, ৮ম হিজরি)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বুসরার প্রশাসকের কাছে নবিজি ﷺ-এর চিঠি নিয়ে যাওয়ার সময় শুরাহবীল ইবনু আমর গাসসানির হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন হারিস ইবনু উমাইর আযদি (রদিয়াল্লাহু আনহু)। এ কাজটি সরাসরি যুদ্ধঘোষণার শামিল। যাইদ ইবনু হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে তিন হাজার সৈনিকের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। বাহিনীর সাদা পতাকাটি তুলে দেওয়া হয় যাইদের হাতে।[৪৪৯] তখন নবি ﷺ বলেন, "যদি যাইদ শহীদ হয়ে যায় তাহলে জা'ফার, আর যদি জা'ফারও শহীদ হয়ে যায় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা আমীর হবে।"[৪৫০]

হারিসের নিহত হওয়ার স্থানে গিয়ে যাইদ ইবনু হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহু) প্রথমে জনগণকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। তারা প্রত্যাখ্যান করলে তবেই শুরু হবে যুদ্ধ।

বাহিনীকে বিদায় দেওয়ার কালে নবিজি ﷺ কিছু চিরস্মরণীয় উক্তি করেন:

"আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে—আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। সাবধান! প্রতিশ্রুতি ভেঙো না, খিয়ানত কোরো না। ওদের শিশু, নারী এবং অশীতিপর বৃদ্ধদের হত্যা করবে না। সন্ন্যাসীদের মঠে আক্রমণ কোরো না, ফলদ গাছ কেটো না এবং কোনও দালানও ধ্বংস কোরো না।"[৪৫১]

সানিয়্যাতুল ওয়াদা' পর্যন্ত সেনাদলকে এগিয়ে দিয়ে আসেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। দক্ষিণ জর্দানের 'মা'আন' অঞ্চলে গিয়ে শিবির খাটায় সেনারা। কিন্তু সেখানে হাজির হলো এক অপ্রত্যাশিত বিপদ। খুব কাছেই মাআবে বসে আছে হিরাক্লিয়াসের এক লক্ষ সেনা। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে আরও এক লক্ষের একটি খ্রিষ্টান দল। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দুই রাত ধরে সলা-পরামর্শ চলে মুসলিম শিবিরে। অকল্পনীয় সংখ্যালঘুতা নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে, না মদীনা থেকে সাহায্য আনানো হবে—কোনও সিদ্ধান্তেই আসা সম্ভব হচ্ছিল না। এমন সময় মুসলিম ভাইদের উদ্দেশে এক আবেগঘন বক্তৃতা

---

[৪৪৯] বুখারি, ৫০৬৭।

[৪৫০] ফাতহুল বারি, ৭/৫১১; যাদুল মাআদ, ২/১৫৫।

[৪৫১] মুখতাসারুস সীরাহ, ৩২৭; মুসলিম, ১৭৩১; আবূ দাউদ, ২৬১৪, ২৬৩১।

দেন আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রদিয়াল্লাহু আনহু):

"আল্লাহর কসম! আপনারা যে জিনিসের আশায় এখানে এসেছেন, সেটাকেই এখন এড়ানোর চেষ্টা করছেন—অর্থাৎ শাহাদাত। আমরা সংখ্যা ও শক্তি দিয়ে কখনও যুদ্ধ করি না; বরং আমরা দ্বীনের শক্তিতেই যুদ্ধ করি, লড়াই করি, যে দ্বীন আল্লাহ আমাদের দান করেছেন। আমাদের সামনে রয়েছে দুটি পুরস্কার—গনীমাত নয়তো শাহাদাত!"

সবাই কথাটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বললেন, "আল্লাহর শপথ! ইবনু রাওয়াহা সত্য বলেছে।" তাই আগে বেড়ে মূতায় এসে ঘাঁটি গাড়লেন সাহাবিরা। মযবুত অবস্থান নিলেন বিরাট শত্রু বাহিনীর মুখোমুখি হতে।[৪৫২]

বেঁধে যায় এক অভূতপূর্ব অথচ ইতিহাস-বিস্মৃত এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ। সদ্য উদীয়মান মুসলিম রাষ্ট্রের ৩০০০ সেনা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় বিশ্বপরাশক্তি রোমান সাম্রাজ্যের দুই লাখ সেনাকে। রোমান বাহিনী সারাদিন লড়াই করেও ক্ষুদ্র এই প্রতিপক্ষের সাথে পেরে ওঠেনি। উল্টো হারিয়েছে নিজেদের সেরা সেরা কিছু সৈনিক।

মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী যাইদ ইবনু হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বর্শার আঘাতে শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত বীরবিক্রমে লড়াই করেন। তারপর পতাকা তুলে নেন জা'ফার ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু)। যুদ্ধের প্রচণ্ডতম মুহূর্তে বাহন থেকে নেমে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। যুদ্ধ করতে করতে একসময় তাঁর ডান হাতটি কেটে পড়ে যায়। তখন তিনি বাম হাতে পতাকা আঁকড়ে ধরেন। তবুও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। পরে শত্রুরা তাঁর বাম হাতটিও কেটে ফেলে। তখনো তিনি অবশিষ্ট দুই বাহু দিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরে উঁচু করে রাখেন মুসলিম বাহিনীর পতাকা। অবশেষে তিনিও শাহাদাতবরণ করেন। সে সময় জা'ফার (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শরীরের সামনের অংশে তরবারির নব্বইটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়।[৪৫৩]

এরপর নবিজি ﷺ-এর নির্দেশানুযায়ী পতাকা তুলে নেন আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। এগিয়ে যেতে যেতে একসময় ঘোড়া থেকে নেমে আক্রমণ শুরু করেন শত্রুদের। অবশেষে তিনিও শাহাদাত লাভ করেন।

সাবিত ইবনু আরকাম (রদিয়াল্লাহু আনহু) একরকম যেন উড়ে এসেই নবিজি ﷺ-এর পতাকাকে ধুলায় লুটানো থেকে রক্ষা করেন। এরপর তিনি মুসলিমদের আহ্বান করেন

[৪৫২] যাদুল মাআদ, ২/১৫৬; ইবনু হিশাম, ২/৩৭৩-৩৭৪।

[৪৫৩] বুখারি, ৪২৪৪, ৪২৪৫; ইবনু হিশাম, ৪/২০; যাদুল মাআদ, ২/৫৬৯।

কোনও একজনকে নিজেদের আমীর নির্বাচন করে নিতে। মুসলিমদের ঐকমত্যে নতুন সেনাপতি হন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)। যিনি কুরাইশ সেনাপতি হিসেবে আগেও নিজের দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। পতাকা চলে আসে খালিদের হাতে। খালিদ ধেয়ে গিয়ে এত প্রবলভাবে লড়াই করেন যে, সেদিন তার একার হাতেই ভেঙেছিল নয়টি তরবারি।

ওদিকে মদীনায় বসেই সুদূর মূতায় চলমান যুদ্ধের খবরাখবর ওহির মাধ্যমে জানতে পারেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিন মুসলিম সেনাপতির সকলেই শহীদ হয়েছেন। নতুন সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। তখন নবিজি ﷺ তাকে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) বলে সম্বোধন করেন।[৪৫৪]

সূর্যাস্তের সময় উভয় সেনাদল নিজ নিজ শিবিরে ফিরে আসে। এবার শুরু হয় সাইফুল্লাহর সামরিক কলাকৌশলের জাদু। পরদিন সকালে খালিদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেনাসারিকে নতুন করে সাজান। সামনের সেনাদের পেছনে, পেছনের সেনাদের সামনে নিয়ে আসেন। একইভাবে ডান-বামের সেনাদেরও স্থানান্তর করান। রোমানরা দূর থেকে দেখে ধরে নেয় যে, শত্রুরা তাদের রাজধানী থেকে আরও বাহিনী নিয়ে এসেছে। ঘটনার এই পটপরিবর্তনে মনোবল একেবারেই ভেঙে যায় তাদের।

হালকা কিছু দাঙ্গার পর খালিদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেনাদলকে নিয়ে আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসেন। কিন্তু তা দেখেও রোমানরা এগিয়ে আসার সাহস পায় না। তারা ভাবে যে, শত্রুদের এই পিছিয়ে যাওয়াটা নিশ্চয়ই কোনও ফাঁদ হবে হয়তো। ওদিকে নতুন সেনাও নিয়ে এসেছে, আবার তাদের টেনে মরুভূমির ভেতরেও নিয়ে যাচ্ছে—এই ভেবে তারাও পেছাতে থাকে। সাতদিন ধরে ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধ চালানোর পর উভয় সেনাদল সম্পূর্ণ পিছু হটে। শেষ হয় যুদ্ধ।[৪৫৫]

এই যুদ্ধে বারো জন মুসলিম শহীদ হন। আর কাফিরদের বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। তবে এদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি।

যাতুস সালাসিলের অভিযান (জুমাদাল আখিরাহ, ৮ম হিজরি)

এই যুদ্ধটি সম্পন্ন হয় মূতার যুদ্ধের এক মাস পরে অষ্টম হিজরি সনের জুমাদাল আখিরাহতে। মুসলিম সেনাদল একটি জলাধারের পাশের ভূমিতে শিবির গাড়েন।

---

[৪৫৪] বুখারি, ৪২৬২।

[৪৫৫] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ৭/৫১৩-৫১৪; যাদুল মাআদ, ২/১৫৬।

সেখানকার জায়গাটির নাম ছিল 'যাতুস সালাসিল'। এই কারণে অভিযানটির নামও হয় তারই নামে।

মূতার যুদ্ধেই প্রমাণিত হয়েছে যে, রোমানপন্থী সিরিয়ান আরবরা মুসলিমদের জন্য বড় হুমকি। এদের শায়েস্তা না করলে এরা ইসলামের জন্য বড় বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। নবি ﷺ এ উদ্দেশ্যেই মূতার যুদ্ধের এক মাস পর আমর ইবনুল আস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে তিন শ জনের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। সাথে ছিল ত্রিশটি ঘোড়া। উদ্দেশ্য বালি গোত্রের মিত্রতা আদায়। মায়ের দিক থেকে আমর এ গোত্রেরই বংশধর। যদি গোত্রটির কাছ থেকে নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি আদায় করা না যায়, তাহলে রোমানদের পক্ষ নেওয়ার জন্য বালি গোত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আক্রমণ করা হবে।

সেনাদল সিরিয়ার কাছাকাছি হতেই জানা গেল যে, সিরিয়ানরা আগে থেকেই নিজেদের বড় এক সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছে। লোকবলের আবেদন জানিয়ে মদীনায় খবর পাঠান আমর। নবি ﷺ আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে আরও দুই শ জন দক্ষ সেনা প্রেরণ করেন। তবে সেনাপতি ও আমীর হিসেবে আমর ইবনুল আস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বহাল থাকেন।

লোকবল এসে পৌঁছানোর পর মুসলিম সেনাদল কাদাআ অঞ্চলের বড় একটি অংশ পার হন। একটি শত্রুদল মুখোমুখি হলে তীব্র আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন মুসলিমরা।[৪৫৬]

মক্কা বিজয় (রমাদান, ৮ম হিজরি)

ওই একই বছরের রমাদান মাস। এবার আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে সম্মানিত করেন বহুলাকাঙ্ক্ষিত সেই অনুগ্রহ দিয়ে—মক্কাবিজয়। দ্বীনের ইতিহাসে এটি মহত্তম বিজয়। এই বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ যেমন তাঁর দ্বীন ও নবিকে সম্মানিত করেন, তেমনি নিজের পবিত্র মাসজিদ ও শহরকে মুক্ত করেন কাফিরদের নাপাক হাত থেকে। এরই সূত্র ধরে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে আরবরা।

হুদাইবিয়া চুক্তিতেই সুপ্ত ছিল এ বিজয়ের বীজ। শর্তমতে, অন্য যে কেউ এসে দুই পক্ষের যেকোনোটির সাথে সন্ধি করতে পারবে। আগেই বলা হয়েছে যে, বানূ খুযাআ মুসলিমদের পক্ষ নেয়, আর বানূ বকর মৈত্রী করে কুরাইশদের সাথে।

---

[৪৫৬] ইবনু হিশাম, ২/৬২৩-৬২৬; যাদুল মাআদ, ২/১৫৭।

বানূ খুযাআ এবং বানূ বকর গোত্রের ঠোকাঠুকি সেই জাহিলি যুগ থেকেই। হুদাইবিয়ার এই চুক্তির সময় এসেই তারা দুর্লভ এক শান্ত সময় পার করছে। এমন সময় বানূ বকরের মাথায় এল এক কূটবুদ্ধি। শক্তিধর কুরাইশকে সাথে পেয়ে এর সদ্ব্যবহার করতে চাইল তারা। অষ্টম হিজরি সনের শা'বান মাসে 'ওয়াতীর' নামক একটি ঝরনার ধারে বানূ খুযাআ গোত্রকে তারা অতর্কিতে হামলা করে বসে। বিশ জনকে হত্যা করে ফেলে বানূ বকর। বাকিদের তাড়িয়ে নিয়ে আসে মক্কার ভেতর। নিয়মনীতির কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে পবিত্র এই শহরের ভেতরও চালাতে থাকে তাদের সন্ত্রাসী আগ্রাসন। লোকবল আর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাতে সাহায্য করে কুরাইশ।

বানূ খুযাআ শুধু মুসলিমদের সাথে মৈত্রীই করেননি; বরং তাদের অনেকে ইসলামও গ্রহণ করেছিল। কুরাইশ-বানূ বকর জোটের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ব্যাপারে নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে অনুযোগ করে তারা। রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃপ্ত কণ্ঠে কথা দেন, "আল্লাহর কসম! আমরা নিজেদের যেভাবে সুরক্ষা করি, তোমাদেরও ঠিক সেভাবেই সুরক্ষা করব।"

ওদিকে কুরাইশরা তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে অনুশোচনায় পুড়ছে তখন। চুক্তিভঙ্গের মারাত্মক পরিণাম নিয়ে অস্থির হয়ে আছে তারা। চুক্তি নবায়ন ও মেয়াদ বাড়ানোর অনুরোধ নিয়ে তাই মদীনায় দৌড়ে এলেন আবূ সুফ্‌ইয়ান ইবনু হারব। মদীনায় অবস্থানকালীন আপন কন্যা নবিজির স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথেও দেখা করতে যান তিনি। যেই না বসতে যাবেন, অমনি উম্মু হাবীবা বিছানা গুটিয়ে ফেলেন। আঁতে ঘা লাগলেও একটু সামলে নিয়ে আবূ সুফ্‌ইয়ান বলেন, "বিছানা সরিয়ে ফেললে যে? আমাকে এটার যোগ্য মনে করছ না, নাকি বিছানাটাই আমার যোগ্য না?"

মেয়ের শীতল জবাব, "এটি নবিজির বিছানা। আপনি নাপাক মূর্তিপূজারি; এটাতে বসতে পারবেন না।"

এবারে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় আবূ সুফ্‌ইয়ানের। বলেন, "আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর থেকেই উচ্ছন্নে গেছিস তুই!"

সেখান থেকে বেরিয়ে এবার আসল কাজে মনোযোগ দেন তিনি। নবিজি ﷺ-এর সাথে দেখা করে চুক্তি নবায়ন ও দীর্ঘায়নের কথাটা পাড়েন। কিন্তু কোনও জবাব পেলেন না কথার। দৌড়ে গেলেন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে। অনুরোধ করলেন তার হয়ে নবিজিকে একটু অনুরোধ করতে। কিন্তু আবূ বকরও সাহায্য করতে নারাজ।

এরপর উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে গিয়ে শুধু অসহযোগিতা না, রীতিমতো ধমক খেয়ে আসেন আবূ সুফ্ইয়ান। শেষ চেষ্টা হিসেবে ধরনা দেন আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে। এখানেও বিধিবাম। সাহায্য করতে অপারগতা জানিয়ে আলি তাকে পরামর্শ দিলেন যে, এমনিই সবার মাঝে একটি অহিংসতার ঘোষণা দিয়ে চলে যেতে। আবূ সুফ্ইয়ান তা-ই করে মক্কায় ফিরে গেলেন।

নবি ﷺ কিন্তু এদিকে ঠিকই যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন সাহাবিদের এবং মদীনার শহরতলিতে বসবাসরত বেদুইনদের। তিনি দুআ করেন, "হে আল্লাহ, গুপ্তচরদের এবং আমাদের প্রস্তুতির খবর কুরাইশদের নিকট পৌঁছানো থেকে বিরত রাখুন। যাতে আমরা তাদের ভূমিতে অতর্কিতে পৌঁছে যেতে পারি।"

আবূ কাতাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নবিজি ﷺ মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে বাতনু ইদামের দিকে পাঠান। উদ্দেশ্য হলো শত্রুদের ধোঁকা দেওয়া। তারা ভাববে যে, মুসলিমদের মনোযোগ এখন ওই অঞ্চলে।[৪৫৭]

কিন্তু এদিকে হাতিব ইবনু বালতাআ (রদিয়াল্লাহু আনহু) কুরাইশদের কাছে একটি চিঠি লেখেন। নবি ﷺ যে মক্কায় আক্রমণ করবেন, সেই খবর চিঠিতে জানিয়ে দেন তিনি। এক মহিলাকে টাকার বিনিময়ে চিঠিটি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেন।

ওহির মাধ্যমে হাতিবের এ কাজটির কথা নবিজি ﷺ-কে জানিয়ে দেন আল্লাহ তাআলা। কালবিলম্ব না করে আলি, মিকদাদ, যুবাইর এবং আবূ মারসাদ গানাবি (রদিয়াল্লাহু আনহুম)-কে আল্লাহর রাসূল ﷺ আদেশ দিয়ে বলেন, "এক দৌড়ে খাখ চারণভূমিতে চলে যাও। দেখবে উটে করে একটি মহিলা যাচ্ছে। তার কাছে একটা চিঠি আছে। যেকোনও মূল্যে সেটা ছিনিয়ে আনবে।"

সাহাবিরা কথামতো তা-ই করলেন। মহিলাটি কোনও চিঠির কথা অস্বীকার করায় তারা হুমকি দেন উলঙ্গ করে তল্লাশি করার। তখন সে ভয় পেয়ে চিঠিটি বের করে তুলে দেয় তাদের হাতে। সাহাবিদের দলটি চিঠি নিয়ে ফিরে আসেন মদীনায়। নবি ﷺ হাতিব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডাকিয়ে বললেন, "হাতিব, এটা কী?"

দোষ স্বীকার করে হাতিব (রদিয়াল্লাহু আনহু) কৈফিয়ত দেন, আমি কুফরি করার উদ্দেশ্যে এমনটা করিনি, আমি আমার পরিবারকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।

---

[৪৫৭] ইবনু হিশাম, ২/২২৬-২২৮; যাদুল মাআদ, ২/১৫০।

ওরা সবাই মক্কায়। কিন্তু ওখানে তো অন্য সবার মতো আমার প্রভাবশালী কোনও আত্মীয় নেই। ভেবেছিলাম কুরাইশদের এই উপকারটা করলে ওরা আমার পরিবারকে একটু রেহাই দেবে, দেখে রাখবে।"

ক্রোধে গর্জে ওঠেন উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু), "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন! আমি এই মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দিই। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে।"

নবিজি ﷺ শান্ত স্বরে বলেন, "শোনো উমর, হাতিব বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা বদরের সব যোদ্ধাকে রহম করে বলেছে, তোমরা এখন থেকে যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।"

কথাগুলো উমরের হৃদয় নিংড়ে চোখে অশ্রু তুলে আনে। বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন।"[৪৫৮]

• মক্কার পথে

অষ্টম হিজরির ১০ রমাদান। মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বেরোলেন নবিজি ﷺ। সাথে আছেন পুরো দশ হাজার সাহাবি। মদীনার দায়িত্বে রেখেছেন আবূ রুহ্‌ম গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে। জুহফায় এসে নবিজি ﷺ তাঁর চাচা আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দেখা পান। ইসলাম গ্রহণ করে মাত্রই সপরিবারে মদীনায় আসছিলেন তিনি।

নবি ﷺ-এর চাচাতো ভাই আবূ সুফ্‌ইয়ান[৪৫৯] ইবনুল হারিস এবং ফুপাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনু আবী উমাইয়াও এ পথ ধরেই যাচ্ছিলেন। 'আবওয়া' নামক স্থানে তারা নবিজির সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু নবিজি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। দু'জনেই এককালে ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে অনেক কষ্ট দিয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। নবিজিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখে উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহা) নবিজিকে বলেন, "এমন হওয়া তো উচিত নয় যে, আপনারই চাচাতো, ফুপাতো ভাইয়েরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগা হবে?" আর আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) আবূ সুফ্‌ইয়ানকে উপদেশ দেন, নবিজি ﷺ-এর কাছে গিয়ে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ভাইদের মতো করে ক্ষমা চাইতে। তারা বলেছিল:

---

[৪৫৮] বুখারি, ৩০০৭।

[৪৫৯] এই আবূ সুফ্‌ইয়ান এবং মুশরিকদের সেনাপতি আবূ সুফ্‌ইয়ান ইবনু হারব আলাদা ব্যক্তি।

﴿تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾﴾

"আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর নিশ্চয়ই আমরা পাপাচারী।"[৪৬০]

লজ্জিত আবূ সুফ্ইয়ান নবিজির কাছে এসে ওই কথারই পুনরাবৃত্তি করে। ফলে নবিজি ﷺ-ও ঠিক সেই জবাবই দেন, যা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) দিয়েছিলেন তাঁর ভাইদের উদ্দেশ্যে:

﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾﴾

"আজ তোমাদের প্রতি কোনও আক্রোশ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সব দয়ালুর চাইতে অধিক দয়ালু।"[৪৬১]

ক্ষমা পেয়ে উচ্ছ্বসিত আবূ সুফ্ইয়ান কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসা করেন এবং নিজের অপারগতা প্রকাশ করেন।[৪৬২]

কাদীদে পৌঁছানোর পর নবিজি ﷺ দেখেন সাহাবিদের সিয়াম ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি নিজে সিয়াম ভেঙে সাহাবিদেরও ভাঙার নির্দেশ দেন।[৪৬৩] তারপর যাত্রা পুনরারম্ভ করে প্রায় ইশার ওয়াক্তে এসে পৌঁছান মাররুয যাহরানে। প্রতিটি সৈনিককে নিজের জন্য একটি করে আগুন জ্বালাতে বলা হয়। ফলে পুরো এলাকায় জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে দশ হাজার আগুন। পুরো বিষয়টি তদারক করেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

এতগুলো আগুন দেখে তাঁবুর সংখ্যা চিন্তা করে মাথা ঘুরে যায় মুশরিক সেনাপতি আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হারবের। হাকীম ইবনু হিযাম আর বুদাইল ইবনু ওয়ারাকা তার সাথেই ছিল। তাদের এই দৃশ্য দেখিয়ে বলেন, "এর আগে এত বিরাট শিবির আর আগুন আমার জীবনে কখনও দেখিনি!"

বুদাইল বললেন, "এরা মনে হচ্ছে খুযাআ?"

আবূ সুফ্ইয়ান বললেন, "খুযাআ তো এরচেয়ে অনেক কম এবং দুর্বল। তাদের সাধ্য

---

[৪৬০] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৯১।

[৪৬১] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৯২।

[৪৬২] ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ২/১৬২-১৬৩।

[৪৬৩] বুখারি, ৪২৭৫।

নেই এতবড় সেনাবাহিনী তৈরি করার।"

• নবিজি ﷺ-এর কাছে আবূ সুফ্ইয়ান

নবিজি ﷺ-এর খচ্চরের পিঠে চড়ে ঘোরাফেরা করছিলেন আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)। এমন সময় একটি কণ্ঠস্বর শুনে সাথে সাথে চিনে ফেলেন তিনি। ডেকে ওঠেন, "আবূ হানযালা নাকি?"

আবূ সুফ্ইয়ান জবাব দেন, "জি। আপনি কি আবুল ফাদল?"

"হ্যাঁ।"

"আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরাবান হোক! বলুন তো, ঘটনা কী?"

"ঘটনা কিছুই না। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সেনাদল নিয়ে বের হয়েছেন। কুরাইশদের ধ্বংস অত্যাসন্ন।"

"আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক! এখন উপায়?"

"মুসলিমরা কেউ আপনার উপস্থিতি টের পেলে সাথে সাথে মেরে ফেলবে। আসেন, আমার খচ্চরের পেছনে ওঠেন। আমি আপনাকে সরাসরি নবিজির কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

আবূ সুফ্ইয়ান উঠে বসলেন আব্বাসের খচ্চরের পেছনে। দু'জনে গিয়ে পৌঁছালেন নবিজি ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে। উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু) দেখামাত্র বললেন, "আবূ সুফ্ইয়ান, আল্লাহর শত্রু! সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর, যিনি তোমাকে কোনও চুক্তি ছাড়াই আমাদের কব্জায় তুলে দিলেন।"

অনাহূত এই অতিথির কথা নবিজি ﷺ-কে জানাতে ছুটে গেলেন উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) খচ্চর চালিয়ে উমরের আগেই পৌঁছে গেলেন। উমর তাতে দমার পাত্র নন। নবিজি ﷺ-এর কাছে গিয়ে আবূ সুফ্ইয়ানকে হত্যার অনুমতি চান তিনি।

আব্বাস বাধা দিলেন, "আমি নিরাপত্তা দিয়েছি উনাকে।" তারপর তিনি আলতো করে নবিজির মাথায় হাত রেখে বলেন, "আজ রাতে আল্লাহর রাসূলের সাথে শুধু আমি কথা বলব।" উমর বারংবার অনুমতি চাইতে থাকেন আবূ সুফ্ইয়ানকে হত্যার। কিন্তু নবি ﷺ কিছু না বলে চুপ থাকেন।

কিছুক্ষণ পর আব্বাসকে নবিজি বলেন, "উনাকে (আবূ সুফ্ইয়ানকে) আপনার ঘরে

নিয়ে যান। কাল সকালে আমার নিকট নিয়ে আসবেন।"

সকাল হলো, আবূ সুফ্ইয়ানও এল। নবি ﷺ তাকে বললেন, "আবূ সুফ্ইয়ান, আপনার জন্য আফসোস! আপনার কি এখনও সময় আসেনি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য বলে মেনে নেওয়ার?"

আবূ সুফ্ইয়ান বললেন, "আমার বাবা-মা আপনার তরে কুরবান হোক! আপনি কতই-না দয়ালু, নম্র আর মহান! আল্লাহ ছাড়া যদি আর কোনও উপাস্য থাকতই, তাহলে আজ পর্যন্ত নিশ্চয়ই সে আমার কোনো-না-কোনো সাহায্য করত।"

নবি ﷺ আবারও বললেন, "আবূ সুফ্ইয়ান, আপনার জন্য আফসোস! আপনার কি এখনও সময় আসেনি আমাকে নবি ও রাসূল বলে মেনে নেওয়ার?"

আবূ সুফ্ইয়ান বললেন, "এটা নিয়ে আমার এখনও একটু সন্দেহ আছে।"

আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) মাঝপথে বাধা দিলেন, "এটা বোঝার আগে আগেই আপনার গর্দান কাটা যাবে। ইসলাম গ্রহণ করে নিন।" এরপর আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হারব (রদিয়াল্লাহু আনহু) কালিমাতুশ শাহাদাহ পাঠ করে ইসলামে প্রবেশ করেন।

আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) অনুনয় করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবূ সুফ্ইয়ান মর্যাদা ভালোবাসে। ওনাকে একটু মর্যাদা দিয়ে দিন।"

নবি ﷺ বললেন, "হ্যাঁ। যে কেউ আবূ সুফইয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে কেউ নিজ নিজ ঘরের দরজা আটকে দেবে, সেও নিরাপদ। আর যারা মাসজিদুল হারামের ভেতরে প্রবেশ করবে, তারাও নিরাপদ।"[৪৬৪]

• নবি ﷺ-এর মক্কায় প্রবেশ

সেদিন সকালেই শিবির ছেড়ে মক্কার উদ্দেশে রওনা হন নবি ﷺ। আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্দেশ দেন আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হারব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে উপত্যকার শেষ মাথায় পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যেতে। মুসলিম বাহিনীর কুচকাওয়াজ যেন ভালো করে চোখে পড়ে তার। আব্বাস তা-ই করেন। আর আবূ সুফ্ইয়ান অবাক বিস্ময়ে দেখেন সাগরের মতো সুবিশাল এক সেনাদলকে।

একেকটি গোত্রের হাতে একেক রঙের পতাকা। একটি দল পার হয় আর আবূ সুফ্ইয়ান

---

[৪৬৪] মুসলিম, ১৭৮০; তহাবি, শারহু মাআনিল আসার, ৩/৩২০।

তাদের নাম জিজ্ঞেস করেন। গোত্রটির নাম জানার পর বলেন, "এদের সাথে আমার কী সম্পর্ক?"

তারপর সা'দ ইবনু উবাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে দৃপ্ত পদক্ষেপে আসে আনসারদের দলটি। পতাকাবাহী সা'দ ইবনু উবাদা আবূ সুফ্ইয়ানকে দেখতে পেয়ে ডেকে ওঠেন, "আবূ সুফ্ইয়ান, আজ সংঘর্ষ আর রক্তপাতের দিন, আজকে কা'বার পবিত্রতা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে!!"

আবূ সুফ্ইয়ান পাশ ফিরে বললেন, "আব্বাস, ধ্বংস আর রক্তপাতের দিন মুবারক হোক!"

সবশেষে আসা দলটিকে দেখে আবূ সুফ্ইয়ান যথারীতি বললেন, "আব্বাস, এরা কারা?" আব্বাস জানালেন যে, এবার মুহাজির ও আনসারদের সারি সাথে নিয়ে স্বয়ং নবি ﷺ যাচ্ছেন। আবূ সুফ্ইয়ান আবারো ভালো করে দেখলেন। বললেন, "কার সাধ্যি এদের থামানোর? আপনার ভাতিজার রাজ্য আজ সত্যিই চোখ-ধাঁধানো আকৃতি লাভ করেছে।"

আব্বাস বললেন, "এটি হলো নুবুওয়াত।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আবূ সুফ্ইয়ান, "হ্যাঁ। বাস্তবেই।"

সা'দের ওই কথাটি আবূ সুফ্ইয়ানকে ভীষণ ভীত করে রেখেছিল। নবিজির কাছে এ কথার ব্যাপারে অনুযোগ করেন তিনি। রাসূল ﷺ খুবই রাগ করেন সা'দের এমন দাম্ভিক উক্তি শুনে। জবাব দেন,

"সা'দ মিথ্যা বলেছে। আজকের এই দিনে আল্লাহ তাআলা কা'বাকে সম্মানিত করবেন। আজ কা'বাকে গিলাফ পরানো হবে।"

এই বলে নবি ﷺ সা'দের হাত থেকে পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরই ছেলে কাইস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে তুলে দেন। বিজয়ের আনন্দের অতিশয্যে মক্কাবাসীদের ওপর হয়তো জুলুম করে ফেলবেন সা'দ (রদিয়াল্লাহু আনহু), এমন শঙ্কা থেকেই নবি ﷺ এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ওদিকে আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হারব (রদিয়াল্লাহু আনহু) দ্রুত মক্কায় ফিরে গিয়ে লোক জড়ো করে ঘোষণা দিলেন,

"ওহে কুরাইশ জনগণ, যে সেনাশিবির দেখেছিলাম, ওটা মুহাম্মাদের। তিনি আজ

অপ্রতিরোধ্য এক সেনাদল নিয়ে এগিয়ে আসছেন। আজ তাঁদের কেউ ঠেকাতে পারবে না। এ জন্যে তিনি বলেছেন, যারা যারা আবূ সুফইয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, তারা নিরাপদ।"

কেউ একজন রাগত-কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আপনার ওপর আল্লাহর লা'নত! আপনার ঘরে কতজন লোকেরই-বা জায়গা হবে?"

আবূ সুফ্‌ইয়ান বললেন, "এবং যারা নিজ নিজ ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখবে, তারাও নিরাপদ। আবার যারা কা'বায় ঢুকে যাবে, তারাও নিরাপদ।" এ কথা শুনেই সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে দ্রুত নিজ নিজ ঘরে, আর কা'বার দিকে ছুটতে থাকে।

এদিকে নবি ﷺ এসে পৌঁছালেন যূ-তুওয়ায়। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্দেশ দিলেন বামদিকের সেনাসারিকে নিয়ে 'কুদা' হয়ে মক্কার নিম্নভূমিতে প্রবেশ করতে। কুরাইশদের কেউ বাধা দিতে আসলেই কতল। সেনা-সারিটি সাফা পর্বতের কাছে গিয়ে আবার নবি ﷺ-এর সাথে মিলিত হবে।

নবিজির পতাকাবাহী এবং ডান সেনা-সারির নেতা যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলা হলো 'কাদা'র ওপরের অংশ দিয়ে মক্কায় ঢুকতে। সামনে এগিয়ে গিয়ে পতাকা গাড়তে হবে হাজূনে। নবিজি ﷺ এসে পৌঁছানো পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করবেন তিনি। আর পদাতিক বাহিনী ও নিরস্ত্র সেনাদের নেতা আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) 'বাতনু ওয়াদি' দিয়ে মক্কায় নামবেন। তারই পেছন পেছন আসবেন আল্লাহর রাসূল ﷺ।

কুরাইশরা এ-সময় সফওয়ান ইবনু উমাইয়া, ইকরিমা ইবনু আবী জাহল এবং সাহল ইবনু আমরের নেতৃত্বে খান্দামায় একটি সেনাদল নিযুক্ত করে। এটাই আজ তাদের প্রথম প্রতিরক্ষা-সারি এবং এটাই শেষ। মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে যদি এদের পতন ঘটে, তাহলে মক্কার ওপর মুসলিম-আধিপত্য মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও বিকল্প রইবে না। আসলেও সেদিন কুরাইশদের সামনে আল্লাহর ফায়সালা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। দীর্ঘ প্রায় একুশ বছর ধরে সব অত্যাচার-আক্রমণকে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য ও প্রতিরোধ করেছে মুসলিমরা। আজ সময় এসেছে অবিসংবাদিত ও চূড়ান্ত বিজয়ী হিসেবে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মক্কায় প্রবেশ করার।

খালিদ-বাহিনীর সাথে মাক্কি প্রতিরোধ বাহিনীর হালকা সংঘর্ষ হয়। ফলে বারো জন মুশরিক নিহত হয়, বাকিরা পিঠটান দেয় মক্কার দিকে। এরপর বিনা বাধায় মক্কায় ঢুকে পড়েন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর দল। নির্বিঘ্নে কুচকাওয়াজ

করতে করতে এগিয়ে চলেন মক্কার রাজপথ আর অলিগলি ধরে। অবশ্য তাদের থেকে পৃথক হয়ে পড়া দু'জন সাহাবি শহীদও হয়েছিলেন। অবশেষে সাফা পাহাড়ের কাছে এসে কথামতো নবি ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন খালিদ।[৪৬৫]

ওদিকে যুবাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু) হাজূনে পৌঁছে ফাতহ্ মাসজিদের কাছে পতাকা গাড়েন। উম্মু সালামা এবং মাইমুনা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর জন্য সেখানে একটি তাঁবু খাটান তিনি। তারপর তাঁরা নবিজি ﷺ-এর নির্দেশমতো তাঁর আসার অপেক্ষায় থাকেন। নবিজি সেখানে পৌঁছে একটু বিশ্রাম করে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে সাথে নিয়ে আবারও এগোতে শুরু করেন।

অবশেষে আল্লাহর নির্ধারিত সেই মুহূর্ত চলে আসে। তাঁর বান্দারা এখন স্বাধীনভাবে তাঁর ইবাদাত করবে। বিজয়ী, অথচ বিনয়ী বেশে অনুসারীদের মধ্যমণি হয়ে সূরা ফাতহ্ তিলাওয়াত করতে করতে মক্কায় প্রবেশ করেন মুহাম্মাদ ﷺ। হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে কা'বা তওয়াফ করেন তিনি। নিজেদের কব্জায় থাকাকালে কা'বায় ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল মুশরিকরা। নবি ﷺ তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে প্রতিটাকে খোঁচা মারেন আর তিলাওয়াত করেন,

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿١٨﴾

"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।"[৪৬৬]

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٩٤﴾

"সত্য এসে গেছে আর মিথ্যার উৎপত্তি হবে না এবং এর পুনরুদ্ভবও হবে না।"[৪৬৭]

লাঠির সেই খোঁচায় মূর্তিগুলো ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে নিজ নিজ চেহারার ওপর পড়তে থাকে।[৪৬৮]

---

[৪৬৫] বুখারি, ৪২৮০; ইবনু হিশাম, ৩১/৪।
[৪৬৬] সূরা ইসরা, ১৭ : ৮১।
[৪৬৭] সূরা সাবা, ৩৪ : ৪৯।
[৪৬৮] বুখারি, ৪২৮৭।

• কা'বা পবিত্রকরণ ও সালাত আদায়

আল্লাহর ঘর তওয়াফ শেষে উসমান ইবনু তালহাকে ডাকিয়ে আনেন রাসূল ﷺ। উসমান কা'বার চাবি-রক্ষক। তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে নবিজি কা'বার দরজা খোলেন। ভেতরে রাখা মূর্তিগুলোও বের করে এনে ভেঙে ফেলা হয়, মিটিয়ে দেওয়া হয় সব ছবি ও চিত্র। এরপর উসামা ইবনু যাইদ এবং বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে সাথে নিয়ে নবিজি ভেতরে ঢুকে কা'বার দরজা আটকে দেন। সামনের দেয়ালের দিকে মুখ করে এ থেকে প্রায় তিন হাত দূরত্বে দাঁড়ান তিনি। একটি খুঁটি বামদিকে, দুটি ডানদিকে আর পেছনে তিনটি। সেখানে দাঁড়িয়ে নবি ﷺ দু-রাকাআত সালাত আদায় করেন। তারপর আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করতে করতে হেঁটে বেড়ান মাসজিদুল হারাম ঘিরে।[৪৬৯]

• শত্রুদের পরিণাম

নবিজি ﷺ যখন দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন, ততক্ষণে চারপাশে কুরাইশদের ভিড় জমে গেছে। দুরুদুরু বুকে তারা বিজয়ী প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। কা'বার দরজার কাঠামো ধরে দাঁড়ান মহানবি ﷺ। কুরাইশরা সবাই এসে তাঁর সামনে জড়ো হয়। একসময়কার দুর্বিনীত নিপীড়ক, আজ তারা সবাই সবিনয়ে উপস্থিত। নবি ﷺ একটি দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন ইসলামের কিছু আদেশ-নিষেধ এবং বাতিল করেন সকল মুশরিকি প্রথা-প্রচলন। তারপর প্রশ্ন রাখেন, "কুরাইশগণ, আমার কাছ থেকে কেমন আচরণ আশা করেন?"

কুরাইশরা উত্তর দেয় "সবচেয়ে উত্তম আচরণ। আপনি আমাদের সম্মানিত এক ভাই এবং সম্মানিত এক ভাইয়ের সন্তান।"

নবি ﷺ জবাব দেন,

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء

> "আজ আপনাদের প্রতি কোনও আক্রোশ নেই। যান, আপনারা সবাই মুক্ত।"

ধীর পায়ে নেমে এসে মাসজিদ প্রাঙ্গণে বসেন নবি ﷺ। উসমান ইবনু তালহার হাতে চাবি বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, "চাবিটা তোমার কাছে আজীবন থাকবে। যে ছিনিয়ে নিতে চাইবে, সে জালিম।"[৪৭০]

---

[৪৬৯] বুখারি, ১৬০১।

[৪৭০] তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত, ১/১৫৫।

• আনুগত্য স্বীকার

সাফা পাহাড়ে উঠে আসেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। কা'বা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। দুআ করার জন্য হাত তোলেন তিনি। দুআ শেষে দলে দলে মানুষ আসতে থাকে তাঁর কাছে। উদ্দেশ্য, ইসলাম গ্রহণ এবং আনুগত্যের বাইআত গ্রহণ। প্রিয় সাহাবি আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বাবা আবূ কুহাফাও সেদিন ঈমান আনেন (রদিয়াল্লাহু আনহু)। বিষয়টি নবিজি ﷺ-কে দারুণভাবে আনন্দিত করে। অনেক নারীও সেদিন ইসলাম গ্রহণ করতে আসে। হাত স্পর্শ করা ছাড়া নবি ﷺ তাদের সবাইকে এই শপথবাক্য পড়ান,

"তোমরা আল্লাহর সাথে কোনোকিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তানদের হত্যা করবে না, কারও প্রতি অপবাদ আরোপ করবে না এবং সৎকাজে আমার অবাধ্যতা করবে না।"

সেদিনের বাইআত-গ্রহীতা নারীদের মাঝে আবূ সুফইয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতু উতবাও ছিলেন। তিনি ঘোমটা দিয়ে ছদ্মবেশে এসেছিলেন, প্রাণ নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে তার আচরণ ক্ষমার অযোগ্য। প্রতিশোধ গ্রহণ করবে এই আতঙ্কে তিনি অস্থির। শপথ নেওয়ার পর তিনি বলেন,

"হে আল্লাহর রাসূল, একটা সময় পৃথিবীর বুকে আপনার তাঁবুই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত। আর আজ আমার কাছে পৃথিবীজুড়ে আপনার তাঁবুর চেয়ে অধিক প্রিয় কোনও তাঁবু নেই।"

নবি ﷺ জবাব দেন, "যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, সেই সত্তার কসম! এমনটিই হওয়ার ছিল।"[৪৭১]

নবিজির মাজলিসের নিচে বসে তাঁর কথা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু)। শপথ গ্রহণের তদারকের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

কেউ কেউ ইসলামের তরে হিজরত করার বাসনা প্রকাশ করে বাইআত করতে আসেন। কিন্তু নবি ﷺ বলে দেন,

"মুহাজিররা এতদিনে হিজরতের সব সাওয়াব নিয়ে নিয়েছে। মক্কা যেহেতু বিজিত হয়ে গেছে, তাই মক্কা থেকে আর কোনও হিজরত নেই। তবে হ্যাঁ, জিহাদ এবং নিয়তের দরজা এখনও খোলা রয়েছে। আর যখন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার আহ্বান আসবে,

[৪৭১] বুখারি, ৩৮২৫।

তখনই বেরিয়ে পড়বে।"[৪৭২]

• দাগি আসামিদের মৃত্যদণ্ড

সাধারণ ক্ষমা বহাল থাকলেও কিছু দাগী অপরাধীকে সেদিন মৃত্যুদণ্ড দেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ। তাদের দেখামাত্র হত্যার নির্দেশ দেন, এমনকি তারা কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে ঝুলে থাকলেও। অবশেষে তাদের ঘিরে ধরেছে আল্লাহর ক্রোধ। প্রশস্ত পৃথিবী তাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। ইসলামবিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণের দায়ে দোষী সমগ্র মক্কাবাসী। এর মাঝে মাত্র চার জনকে সেদিন হত্যা করা হয়। ইবনু খাতাল, মিকইয়াস ইবনু সুবাবা, হারিস ইবনু নুফাইল এবং ইবনু খাতালের এক দাসী। কিছু কিছু সূত্রে অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, হারিস ইবনু তালাতিল খুযাঈ এবং উম্মু সা'দও মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে। তবে উম্মু সা'দ সম্ভবত ইবনু খাতালের সেই দাসীও হতে পারে। তাই সব মিলিয়ে এমন আসামীর সংখ্যা সর্বোচ্চ ছয়।

আরও চার জন মৃত্যুদণ্ড এড়াতে পেরেছিলেন সেদিন। প্রথমে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়েছিলেন তারা। তারপর ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণের কথা জানান। ফলে মাফ করে দেওয়া হয় তাদের। এরা হলেন আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনি আবী সার্‌হ, ইকরিমা ইবনু আবী জাহল, হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ এবং ইবনু খাতালের আরেক দাসী। কিছু উৎসে কা'ব ইবনু যুহাইর, ওয়াহশি ইবনু হারব এবং হিন্দ বিনতু উতবার নামও উল্লেখ করা হয়। সব মিলিয়ে সাত জন। রদিয়াল্লাহু আনহুম।

মৃত্যুদণ্ড না পেলেও সফওয়ান ইবনু উমাইয়া, যুহাইর ইবনু আবী উমাইয়া এবং সুহাইল ইবনু আমরসহ অনেকে প্রাণভয়ে লুকিয়ে ছিলেন। পরে তাদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। রদিয়াল্লহু আনহুম।

• বিজয়-সালাত

মধ্যাহ্নের দিকে রাসূল ﷺ তাঁর চাচাতো বোন উম্মু হানি বিনতু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে যান। তিনি সেখানে গোসল সেরে দুই দুই করে মোট আট রাকাআত সালাত আদায় করেন।[৪৭৩]

উম্মু হানির দুই মুশরিক দেবর লুকিয়ে ছিল সে ঘরেই। আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) যখন টের পেয়ে গেলেন যে, তার বোন দুই জন মুশরিককে ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখেছে।

---

[৪৭২] বুখারি, ১৮৩৩।

[৪৭৩] বুখারি, ১১০৩।

সাথে সাথে তাদের হত্যা করতে উদ্যত হন। উম্মু হানি (রদিয়াল্লাহু আনহা) এসে নবিজি ﷺ-এর কাছে অনুযোগ করেন। জবাবে নবি ﷺ বলেন, "তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি।"[৪৭৪]

• কা'বার ছাদে বিলালের আযান

যুহরের ওয়াক্ত হলে বিলাল ইবনু রবাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডাক দেন নবি ﷺ। তারপর কা'বার ছাদে উঠে তাঁকে আযান দেওয়ার আদেশ করেন। কা'বার ছাদ থেকে বিলালের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো আযান। এ তো শুধু সালাতের আহ্বান নয়, ইসলামের প্রতাপ ও বিজয়ের ঘোষণাও বটে। আল্লাহর পবিত্র ঘরে আল্লাহরই বড়ত্ব ঘোষণা হতে শুনে কতই-না শান্তি পেয়েছে মুমিনের কান! আর কতই-না অক্ষম রাগে ফেটে পড়েছে মুশরিকদের হৃদয়! বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ তাআলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

• আনসারদের আশঙ্কা

মক্কাবিজয় তো সুসম্পন্ন! পরশমণিটিও যদি এখানেই থেকে যায়, তাহলে? আনসারদের মনে গাঢ় হতে থাকে এই শঙ্কা। হাজার হোক, মক্কাই তো নবিজি ﷺ-এর পৈত্রিক ভিটে, এখানেই তাঁর গোত্রীয় শেকড়। সাফা পাহাড়ে দুআরত নবিজিকে গিয়ে আনসাররা নিজেদের ভয়ের কথা জানালেন। দুআ শেষে তাদের সেই অলীক ভয় দূর করে দিয়ে নবিজি বললেন, "আল্লাহর পানাহ! আমি তোমাদের সাথেই বাঁচব, তোমাদের সাথেই মরব।"

এই কথা শুনে আনসাররা মহাখুশি হয়। তাদের সমস্ত শঙ্কা ও আশঙ্কা দূর হয়ে যায়। হৃদয়-আত্মায় আচ্ছন্ন হয় অভূতপূর্ব এক অনাবিল প্রশান্তি।

উনিশ দিন মক্কায় অবস্থান করে রাসূল ﷺ জাহিলিয়াতের প্রতিটি চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেন। মক্কা হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ ও পবিত্র এক ইসলামী শহর। মাসজিদুল হারামের সীমানা নির্দেশ করে কয়েকটি স্তম্ভ গড়ে তোলা হয়। তারপর একজন ঘোষণাকারী সবাইকে জানিয়ে দেন যে, "যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন তার নিজ ঘরে থাকা সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলে।"

• উযযা, সুওয়া' ও মানাত—মূর্তি ধ্বংস

রমাদানের ২৫ তারিখ। নবি ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে প্রেরণ করেন নাখলায়। সাথে আছে ত্রিশ জন অশ্বারোহী। উদ্দেশ্য, উযযা মন্দির ভেঙে দিয়ে

[৪৭৪] বুখারি, ৩৫৭।

আসা। মুশরিকদের সবচেয়ে বড় মূর্তি ছিল এই উযযা। খালিদ একে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলেন।

একই মাসে আরেক অভিযানে পাঠানো হয় আমর ইবনুল আস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে। তার দায়িত্ব বানূ হুযাইলের প্রধান উপাস্য সুওয়া'-মূর্তি ধ্বংস করা। মক্কা থেকে ১৫০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে 'রুহাত' নামক স্থানে অবস্থিত মন্দিরটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন তিনি ও তার বাহিনী। সেখানকার পুরোহিত তাদের উপাস্যকে ভূপাতিত হতে দেখে উপলব্ধি করে যে, সত্যিকারের উপাস্যের কখনও এই পরিণতি হতে পারে না। ফলে তিনি মূর্তিপূজা ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আরও একটি মিথ্যা উপাস্য বাকি আছে। কালব, খুযাআ, গাসসান, আওস ও খাযরাজ গোত্রের সম্মিলিত উপাস্য 'মানাত'। এটির অবস্থান ছিল কুদাইদের পাশে 'মুশাল্লাল' নামক স্থানে। সা'দ ইবনু যাইদ আশহালি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ওপর দায়িত্ব বর্তায় বিশ জন ঘোড়সওয়ারসহ গিয়ে সেটি ভেঙে দিয়ে আসার। মূর্তি-মন্দির উভয়ই ধ্বংস করে শিরকের আরেকটি নোংরা ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করেন সা'দ ইবনু যাইদ। দিকে দিকে দৃশ্যমান হতে থাকে সাদৃশ্যহীন, চিরঞ্জীব, অদ্বিতীয় এক আল্লাহর অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা।

• বানূ জাযীমার কাছে খালিদ

এখন যথাসম্ভব বেশি বেশি মানুষের অন্তরে ইসলাম প্রোথিত করা সময়ের দাবি। তাই শাওয়াল মাসে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে নবি ﷺ পাঠালেন জাযীমা গোত্রের কাছে। মুহাজির, আনসার এবং বানূ সুলাইমের তিন শ জন সাথিও ছিলেন সঙ্গে।

ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেওয়ার পর বানূ জাযীমার লোকেরা চিৎকার করতে লাগল, "সাবানা! সাবানা!—আমরা আমাদের পূর্বধর্ম ত্যাগ করেছি! আমাদের পূর্বধর্ম ছেড়ে দিয়েছি!" তাদের এই উত্তর খালিদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে ধোঁকাবাজির মতো মনে হলো। জান বাঁচানোর ফন্দি ভেবে তাদের বন্দি করার পাশাপাশি কয়েকজনকে হত্যাও করে ফেলেন তিনি। এরপর একদিন সব সৈনিককে আদেশ দেন নিজ নিজ বন্দিকে হত্যা করতে। এই অন্যায় আদেশ মানতে অস্বীকৃতি জানান আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-সহ বেশ কয়েকজন সাহাবি।

ফিরে এসে ওই সৈনিকেরা নবি ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন। শিহরিত নবিজি দুআ করলেন, "হে আল্লাহ, খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে মুক্ত।"[৪৭৫] এরপর

[৪৭৫] বুখারি, ৪৩৩৯।

আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বানূ জাযীমার কাছে পাঠিয়ে নবিজি ﷺ নিহতদের পরিবার-পরিজনকে তাদের রক্তপণ হিসেবে যা পাওনা তা পরিশোধ করে দেন। যাদের সহায়-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। রক্তপণ আর ক্ষতিপূরণ দেওয়া শেষে বেঁচে যাওয়া অর্থটুকুও দিয়ে আসা হয় জাযীমা সদস্যদের।

অনেক সাহাবির কাছেই সমালোচিত হয় খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই কাজটি। আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে এ নিয়ে কথা কাটাকাটিও হয় তার। বাগ্‌বিতণ্ডার খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছালে তিনি ডাকিয়ে এনে বলেন,

"খালিদ, থামো। আমার সাহাবিদের কঠোর কিছু বলা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহর কসম! উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করো, তবু আমার কোনও সাহাবির এক সকালের কিংবা এক সন্ধ্যার ইবাদাতের নিকটও পৌঁছতে পারবে না।"[৪৭৬]

হুনাইনের যুদ্ধ (শাওয়াল, ৮ম হিজরি)

মক্কা বিজয়ের ফলে সেখানকার অধিবাসীরা তো চুপ মেরে গেছে। কিন্তু প্রতিবেশী কিছু গোত্র ইসলামকে শেষ করে দিতে ঠিকই হম্বিতম্বি জারি রাখে। সাকীফ আর হাওয়াযিন গোত্রের সাথে গোপন সলা-পরামর্শ চলে কাইস আইলান-এর। নিজেদের মাঝে তারা বলাবলি করে, "মুহাম্মাদ তো ওর নিজের জাতিকে হারিয়েই দিল। এবার তো যখন-তখন আমাদের ওপর হামলে পড়বে। তাহলে আমরাই আগেভাগে ব্যবস্থা নিচ্ছি না কেন?"

যেই কথা সেই কাজ। মালিক ইবনু আওফ নাসরির নেতৃত্বাধীনে তারা এক বিশাল বাহিনী জড়ো করে। হাজির হয় আওতাসে। নারী, শিশু আর গবাদি পশুগুলো পর্যন্ত সাথে করে নিয়ে আসে। যুদ্ধশিল্পে বহু বছরের অভিজ্ঞতাধারী দুরাইদ ইবনুস সিম্মাহ এসে যোগ দেয় হাওয়াযিন বাহিনীতে। সেনাদলের ভেতর উটের ডাক, গাধার রাসভ, ভেড়া-ছাগলের ম্যাঁ ম্যাঁ আর শিশুদের কান্না শুনতে পায় সে। মালিক ইবনু আওফের কাছে সে এর ব্যাখ্যা জানতে চায়।। মালিক জবাব দেয়, প্রতিটি সৈনিকের পেছনে তার সম্পদ আর পরিবার থাকবে। এতে করে প্রত্যেকেই তাদের রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়াই করবে।

[৪৭৬] বুখারি, ৪২৮০; মুসলিম, ১৭৮০; ইবনু হিশাম, ২/৩৮৯, ৪৩৭; যাদুল মাআদ, ২/১৬০-১৬৮।

দুরাইদ বিরোধিতা করে বলে, "আপনি দেখছি জাত রাখাল! মরুচারী বেদুইনকে বাধা দেওয়ার সাধ্যি কার? শুনুন! যুদ্ধে জিতলে জিতবেন আপনার ঢাল-তলোয়ার আর নিজের দক্ষতার মাধ্যমে। কিন্তু হারলে হারবেন পুরো পরিবার নিয়ে। এক কাজ করুন, যোদ্ধা ছাড়া বাকি সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিন।" কিন্তু মালিক তাতে অস্বীকৃতি জানায়। নারী, শিশু আর গবাদি পশুগুলোকে সে জড়ো করে আওতাসে। আর সেনাদল নিয়ে এগিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী উপত্যকা হুনাইনে। অপেক্ষায় থাকে হিংস্র আক্রমণের।

ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানতে পেরে নবি ﷺ-ও এগিয়ে চলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। অষ্টম হিজরির ৬ই শাওয়াল শনিবারে মক্কা থেকে বের হয় বারো হাজার সেনা। নবি ﷺ সফওয়ান ইবনু উমাইয়ার কাছ থেকে এক শ বর্ম অস্ত্রশস্ত্রসহ ধার নিয়েছেন। আর মক্কার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেছেন আত্তাব ইবনু উসাইদ (রদিয়াল্লহু আনহু)-কে।

পথে 'যাতুল-আনওয়াত' নামে বড় একটি গাছ রয়েছে। একসময় পৌত্তলিকদের যুদ্ধদেবতার মন্দির ছিল এটি। আরব মুশরিকরা এর ডালে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা এবং গোড়ায় অর্ঘ্য নিবেদন করাসহ আরও অনেক ধর্মীয় আচার পালন করত এখানে। সদ্য ধর্মান্তরিত হওয়া বিশাল জনগোষ্ঠীর অনেকে তখনো ইসলামের চেতনা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। এমনই কয়েকজন এসে নবিজি ﷺ-কে অনুরোধ করল, "আমাদের জন্যও একটি যাতুল-আনওয়াত বানিয়ে দিন, যেমন তাদের জন্য রয়েছে।"

নবি ﷺ সবিস্ময়ে জবাব দিলেন, "আল্লাহু আকবার! তোমরা ঠিক সে-রকম কথাই বলছ মূসার উম্মাত যেমন মূসাকে বলেছিল,

﴿اِجْعَلْ لَّنَا إِلَـٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾

'আমাদের জন্য ওদের দেব-দেবীর মতো একটি উপাস্য বানিয়ে দিন।' মূসা জবাব দিলেন, 'তোমরা হলে মূর্খ সম্প্রদায়!'[৪৭৭]

আসলে নিশ্চিতভাবে তোমরাও প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের পূর্বেকার জাতিদের অনুসরণ করবে।"[৪৭৮]

কিছু মুসলিম সেদিন নিজেদের শক্তিমত্তা নিয়েও অতি-আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। কেউ কেউ তো বলেই বসেন, সংখ্যার কারণে আজ তারা পরাজিত হবেন না। নবি ﷺ এহেন দাম্ভিকতায় খুবই রুষ্ট হন।

---

[৪৭৭] সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৩৮।

[৪৭৮] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/২১৮; তিরমিযি, ২১৮০।

সন্ধ্যায় এক অশ্বারোহী এসে খবর দেন যে, হাওয়াযিন তাদের নারী-শিশু-উট-ছাগল সব নিয়ে এসেছে। নবি ﷺ মুচকি হেসে বলেন, "ইনশা আল্লাহ, এই সবকিছু আগামীকাল মুসলিমদের গনীমাতে পরিণত হবে।"[৪৭১]

শাওয়াল মাসের ১০ তারিখে নবি ﷺ হুনাইনে এসে পৌঁছান। ভোরবেলায় উপত্যকায় নেমে আসার আগে সৈন্যদের অবস্থান নির্ধারণ করে দেন। মুহাজির, আওস এবং খাযরাজের পতাকা যথাক্রমে আলি ইবনু আবী তালিব, উসাইদ ইবনু হুদাইর এবং হুবাব ইবনুল মুনযিরের হাতে দেওয়া হয়। প্রতিটি গোত্রের হাতে আলাদা আলাদা পতাকা। নবিজির পরনে ছিল দুটি বর্ম। মুখ ও মাথা ঢেকে রেখেছিল শিরস্ত্রাণ। অগ্রবর্তী দলটি উপত্যকায় নামতে শুরু করে। কিন্তু লুকিয়ে থাকা শত্রু সম্পর্কে তখনো সবাই বেখেয়াল।

হঠাৎ করেই পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসে শত্রুসেনাদের অবিরাম তির। মুসলিম সেনাবাহিনী তখনো উপত্যকায় নামতে পারেনি। প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মুসলিম সারিতে। পড়িমরি করে পেছনে পালাতে থাকে সামনের সেনারা, তা দেখে পেছনের সেনারাও একই কাজ করে। দেখা দেয় প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা।

এভাবে পাশার দান উল্টে যাওয়ায় মুশরিকরা তো বটেই, নামমাত্র ইসলামে প্রবেশ করা ব্যক্তিরাও বেশ খুশি হয়ে ওঠে। আবূ সুফ্‌ইয়ান মন্তব্য করেন, "এরা দেখছি পালাতে পালাতে সাগরে গিয়ে পড়বে!"

সফওয়ানের এক ভাই আনন্দপ্রকাশ করে বলে, "ওদের জাদুটোনা আজ ভেঙে চুরমার।"

আরেক ভাইয়ের মন্তব্য, "মুহাম্মাদ আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা হেরে গেছে! তারা আর জীবনেও এক হতে পারবে না।"

নিজে মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও সফওয়ান এবং নতুন মুসলিম ইকরিমা ইবনু আবী জাহল তাদের তিরস্কৃত করেন এবং ধমকি দেন। হাওয়াযিনের কাছে পরাজিত হওয়ার চেয়ে কোনও কুরাইশের কাছে পরাজিত হওয়া ভালো।

সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও নবি ﷺ দৃঢ়পদে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকেন। খচ্চর এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে আবৃত্তি করেন,

---

[৪৭১] আবূ দাউদ, ২৫০১।

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ   أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

"আমি আল্লাহর নবি, মিথ্যাবাদী নই।
আমি আবদুল মুত্তালিবের ছেলে হই।"

আবূ সুফ্‌ইয়ান ইবনুল হারিস (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবিজির খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন এবং আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) ধরেছিলেন জিন, যেন নবি ﷺ দ্রুত শত্রুর কাছাকাছি চলে না যান।

এরপর রাসূল ﷺ বাহন থেকে নেমে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দুআ করেন। তারপর আব্বাসকে নির্দেশ দেন অন্য সাহাবিদের ডাক দিতে। আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কণ্ঠস্বর ছিল বেশ চড়া। বাইআতে রিদওয়ানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি উঁচু স্বরে আওয়াজ দেন, "গাছতলার সঙ্গীরা, তোমরা সবাই কোথায়?"

যারাই এ ডাক শুনলেন, তারা ফিরে না এসে পারলেন না। জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ! আমরা আসছি।' প্রায় এক শ জন এগিয়ে এলেন আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কণ্ঠ অনুসরণ করে। সঙ্গ পেয়ে নবি ﷺ নতুন করে আক্রমণ করলেন শত্রুদের ওপর। আবারও শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

তারপর আনসার এবং বানুল হারিস ইবনু খাযরাজের উদ্দেশ্যে আরেকটি ডাক দেওয়া হয়। একে একে উপত্যকায় ফিরে আসতে থাকেন মুসলিম সেনা-সারিগুলো। আস্তে আস্তে বেশ বড় একটি জামাআত একত্র হয়ে যায়।[৪৮০] নবি ও মুমিনদের ওপর আসমানি শান্তি নাযিল হয়। নব উদ্যমে উদ্দীপ্ত মুসলিমদের পাশাপাশি লড়াই করতে থাকেন অদৃশ্য এক সেনাবাহিনী। রাসূলুল্লাহ ﷺ একমুঠো বালু তুলে শত্রুর দিকে ছুড়ে মেরে বলেন, "সবার চেহারা বিকৃত হোক!" আল্লাহ তাআলার নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় এ বালু গিয়ে পড়ে প্রতিটি শত্রুসেনার চোখে। ফলে ঝাপসা চোখে এবার তাদের ছত্রভঙ্গ ও অসহায় হওয়ার পালা।

পলায়নপর শত্রুদের ধাওয়া করে মুসলিমরা সহজেই অনেককে হত্যা ও বন্দি করেন। সেই সাথে বন্দি হয় তাদের নারী-শিশুরাও। মুসলিমরা পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে চলে আসার ঠিক পরপরই আল্লাহ তাদের ঐক্যবদ্ধ করে দেন। নবিজি ﷺ-এর অলৌকিক এই বিজয় দেখে ইসলাম গ্রহণ করে মক্কার অনেক মুশরিক।

---

[৪৮০] বুখারি, ২৮৬৪; মুসলিম, ১৭৭৫।

• পলাতক শত্রুদল

মুশরিকদের তিনটি দল পালাতে সক্ষম হয়। সবচেয়ে বড় দলটি চলে যায় তায়িফে, আরেকটি নাখলায়, তৃতীয় আওতাসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ মূসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর চাচা আবূ আমির আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে একটি বাহিনীর নেতা নির্ধারণ করে আওতাস অভিমুখে পাঠান। তিনি শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত সফলভাবেই শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। তারপর আবূ মূসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। অতঃপর গনীমাতসহ সেনাদলকে যথাযথভাবে ফিরিয়ে আনেন।[৪৮১]

আরেকটি দল নাখলায় অবস্থানরত শত্রুবাহিনীকে তাড়া করে। সেখানে তারা দুরাইদ ইবনুস সিম্মাহকেও পাকড়াও করেন এবং তার জীবনাবসান ঘটান।

যুদ্ধ শেষে নবিজি ﷺ-এর নির্দেশে সব গনীমাত ও বন্দিদের এক জায়গায় জড়ো করা হয়। যা কিছু মুসলমানদের হস্তগত হয় তার মোট হিসেব হলো—২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার ছাগল, ১ লক্ষ ৬০ হাজার দিরহাম এবং ৬ হাজার নারী ও শিশু। সবকিছুকে একসাথে জি'ইর্‌রনায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুরো ব্যাপারটির তত্ত্বাবধানে থাকেন মাসউদ ইবনু আমর গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

তায়িফের যুদ্ধ (শাওয়াল, ৮ম হিজরি)

একই বছরের শাওয়াল মাসে আরেকটি বিশাল সেনাদল নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অগ্রসর হন তায়িফে। মালিক ইবনু আওফ নাসরির দুর্গের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তায়িফে পৌঁছে দেখা গেল শহরবাসীরা ততক্ষণে পুরো এক বছরের রসদসহ প্রস্তুত হয়ে শহরের সব ফটক আটকে দিয়েছে। একসময়ের নিরস্ত্র নবিজি যেখান থেকে অপমানিত হয়ে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, সেখানে আজ তিনি সশস্ত্র অবরোধ আরোপ করেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার।

মুসলিমরা একের পর এক পরিকল্পনা করে শত্রুদের পরাস্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাফল্যের দেখা পায়নি কোনোটিই। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) ফটকের কাছে চলে গিয়ে আহ্বান করতেন যেন কেউ বেরিয়ে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে। কিন্তু কেউই সে সাহস করে না। এরপর নিয়ে আসা হয় মিনজানীক। কিন্তু তাও অকার্যকর প্রমাণিত হয়। একদল মুসলিম গিয়ে দেয়ালে ছিদ্র তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু

[৪৮১] বুখারি, ৪৩২৩।

কাজ শেষ করার আগেই প্রতিপক্ষ বাহিনীর কারণে তারা পিছিয়ে আসেন। উত্তপ্ত ধাতব পাত গলিয়ে ওপর থেকে ফেলছিল শত্রুরা।

অবশেষে নবি ﷺ আদেশ দেন শহরের বিখ্যাত আঙুর ও খেজুর বাগানগুলো ধ্বংস করে দিতে। অসহায় কণ্ঠে শত্রুরা এবার নবিজি ﷺ-কে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বাগানগুলো অক্ষুণ্ণ রাখতে অনুরোধ করে। নবি ﷺ সাথে সাথে দয়া করেন। থামার নির্দেশ দেন তাঁর সেনাদের।

শত্রুপক্ষের সংখ্যা কমিয়ে দিতে নবি ﷺ এবার আরেকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ঘোষণা দেন, 'যে কেউ দুর্গ থেকে বের হয়ে আমাদের নিকট আসবে সে মুক্ত।' এ প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসে তেইশ জন দাস। তাদের মধ্যে আবূ বাকরাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-ও ছিলেন। তিনি দেয়ালে উঠে পানি তোলার চরকিটি ব্যবহার করে নেমে আসে। ফলে নবি ﷺ তার নাম দেন "আবূ বাকরাহ"। কারণ, আরবিতে 'বাকরাহ' অর্থ 'চরকি'। দাসদের এই পালিয়ে আসা দুর্গবাসীদের খুব বেশি মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল।[৪৮২]

দীর্ঘ বিশ কি ত্রিশ দিন স্থায়ী হয় এই অবরোধ। শেষে নাওফাল ইবনু মুআবিয়া দীলির (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে পরামর্শ করেন নবি ﷺ। নাওফাল বললেন, "শেয়াল তো গর্তে সেঁধিয়ে গেল। যদি লেগে থাকেন, তাহলে ঠিকই ধরতে পারবেন। তবে যদি ছেড়ে দিয়ে চলে যান, তাতেও কোনও ক্ষতি নেই।" বাস্তবসম্মত পরামর্শটি আমলে নেন নবি ﷺ। সেনাদলকে শিবির ভাঙার আদেশ দেন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ফিরে যাবার আগে কিছু মুসলিম নবি ﷺ-কে অনুরোধ করেন শত্রুদের বদদুআ দিতে। প্রাচীরঘেরা শহরটির দিকে ফিরে তাকান আল্লাহর রাসূল ﷺ। চোখে ভেসে ওঠে বহু বছর আগের সেই স্মৃতি। তায়িফবাসীরা তাঁকে এমনভাবে বের করে দিয়েছিল, যেন তিনি কোনও অপরাধী। আর আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন ফেরেশতার সাহায্যে সবাইকে পাহাড়ে পিষিয়ে ফেলার স্বাধীনতা। দয়ার নবি সেবারের মতো এবারও দয়া ও দুআ করেন, "হে আল্লাহ, তায়িফবাসীদের হিদায়াত দান করুন এবং তাদের মুসলিম বানিয়ে নিয়ে আসুন।"

• গনীমাতপ্রাপ্ত সম্পদ ও বন্দিদের বণ্টন

তায়িফ থেকে ফিরে আসার পথে দশ দিন জি'ইর্রনায় অবস্থান করেন মুসলিম বাহিনী। কিন্তু এর মাঝে রাসূল ﷺ গনীমাত বণ্টন করেননি। এই আশায় যে, হাওয়াযিন গোত্র

---

[৪৮২] বুখারি, ৪৩২৬, ৪৩২৭।

এসে তাওবা করে হয়তো নিজেদের পরিবার-সম্পত্তি ফেরত নিয়ে যাবে। কিন্তু কেউই আসেনি। অবশেষে নবি ﷺ গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেন। তারপর বাকি গনীমাত ভাগ করে দেন দুর্বল ঈমানদার নব্য মুসলিমদের মাঝে। যুদ্ধে অংশ নেওয়া অমুসলিমদেরও তিনি একটি বিরাট অংশ প্রদান করেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের মনকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা।

যেমন আবূ সুফ্‌ইয়ানকে ১৬০০ দিরহাম এবং ১০০ উট দেওয়া হয়। তার দুই ছেলে ইয়াযীদ এবং মুআবিয়াকেও একই পরিমাণ দেওয়া হয়। সফওয়ান ইবনু উমাইয়াকে দেওয়া হয় ৩০০ উট। হাকিম ইবনু হিযাম, হারিস ইবনুল হারিস, উয়াইনা ইবনু হিসন, আকরা' ইবনু হাবিস, আব্বাস ইবনু মিরদাস, আলকামা ইবনু আলাসা, মালিক ইবনু আওফ, আলা ইবনু হারিসা, হারিস ইবনু হিশাম, জুবাইর ইবনু মুত'ইম, সুহাইল ইবনু আমর এবং হুওয়াইতিব ইবনু আবদিল উযযাসহ আরও অনেককে দেওয়া হয় একশটি করে উট। এর বাইরেও চল্লিশ-পঞ্চাশটি করে আরও কয়েকজনকে দান করা হয়।[৪৮৩]

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে খবর, "মুহাম্মাদ ﷺ প্রশস্ত হৃদয়ে এত অধিক দান করে যে, দারিদ্র্যের ভয় করে না।" গ্রাম্য বেদুইনরা লোভাতুর হয়ে ওঠে। ছুটে এসে রীতিমতো পাওনাদারের ভঙ্গিতে চাইতে থাকে নবি ﷺ-এর কাছে। কেউ কেউ তো নবি ﷺ-এর পেছন পেছন দৌড়ে তাঁকে গাছের দিকের সংকীর্ণ রাস্তায় যেতে বাধ্য করে। আরেক বেদুইন এসে পেছন থেকে নবিজির চাদর ধরে জোরে টান দেয়। ফলে চাদরটি নিচে পড়ে যায়। নবি ﷺ বলেন, "আমার চাদরটা দিয়ে দাও। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি আমার কাছে তিহামার গাছের সমসংখ্যক গবাদি পশুও থাকত তাহলে সেগুলোও বিতরণ করে দিতাম। এরপরেও তোমরা আমাকে না পেতে কৃপণ, না ভীরু আর না মিথ্যাবাদী।"

এরপর একটি উটের কুঁজ থেকে কয়েকটি চুল হাতে নিয়ে বলেন,

"আল্লাহর শপথ! আমার নিকট তোমাদের এই গনীমাতের সম্পদ থেকে কিছুই অবশিষ্ট নেই। এমনকি এই চুল পরিমাণও নেই। শুধু গনীমাতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ রয়েছে। এগুলো আবার তোমাদের নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং সুতা কিংবা সুঁই পরিমাণও যদি কারও কাছে কিছু থেকে থাকে তাহলে তা ফিরিয়ে দাও। কেননা খিয়ানত কিয়ামাতের দিন খিয়ানতকারীর জন্য লাঞ্ছনা, লজ্জা ও আগুন হয়ে দাঁড়াবে।"

---

[৪৮৩] ইবনু আবদিল বার, আল-ইসতীআব, ২/৮১৭।

এ কথায় ভয় পেয়ে সবাই সে নির্দেশ পালন করতে থাকে। শত্রুদের কাছ থেকে লব্ধ খুব সামান্য কিছুও এনে জড়ো করে গনীমাতের স্তূপে। নবি ﷺ তারপর যাইদ ইবনু সাবিত (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দায়িত্ব দেন এগুলো বণ্টন করার। পুরা গনীমাত থেকে এক-পঞ্চমাংশ রেখে বাকি সম্পদ সবার মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়। সে হিসেবে একজনের অংশ দাঁড়ায়— দেড়টা উট, আড়াইটা বকরি, দশ দিরহাম এবং একটি কয়েদির এক-তৃতীয়াংশ। আর যদি প্রত্যেককে দশ দিরহাম দিয়ে অন্যান্যগুলোর যেকোনও একটি দেওয়া হয় তাহলে একজনের ভাগে আসে—শুধু চারটি উট বা শুধু চল্লিশটি বকরি কিংবা একটি কয়েদির দুই-তৃতীয়াংশ।

• আনসারদের অভিযোগ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্বোধন

কুরাইশরা যখন দু-হাত ভরে গনীমাত পাচ্ছে, আনসারদের মনে তখন দানা বাঁধছে আশঙ্কা। নবি ﷺ কি তাহলে তাঁর স্বগোত্রীয়দের কাছে পেয়ে আনসারদের ভুলে গেলেন? সবার শেষে ইসলামে প্রবেশ করা, নিতান্ত অনিচ্ছায় যুদ্ধে আসা লোকগুলো নিয়ে নিচ্ছে বিজয়ের সব ফল। আর পোড়খাওয়া পরীক্ষিত জানবাজ ঈমানদাররা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছেন। আনসারদের মাঝে কেউ বলে উঠলেন, “এটা কেমন আশ্চর্যের কথা, নবিজি শুধু কুরাইশদেরই দিয়ে যাচ্ছেন আর আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন অথচ আমাদের তলোয়ারগুলো থেকে এখনও তাদের রক্ত ফোঁটা পড়ছে!” আনসারদের সর্দার সা’দ ইবনু উবাদা (রদিয়াল্লাহু আনহু) গিয়ে এ ব্যাপারে অনুযোগ জানালেন রাসূল ﷺ-এর কাছে।

নবি ﷺ সবাইকে একত্র করেন। তারপর তিনি আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ শেষে আবেগঘন এক বক্তব্য রাখেন,

“ওহে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা কি অমুক-তমুককে ক’টা বাসন-কোসন দিয়েছি বলে রাগ করেছ? তা তাদের দিয়েছি যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আর তোমাদেরকে সোপর্দ করেছি তোমাদের ইসলামের কাছে। ওহে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা কি এতে খুশি না যে, মানুষজন ঘরে ফিরবে ভেড়া-ছাগল-উট নিয়ে আর তোমরা ফিরবে স্বয়ং আল্লাহর রাসূলকে সাথে নিয়ে? সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! হিজরত যদি না থাকত তাহলে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। সব মানুষ যদি এক পথে যায় আর আনসাররা যায় অন্য পথে, তাহলে আমি আনসারদের পথেরই পথিক হব। হে আল্লাহ, আনসারদের প্রতি রহম করুন! তাদের সন্তানদের এবং তাদের সন্তানদের সন্তানদের প্রতিও রহম করুন।”

নবিজি ﷺ-এর এ কথা শুনে আনসারদের সামনে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কান্না করতে করতে সবার অবস্থা এমন হয় যে, দাড়ি পর্যন্ত ভিজে যায়। সবাই বলতে শুরু করেন, "আমরা আমাদের ভাগে আল্লাহর রাসূলকে পেয়ে সন্তুষ্ট।" এরপর আনসাররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সঙ্গে করে বেশ উৎফুল্লচিত্তে চিরচেনা আলোকিত সেই প্রাণের শহর—মদীনায় ফিরে আসেন।[৪৮৪]

• হাওয়াযিন প্রতিনিধিদের আগমন (যুল-কা'দা, ৮ম হিজরি)

গনীমাত বণ্টন মাত্র শেষ হয়েছে ঠিক তখন যুহাইর ইবনু সুরাদের নেতৃত্বে হাওয়াযিনের একটি দল এসে হাজির হয়। এসেই তারা নবি ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আনুগত্যের বাইআত দেওয়া শেষে প্রসঙ্গ তোলেন যুদ্ধে হারানো পরিবার ও সম্পত্তির ব্যাপারে—

"হে আল্লাহর রাসূল, আপনারা যাদের বন্দি করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের মা-বোন-ফুপু-খালারা। তাদের হারিয়ে আমরা নিজেদের মর্যাদাও হারিয়েছি।

হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের ওপর দয়া করুন। আপনি এমন ব্যক্তি, যার কাছে এটার প্রত্যাশা করা যায়। আমরা আপনার দয়ার প্রতীক্ষায় আছি। আপনি ওই সমস্ত নারীদের অনুগ্রহ করুন, যাদের দুধ আপনি পান করেছিলেন। স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন শুধু তাদের বুকের দুধেই আপনার পেট ভরত।" তারা সে-সময় কিছু কবিতাও পাঠ করেছিল।

নবি ﷺ তাদের পরিবার এবং সম্পত্তির মাঝে যেকোনও একটিকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেন। হাওয়াযিন প্রতিনিধিরা জবাব দেন "আমাদের নিকট বংশমর্যাদার সমান আর কিছুই নেই। আপনি আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের ফিরিয়ে দিন। মাল-সম্পদ আর গবাদি পশুগুলোর ব্যাপারে আমাদের কোনও দাবি নেই।"

নবি ﷺ বললেন, "আমি যখন যুহরের সালাত আদায় শেষ করব তখন তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে এবং তোমাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করবে আর বলবে, আমরা তোমাদের দ্বীনি ভাই। আমরা মুসলমানদের মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর নিকট এবং রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে মুসলমানদের নিকট সুপারিশ করছি যে, আমাদের বন্দিদের আমাদের নিকট ফিরিয়ে দিন।" তারা নির্দেশানুসারে এ-রকমটাই বলে। এর প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমার এবং বানূ আবদুল মুত্তালিবের অংশে যা এসেছে, সব ফিরিয়ে

---

[৪৮৪] বুখারি, ৪৩৩০; ইবনু হিশাম, ২/৪৯৯-৫০০।

দিলাম। আর বাকি সবার সাথে আমি আলোচনা করব।”

তখন মুহাজির-আনসার সবাই বলেন, “আমরা আমাদের অংশও ফিরিয়ে দিচ্ছি।” তবে কয়েকজন গ্রাম্য সাহাবি—যেমন, আকরা' ইবনু হাবিস, উয়াইনা ইবনু হিসন এবং আব্বাস ইবনু মিরদাস (রদিয়াল্লাহু আনহুম)—তাদের অংশ ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের অনিচ্ছা দেখে নবি ﷺ প্রস্তাব করেন, “যারা ফিরিয়ে দিতে রাজি তারা যেন ফিরিয়ে দেয় আর যারা রাজি নয় তারাও যেন ফিরিয়ে দেয়; আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা আমাদের এরপর সর্বপ্রথম যে গনীমাত দান করবেন তা থেকে এর বদলে তাকে ছয় ভাগ গনীমাত দেওয়া হবে।”

এরপর উয়াইনা ইবনু হিসন (রদিয়াল্লাহু আনহু) ছাড়া বাকি দু'জন নবিজি ﷺ-এর প্রস্তাব মেনে নেয়।

নবি ﷺ মুক্তিপ্রাপ্তদের প্রত্যেককে একটি করে কিবতি চাদর উপহার দেন।[৪৮৫]

বন্দিদের ফিরিয়ে দেওয়ার পরও হয় দুটি উট, নয়তো বিশটি করে ছাগল রয়ে যায় প্রত্যেকের মালিকানায়।

• জি'ইর্‌রনার উমরা

গনীমাত বণ্টনের ব্যস্ততা শেষ হলে নবি ﷺ ইহরাম বেঁধে নেন উমরার উদ্দেশ্যে। এটি ‘জিই'ররানার উমরা’ নামে খ্যাতি লাভ করে।[৪৮৬] উমরা শেষে মদীনাতেই ফিরে যান রাসূল ﷺ। অষ্টম হিজরির যুল-কা'দা মাসের শেষ সপ্তাহে ঘরে গিয়ে পৌঁছান।[৪৮৭]

• বানূ তামীমের ইসলাম গ্রহণ (মুহাররম, ৯ম হিজরি)

নবম হিজরির মুহাররম মাস। মদীনায় খবর এল যে, বানূ তামীম গোত্র আশপাশের অনেক গোত্রকে উস্কানি দিচ্ছে, তারা যাতে মুসলিমদের জিযইয়া না দেয় । নবি ﷺ উয়াইনা ইবনু হিসন ফাযারি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে বানূ তামীমের ঘাঁটিতে পঞ্চাশ জনের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সেখানে আক্রমণ করে সেখানকার মরুভূমি থেকে তামীম গোত্রের এগারো জন পুরুষ এবং একুশ জন নারী ও শিশুকে বন্দি করে মদীনায় নিয়ে আসে উয়াইনা (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

---

[৪৮৫] বুখারি, ২৩০৭, ২৩০৮।

[৪৮৬] বুখারি, ১৭৭৮।

[৪৮৭] ইবনু খালদূন, আত-তারীখ, ২/৪৭; যাদুল মাআদ, ২/১৬০-২০১; ইবনু হিশাম, ৩৮৯-৫০১।

বানূ তামীমের দশ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল তড়িঘড়ি করে মদীনায় আসে। মুসলিমদের সামরিক ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পর্কে ভালোই জানা আছে তাদের। তাই বানূ তামীম গোত্রপতি প্রস্তাব দেন একটি কবিতা প্রতিযোগিতা আয়োজনের। কাদের কবিরা বেশি পটু সেটাই নির্ণীত হবে এই প্রতিযোগিতায়। চ্যালেঞ্জটি গৃহীত হয় মুসলিম পক্ষ থেকে।

বানূ তামীমের সুপ্রসিদ্ধ খতীব উতারিদ ইবনু হাজিব প্রথমে বক্তব্য রাখেন। মুসলিমদের পক্ষ থেকে এর জবাব দেন সাবিত ইবনু কাইস (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তারপর বানূ তামীম কবিতা আবৃত্তি করতে পাঠায় তাদের শ্রেষ্ঠ কবি যিবরিকান ইবনু বাদ্‌রকে। জবাবে হাসসান ইবনু সাবিত (রদিয়াল্লাহু আনহু) এমন কবিতা আবৃত্তি করেন যে, বানূ তামীম গোত্র হার মানতে বাধ্য হয়। এরা এমন এক গোত্র, যারা কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে ইসলামে প্রবেশ করেন। নবি ﷺ তাদের বন্দিদের মুক্তি দিয়ে উপঢৌকনসহ ফেরত পাঠান। এভাবেই আরও একটি কঠোর শত্রু ইসলামের মহান সত্যের সামনে মাথা নত করে চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করে। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার।

• বানূ তায়ি-এর বিরুদ্ধে অভিযান

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তৎপরতা থেমে নেই। দিকে দিকে মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রদান চলছেই। কখনও কথা, কখনও আচরণ, কখনও চিঠি দিয়ে আবার কখনও-বা শক্তি দিয়ে তিনি মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান করতে থাকেন। অজ্ঞতা ও বহুত্ববাদের কোলে জন্ম নেওয়া প্রতিটি মিথ্যে উপাস্যের মৃত্যু ঘটিয়ে এক আল্লাহর ইবাদাত সমুন্নত করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

এরই ধারায় নবম হিজরির রবীউল আউয়াল মাসে আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে দেড় শ উষ্ট্রারোহী ও অশ্বারোহীর একটি বাহিনীকে নবি ﷺ প্রেরণ করেন 'ফিলস' মূর্তি ধ্বংস করার দায়িত্ব দিয়ে। এটি তায়ি গোত্রের প্রধান উপাস্য দেবতা। কিংবদন্তি হাতিম তায়ি এ গোত্রেরই সন্তান ছিলেন। আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে থাকা মুসলিম বাহিনীটির কাছে ছিল একটি কালো এবং আরেকটি ছোট সাদা পতাকা। কিছু উট ও ছাগলের পাশাপাশি কয়েকজন নারী ও শিশুকে বন্দি করেন তারা। বন্দিদের মাঝে হাতিম তায়ির মেয়ে সাফফানাও ছিলেন।

বন্দিদের নিয়ে বাহিনীটি মদীনায় ফিরে আসে। হাতিম তায়ির সম্মানার্থে তার কন্যাকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেন নবি ﷺ। শুধু তা-ই না, সাথে একটি বাহনও দিয়ে দেন তাকে। সাফফানা সেখান থেকে সোজা চলে যান সিরিয়া। তার ভাই আদি ইবনু হাতিম

সেখানে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভাইয়ের কাছে নবিজি ﷺ-এর অসাধারণ দানশীলতার কথা জানান সাফফানা। এমনকি তাদের বাবাও তাঁর সাথে তুলনীয় নন এই বলে তিনি আদিকে অনুরোধ করেন আগ্রহভরে নবিজি ﷺ-এর সামনে নিজেকে পেশ করতে।

বোনের কথা আদির মনে ধরে। তাই কোনও ধরনের নিরাপত্তা না নিয়েই তিনি হাজির হন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে। নবিজির মুখে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন আদি ইবনু হাতিম (রদিয়াল্লাহু আনহু)।[৪৮৮]

আদি সেখানে থাকতে থাকতেই দু'জন লোক নবিজি ﷺ-এর কাছে আসে। একজনের অভিযোগ খাদ্যের অভাবের, আরেকজনের নালিশ সড়কপথে একটি ডাকাতির ঘটনা নিয়ে। তারা চলে যাওয়ার পর রাসূল ﷺ আদিকে বলেন,

"হে আদি, তুমি কি হীরা দেখেছ? তুমি যদি দীর্ঘ হায়াত পাও তাহলে দেখবে, হীরা থেকে একাকী এক নারী সফর করছে, এমনকি সেখান থেকে এসে কা'বাও তওয়াফ করছে কিন্তু পথে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় পাচ্ছে না। এ ছাড়াও দেখবে, পারস্য সম্রাটের ধনভান্ডার তোমাদের হাতে চলে এসেছে। এমন ব্যক্তিকেও দেখবে, যে সোনা-রুপা হাতে নিয়ে তা গ্রহণ করার মতো কাউকে খুঁজছে কিন্তু তেমন কোনও লোককে খুঁজে পাচ্ছে না।"

আদি ইবনু হাতিম (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর জীবদ্দশায় নবিজি ﷺ-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতে দেখেছেন। উটের পিঠে চড়ে সফরকারী নারীকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। আর তিনি নিজেও পারস্যের ধনভান্ডার জয় করার সময় মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।[৪৮৯]

ইসলামের শেকড় আরব উপদ্বীপ এবং এর বাইরেও সুদৃঢ় হতে থাকে। এর সাথে বাড়তে থাকে মুসলিমদেরও সংখ্যা ও সম্পদ।

মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে আরব পৌত্তলিকদের সাথে মুসলিমদের সংগ্রাম এককথায় শেষই হয়ে যায়। এখানে-সেখানে মাঝেমধ্যে ছোট ছোট দাঙ্গা লাগলেও এতে ইসলামের প্রতিপত্তিতে একটু আঁচড়ও লাগেনি। আস্তে আস্তে বিদেশি পরাশক্তিগুলোর চোখে পড়তে থাকে আরব উপদ্বীপে নতুন এই রাজনৈতিক শক্তির উত্থান।

---

[৪৮৮] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/২৫৭, ২৭৮; ইবনু হিশাম, ২/৫৮১; যাদুল মাআদ, ২/২০৫।

[৪৮৯] বুখারি, ৩৫৯৫।

তাবূকের যুদ্ধ (রজব, ৯ম হিজরি)

পারস্যের বিরুদ্ধে মহাকাব্যিক জয়ের পর রোমানরা তখন আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে। মদীনা থেকে উদ্ভূত নতুন এই হুমকির দিকে এবার নজর দেয় তারা।

এদিকে মূতার যুদ্ধে মুসলিমদের সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে আরবের অনেক গোত্রই স্বাধীনতার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছে। দুই লাখ রোমান সেনাকে মাত্র ৩ হাজার মুসলিম যোদ্ধা টক্কর দিয়ে দিয়েছে, এটিই তাদের নতুন করে সাহস জোগায়। অপরদিকে রোমানরা ভাবতে থাকে যে, এই মুসলিমদের পরাজিত করা গেলে সবগুলো বিদ্রোহী আরব গোষ্ঠীই চুপ মেরে যাবে। আরব উপদ্বীপ আবারও পরিণত হবে বিচ্ছিন্ন ও নগণ্য কিছু গোত্রের সমষ্টিতে।

• রোমানদের মুখোমুখি হতে মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি

আসন্ন রোমান হুমকির কথা জানতে পেরে রাসূল ﷺ মুসলিমদের প্রস্তুতি নেওয়ার আদেশ দেন। তপ্ত গ্রীষ্মের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে এই আদেশ পালন দৃশ্যত অসম্ভব মনে হতে থাকে। গাছে গাছে মাত্র খেজুর পেকেছে, গাছের শীতল ছায়ায় বসলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আর ছায়া থেকে বেরোলেই চামড়া ঝলসানো রোদ। এরই মাঝে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তাবূক পৌঁছানো মানে রীতিমতো অসাধ্য সাধন করা। চলতে থাকে প্রস্তুতি। রাসূল ﷺ তাঁর ধনী সাহাবিদের আহ্বান করেন দু-হাত ভরে আল্লাহর রাস্তার জন্য খরচ করতে। বিত্তবান সাহাবিগণ অবারিত করে দেন দানের হাত। উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সমগ্র সম্পত্তির অর্ধেক এনে হাজির করেন। উসমান ইবনু আফফান (রদিয়াল্লাহু আনহু) নিয়ে আসেন দশ হাজার দীনার, হাওদাসহ তিন শ উট এবং পঞ্চাশটি ঘোড়া। (অন্যান্য কিছু সূত্রে, নয় শ উট এবং দেড় শ ঘোড়ার কথা এসেছে।) নবি ﷺ বলেন, "আজ থেকে উসমান যা-ই করুক না কেন, ওর কোনও ক্ষতি হবে না।"[৪১০]

আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রদিয়াল্লাহু আনহু) আট হাজার দিরহাম দান করেন। আব্বাস, তালহা, সা'দ ইবনু উবাদা এবং মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রদিয়াল্লাহু আনহুম)-ও প্রদান করেন বিপুল সম্পদ। নব্বই ওয়াসাক বা সাড়ে তেরো হাজার কিলোগ্রাম খেজুর নিয়ে আসেন আসিম ইবনু আদি (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ঘরের সমস্ত সম্পদ নিয়ে হাজির হন। যার মোট পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। ওটাই ছিল তাঁর সর্বস্ব। নবি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন,

---

[৪১০] তিরমিযি, ৩৭০১, হাসান।

"তোমার পরিবারের জন্য কি কিছু রেখে এসেছ?"

আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) জবাব দেন, "ওদের জন্য আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।"[৪৯১]

কম সামর্থ্যবান সাহাবিরাও সাধ্যানুযায়ী দান করতে থাকেন। এমনকি এক কেজির মতো খাবার হলেও। মুসলিম নারীরাও সামর্থ্যানুযায়ী দান করেন। কেউ কেউ তাদের গয়নাগাটিও দিয়ে দেন আল্লাহর রাহে।

একেবারেই দরিদ্র মুসলিমরা চাইছিলেন আর্থিকভাবে না পারলেও কায়িক শ্রম দিয়ে শরীক হতে। নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে তারা উট বা ঘোড়া কিছু একটা চান, যাতে যুদ্ধে যেতে পারেন। নবি ﷺ জানালেন, "কিছুই যে পাচ্ছি না তোমাদের দেওয়ার মতো!" অশ্রু নেমে আসে সাহাবিদের চোখ বেয়ে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

"আমার কাছে এমন কোনও বস্তু নেই যে তার ওপর তোমাদের সওয়ার করাব। তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে গেছে যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোনও বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে।"[৪৯২]

তবে উসমান, আব্বাস এবং আরও কিছু সামর্থ্যশালী সাহাবি মিলে কারও কারও জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে দেন।

মুসলিমরা যখন দুর্গম এক অভিযানের প্রস্তুতিতে মগ্ন, মুনাফিকরা যথারীতি নিজে কাজ না করে অন্যের কাজে খোঁটা মারায় লিপ্ত। কেউ বেশি দান করলে—লোক-দেখানো, আর কম দান করলে—এতটুকু দানের জন্য বুঝি আল্লাহ মুখাপেক্ষী, এসব বলে বলে সবাইকে টিটকারি মারার ও ঠাট্টা করার একটা-না-একটা পথ খুঁজে নেয় তারা। আবার অজেয় রোমানদের সাথে লড়াই করতে চাচ্ছেন বলে নবি ﷺ-কেও তারা বিদ্রুপ করতে থাকে। এ নিয়ে জেরা করা হলে বলে, "আরে এমনিই মজা করলাম, আমরা অন্তর থেকে এগুলো বলিনি।" অভিযানের সময় এগিয়ে আসে, আর বেদুইন

---

[৪৯১] নূরুদ্দীন হালাবি, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩/১৮৪।

[৪৯২] সূরা তাওবা, ৯ : ৯২।

ও মুনাফিকরা একে একে এসে নিজ নিজ অজুহাত পেশ করতে থাকে। নবিজি ﷺ-ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে তাদের মদীনায় থেকে যাওয়ার অনুমতি দেন। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। তবে কিছু মুসলিম যাওয়া-না যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় দুলতে থাকেন। শুধু অলসতার কারণেই যুদ্ধে যাওয়া থেকে দূরে থাকেন।

• মুসলিম সৈন্যবাহিনী তাবূকের পথে

অবশেষে মুসলিমরা দীর্ঘ মরু পাড়ি দিয়ে তাবূকে যেতে প্রস্তুত। মদীনার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক হন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। আলি ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কেও রেখে যাওয়া হয় নারী ও শিশুদের দেখভাল করতে। সেনাদলের সবচেয়ে বড় পতাকাটি থাকে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে। যুবাইর, উসাইদ ইবনু হুদাইর এবং হুবাব ইবনুল মুনযির (রদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর হাতে যথাক্রমে মুহাজির, আওস ও খাযরাজের পতাকা।

ত্রিশ হাজার সেনা নিয়ে নবি ﷺ তাবূক অভিমুখে রওনা হন ৯ম হিজরি সনের রজব মাসের কোনও এক বৃহস্পতিবারে। মানুষ অনুপাতে উটের সংখ্যা এতই কম যে, একটি উঠের পিঠে পালা করে আঠারো জন পর্যন্ত আরোহণ করেন। খুব কষ্টের সফর ছিল। খাদ্যাভাবের কারণে গাছের পাতা চিবিয়ে খেতে খেতে সবার ঠোঁট ফুলে যায়। একে তো উটের অভাব, তার ওপর পানিসংকট। তৃষ্ণায় প্রাণ বের হওয়ার উপক্রম হলে কয়েকটি উট যবাই করে সেগুলোর পেটে থাকা পানি পর্যন্ত পান করেন সাহাবায়ে কেরাম। কারণ, মাথার ওপর ছিল তখন মরুভূমির পাথর-ফাটা তপ্ত রোদ।

ওদিকে মদীনায় মুনাফিকদের ঠাট্টা-মশকরা দিনে দিনে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) ধৈর্য হারিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন সেনাদলের সাথে গিয়ে যোগ দেওয়ার। বাহন ছুটিয়ে তিনি সেনাদলের কাছে পৌঁছে যান। নবি ﷺ তাকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট না যে, আমার সাথে তোমার সম্পৃক্ততা হবে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে যেমন হারূন (আলাইহিস সালাম) ছিলেন? তবে আমার পরে কোনও নবি আসবেন না, এ-ই যা পার্থক্য।"[৪৯৩]

সামূদ জাতির আদি বাসস্থান 'হিজর'-এ এসে থামে মুসলিম বাহিনী। এই জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন নবি সালিহ (আলাইহিস সালাম)। বেপরোয়াভাবে কুফরিতে লিপ্ত এই জাতিটির কাছে আল্লাহর মু'জিযা হিসেবে পাহাড় থেকে বের করে আনা হয়েছিল একটি উটনী। সাময়িকভাবে শান্ত হওয়া জাতিটিকে বলা হয় যে, আল্লাহ

---

[৪৯৩] বুখারি, ৩৭০৬।

তাআলার এই উটনীটির যেন কোনও ক্ষতি করা না হয়। কিন্তু অহংকারবশত একসময় তারা এই নিষিদ্ধ কাজটিই করে বসে। হত্যা করে ফেলে উটনীটিকে। ফলে প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। হিজরের ঘরগুলো আজও তাদের বিলুপ্ত অস্তিত্বের সাক্ষী।

এলাকাটির কুয়া থেকে সাহাবিরা পানি তুলতে লাগলেন। রুটির জন্য খামির প্রস্তুত করতে হবে। নবি ﷺ এ দৃশ্য দেখামাত্র নির্দেশ দেন পানি ফেলে দিতে। খামির যা ইতিমধ্যে বানানো হয়ে গেছে, সেগুলো উট আর ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে দিতে বললেন। সালিহ (আলাইহিস সালাম)-এর সেই উটনী যে কুয়া থেকে পানি পান করত, সেটি দেখিয়ে দেন নবিজি ﷺ। সেখান থেকেই পানি নিতে বলেন সাহাবিদের।

অবাধ্য এ জাতিটির এলাকা পার হতে হতে নবি ﷺ সাথিদের এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বললেন। আল্লাহর অবাধ্যতার ফল এমনই কঠোর।

"তোমরা জালিমদের বাসস্থানে কেবল কান্নারত অবস্থায় প্রবেশ করো। এই ভয়ে যে, তাদের ওপর যে মুসীবত এসেছিল তা তোমাদের ওপরও এসে পড়বে।"

এরপর মুসলিমরা বিনীত ভঙ্গিতে কাপড়ে মাথা ঢেকে দ্রুত স্থানটি পার হয়ে যান।[৪১৪]

রাস্তার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের ওয়াক্তে যোহরকে আসরের সাথে মিলিয়ে এবং ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেন।[৪১৫]

প্রায় চার শ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে নবিজি ﷺ-এর সেনারা তাবূকে এসে পৌঁছান। এখানে এসে সবাই আবূ খাইসামা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দেখা পান। ইনি কোনও বৈধ অজুহাত ছাড়া মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন। জানালেন যে, সেনাদল মদীনা ছেড়ে যাওয়ার পর একদিন প্রচণ্ড গরমে তিনি তার বাগানে প্রবেশ করে বসেন। তার দুই স্ত্রী চারপাশে পানি ছিটিয়ে দেন এবং সুশীতল পানি ও খাবার নিয়ে আসেন তার জন্য। হঠাৎ বোধোদয় হলে তিনি স্ত্রীদের বলেন,

"নবিজি ওদিকে রোদে পুড়ছেন। আর আমি কি না বসে বসে শীতল ছায়া, ঠান্ডা পানি আর মধুর নারীসঙ্গ ভোগ করছি? এ তো অন্যায়! আল্লাহর কসম! আমি ঘরেও ঢুকব না। সোজা নবিজির কাছে চলে যাব। তোমরা দু'জন আমার মালপত্র প্রস্তুত করে দাও।"

স্ত্রীদ্বয় তা-ই করেন। তরবারি ও বর্শা নিয়ে উট ছুটিয়ে নবিজি ﷺ-এর কাছে চলে আসেন

---

[৪১৪] বুখারি, ৪৩৩।

[৪১৫] মুসলিম, ৭০৬; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/২৩৭।

আবূ খাইসামা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তখন নবি ﷺ মাত্র তাবূকে এসে পৌঁছেছেন।[৪৯৬]

• তাবূকে বিশটি দিন

রোমানরা ইতিমধ্যে খবর পেয়ে গেছে যে, মুসলিম সৈন্যরা তাদের মুখোমুখি হতে চার শ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে। এতেই রোমানদের মনোবল ভেঙে পড়ে। সিদ্ধান্ত নেয় যুদ্ধে না আসার। তারপরও নবি ﷺ তাবূকে শিবির স্থাপন করে বিশ দিন অবস্থান করেন। উপস্থিতির মাধ্যমে ভীতি ধরিয়ে দেন রোম সাম্রাজ্য এবং তাদের অনুগত আরব খ্রিষ্টানদের হৃদয়-রাজ্যে।

আরবের নতুন এই শাসকের সাথে শান্তি স্থাপন করতে অনেক গোত্রই তখন উদগ্রীব। তাবূকের আশপাশের অনেক গোত্র থেকেই প্রতিনিধিদল এসে নবিজি ﷺ-এর সাথে একের পর এক দেখা করতে থাকে। আইলার প্রশাসক ইউহান্না ইবনু রু'বা আসেন সাক্ষাৎ করতে। সাথে ছিলেন জারবা, আযরুহ এবং মীনা অঞ্চলের দলগুলোও। সবাই-ই জিযইয়া প্রদান করতে রাজি হন, তবে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত জানাননি। নবি ﷺ তাদের জন্য একটি শান্তিচুক্তিপত্র লিখে দেন। স্থল আর সাগর মিলিয়ে তাদের এলাকা এবং সেখানকার গবাদি পশু ও কাফেলা মুসলিমদের হাত থেকে নিরাপদ। আর যদি কোনও ধরনের অপতৎপরতা দেখা যায় তাহলে তাদের সম্পদ তাদের জীবন বাঁচাতে পারবে না।[৪৯৭]

প্রতি বছরের রজব মাসে এক শ দীনার জিযইয়ার মাধ্যমে জারবা এবং আযরুহ গোত্রের সাথেও অনুরূপ চুক্তি হয়। আর মীনা গোত্র সম্মত হয় তাদের অঞ্চলে উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ দান করতে।

• উকাইদিরের বন্দিত্ব

দূমাতুল জান্দালের প্রশাসক উকাইদিরকে বন্দি করার জন্য নবি ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে চার শ বিশ জন ঘোড়সওয়ারের একটি দল পাঠান। খালিদকে বলে দেন যে, উকাইদিরকে পাওয়া যাবে নীলগাই বা সাদা অ্যান্টিলোপ শিকাররত অবস্থায়। কথামতো খালিদ গিয়ে উকাইদিরের দুর্গের সামনে থামেন। একটি সাদা অ্যান্টিলোপ চোখে পড়ে তার। ঠিকই সেটা শিকার করতে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে উকাইদির। জানে না যে, নিজেই একটু পর শিকারে পরিণত

[৪৯৬] বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ৫/২২৩।
[৪৯৭] বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ৫/২৪৭-২৪৮।

হবে। খালিদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) অতর্কিত আক্রমণে তাকে বন্দি করে ফেলেন। নবিজি ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হয় তাকে। দুই হাজার উট, আট শ দাস, চার শ বর্ম এবং চার শ বর্শার বিমিনয়ে উকাইদিরকে মুক্তি দিয়ে দেন তিনি। আইলা এবং মীনার মতো একই শর্তে উকাইদিরও জিযইয়া দিতে সম্মত হয়।[৪৯৮]

• ফের মদীনায় ফেরা

বিশ দিন তাবূকে অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর বাহিনী মদীনায় ফিরতি যাত্রা আরম্ভ করেন। আসা-যাওয়াতেই সময় লাগে ত্রিশ দিন। এভাবে মদীনার বাইরে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয় মুসলিম বাহিনীর। এখন পর্যন্ত রোমানদের বিরুদ্ধে নবিজি ﷺ-এর অভিযান কোনও সংঘর্ষ ছাড়াই এগোচ্ছে। আরবে মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে রোম যদিও বড় একটি হুমকি, কিন্তু তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন তাবূকে নিরাপদেই বিশ দিন অবস্থান করে এসেছেন সাহাবিরা। শুধু তা-ই না, আশপাশের গোত্রগুলোর সাথে শান্তিচুক্তি করে উপদ্বীপে মুসলিমদের হাত আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। কিন্তু খানিক পরেই ঘটনায় আসে এক অপ্রত্যাশিত মোড়।

ফিরতি যাত্রার মাঝপথে সেনাদলটি একটি পর্বতগিরি পার হন। উপত্যকার ভেতর দিয়ে পেরিয়ে যান বেশির ভাগ সেনা। শুধু আম্মার এবং হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে সাথে নিয়ে নবি ﷺ অন্য আরেকটি পথ ধরেন।

সেনাদলে মুসলিমদের সাথেই ছিল বারো জন মুনাফিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রায় একা পেয়ে তাঁকে হত্যার শ্রেষ্ঠ সুযোগ পেয়ে যায় তারা। মুখ ঢেকে চুপে চুপে অনুসরণ করতে থাকে। অপেক্ষায় থাকে মোক্ষম সময়ের।

হঠাৎ তারা বাহন ছুটিয়ে এগিয়ে আসে। তখন নবি ﷺ হুযাইফাকে বলেন ঢাল দিয়ে ওদের ঘোড়াগুলোর মুখে আঘাত হানতে। এতেই মুনাফিকদের অন্তরে আল্লাহ্ তাআলা ভয় ঢেলে দেন। পিঠটান দিয়ে পালায় তারা। মিশে যায় বাকি সেনাদলের সাথে। কিন্তু নবি ﷺ হুযাইফাকে জানিয়ে দেন তাদের প্রত্যেকের নাম ও উদ্দেশ্য। সেদিন থেকে হুযাইফা পরিচিত হন নবিজি ﷺ-এর রহস্যবিদ হিসেবে।[৪৯৯]

• মুনাফিকদের মাসজিদ ধ্বংস

মুনাফিকরা মদীনার বাইরে কুবায় একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছিল। উদ্দেশ্য—

---

[৪৯৮] বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ৫/২৫০-২৫১।

[৪৯৯] বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ৫/২৫৯।

মুসলমানদের ক্ষতি করা, তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা, কুফর ও নিফাকের পক্ষে আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপক্ষে এটাকে ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি বানানো। তাবূক অভিযানের প্রস্তুতিকালেই নবি ﷺ-এর কাছে অনুরোধ আসে সেখানে উদ্বোধনী সালাতের ইমামতি করার। ব্যস্ততার কথা বলে নবি ﷺ সেটাকে আপাতত স্থগিত রেখেছিলেন।

তাবূক থেকে ফেরার পথে কুবা থেকে এক দিনের দূরত্বে যূ-আওয়ানে এসে যাত্রা-বিরতি করেন মুসলিমরা। এ সময় জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এসে জানিয়ে দেন যে, মাসজিদটি মুনাফিকরা এক বিশেষ অসৎ উদ্দেশ্যে তৈরি করেছে। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার গোপন ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে এটি। সুতরাং সেখানে আপনি সালাত আদায় করতে যাবেন না। নবিজি ﷺ-কে এখানে সালাত পড়াতে পারা মানে স্থাপনাটির একরকম ধর্মীয় বৈধতা আদায় করে নেওয়া। তাকওয়ার বদলে নিফাক যেই দালানের ভিত্তি, সেটি ধ্বংস করে দিতে কুবায় বাহিনী পাঠান রাসূল ﷺ। ফলে তারা তা ভেঙে তছনছ করে দেয় এবং ধ্বংস করে ফেলে মুনাফিকদের মাসজিদ।[৫০০]

• নবিজি ﷺ-কে মদীনায় বরণ

শারীরিকভাবে ক্লান্ত, কিন্তু মানসিকভাবে উজ্জীবিত মুসলিম বাহিনী অবশেষে মদীনা এসে পৌঁছান। দূর থেকে শহরের পরিচিত চিহ্নগুলো দেখে নবি ﷺ বলেন, "এই হলো তবাহ্ আর ওই যে উহুদ, পাহাড়টি আমাদের ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি।"[৫০১]

নবিজির ﷺ ফিরে আসার খবর পেয়ে মদীনাবাসীরা ছুটে আসে স্বাগত জানাতে।[৫০২] প্রায় দশ বছর আগে মুহাজিরদের স্বাগত জানিয়ে গাওয়া গানটি আবারো গেয়ে ওঠে নারী-শিশুরা—

"পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের ওপর উদিত হয়েছে
সানিয়্যাতুল ওয়াদা' থেকে,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের ওপর ওয়াজিব
যত দিন কেউ আল্লাহকে ডাকে।"

---

[৫০০] বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ৫/২৬০।
[৫০১] বুখারি, ১৪৮১
[৫০২] বুখারি, ৪৪২৬।

দুই রাকাআত সালাত আদায় করে রাসূল ﷺ মাসজিদে বসেন। আগ্রহীরা একে একে এসে দেখা করতে থাকে তাঁর সাথে। পঞ্চাশ দিন মদীনা থেকে দূরে থাকা নবিজিকে স্বাগত জানাতে সবাই উৎসুক।

• তাবূক যুদ্ধে যায়নি যারা

মুনাফিকরা যারা যুদ্ধে যায়নি, তারা সারি ধরে এসে সেই গৎবাঁধা অজুহাতের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। নবি ﷺ কাউকেই সামনাসামনি তিরস্কার করেননি। আল্লাহই এদের ফায়সালা করবেন। কিন্তু তিন জন সাচ্চা মুসলিম কোনও ওজর ছাড়া আসলেই তাবূকে যাওয়া থেকে বিরত ছিলেন। কা'ব ইবনু মালিক, মুরারা ইবনু রবী' এবং হিলাল ইবনু উমাইয়া (রদিয়াল্লাহু আনহুম)। সামর্থ্যবান পুরুষ হিসেবে জিহাদে অংশ না নেওয়াটা সত্যিই গুরুতর ও মারাত্মক অপরাধ। মুনাফিকদের বিপরীতে গিয়ে তারা এসে অকপটে দোষ স্বীকার করেন। নবি ﷺ তাদের আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকতে বলেন। ততদিন পর্যন্ত তাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখতে বলেন পুরো মুসলিম সমাজকে।

একঘরে হয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় দিন কাটতে থাকে তাদের। যেন এক আঁধার এসে ঘিরে ধরেছে তাদের। চল্লিশ দিন পর তাদের আদেশ দেওয়া হয় স্ত্রীদের থেকেও আলাদা হয়ে যেতে। তাদের সাথে অন্তরঙ্গ না হতে। দুঃখ আর অবসাদে নুইয়ে পড়ে তারা। পঞ্চাশ দিন পর অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করে আয়াত নাযিল করেন,

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

> "এবারে যোগদান না করা ওই তিন জন। পৃথিবী তাদের কাছে সংকুচিত হয়ে এসেছে, আর তারা হয়ে পড়েছে বিমর্ষ। এভাবেই তারা উপলব্ধি করেছে যে, আল্লাহ বিনে কোনও আশ্রয় নেই। আর তিনিও তাদের ক্ষমা করে দিলেন, যেন তারা ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, সতত দয়ালু।"[৫০৩]

এই ওহি নাযিলের পর চারিদিকে উৎসব উৎসব ভাব চলে আসে। সবাই দৌড়ে আসে একঘরে সাহাবিদের মুক্তির সুসংবাদ জানাতে। শোকরানা হিসেবে অনেক দান-সাদকা

---

[৫০৩] সূরা তাওবা, ৯ : ১১৮।

করেন তিন জন। সেই দিনটি ছিল তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন।[৫০৪]

মুনাফিকদের লোকদেখানো ঈমানও অন্যান্য আয়াতে আলোচিত হয়। তাদের মুখোশ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এদের বলা হয় অন্তরের রোগী। প্রতিবছর তাদের একটি দুটি করে নিদর্শন দেখানো হচ্ছে। অথচ তওবার কোনো নামগন্ধও নেই। অপর দিকে মুমিনদের সুখবর প্রদান করা হয়।[৫০৫]

• আবিসিনিয়ার বাদশা ও নবি-তনয়া উম্মু কুলসূমের মৃত্যু

নবম হিজরির রজব মাসে তাবূক থেকে ফিরেই নবি ﷺ হাবশার বাদশা আসহুমা ইবনু আবজার (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যুসংবাদ পান। দুর্বল অবস্থায় মাক্কি মুশরিকদের নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে বাঁচাতে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন আবিসিনীয় এই রাজা। ইসলামকে ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা (আলাইহিমুস সালাম)-এর শিক্ষার চলমান ধারা হিসেবে চিনতে পারার পর নিজেও মুসলিম হন। তাকে মদীনা থেকে বহু দূরে কবরস্থ করা হলেও নবি ﷺ মদীনায় তার গায়েবানা জানাযা সালাত আদায় করেন।

একই বছরের শা'বান মাসে মারা যান নবিকন্যা উম্মু কুলসূম (রদিয়াল্লাহু আনহা)। নবিজি ﷺ-এর ইমামতিতে জানাযার সালাত আদায় শেষে তাকে দাফন করা হয় মদীনার বাকীউল গরকদ কবরস্থানে। নিজে শোকাহত হওয়ার পাশাপাশি জামাতা উসমান ইবনু আফফান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কষ্টও অনুধাবন করেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। তাকে বলেন, "আমার তৃতীয় কোনও মেয়ে থাকলে ওকেও তোমার সাথেই বিয়ে দিতাম।"[৫০৬]

এরও দুই মাস পর যুল-কা'দা মাসে মারা যায় মুনাফিকদের মাথা ও নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই। দয়ার নবি মুহাম্মাদ ﷺ তারও জানাযা পড়ান। দুআ করেন মাগফিরাতের। উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) অনুরোধ করেছিলেন এই মুনাফিক-শিরোমণির জানাযা না পড়াতে। কিন্তু নবি ﷺ তাতে নিরস্ত হননি। পরে অবশ্য মুনাফিকদের জানাযা না পড়তে নবিজি ﷺ-কে আদেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন।[৫০৭]

---

[৫০৪] বুখারি, ৪৪১৮।

[৫০৫] পুরা ঘটনার জন্য দেখুন—ইবনু হিশাম, ২/৫১৫-৫৩৭; যাদুল মাআদ, ৩/২-১৩; মুসলিম, ১৩৯২; ফাতহুল বারি, ৮/১১০-১২৬।

[৫০৬] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৯/৮৩।

[৫০৭] বুখারি, ৪৬৭১।

যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে একটি নিগূঢ় তত্ত্ব

জাহিলি যুগে আরব মুশরিকদের কাছে যুদ্ধ ছিল দুর্বলদের গণহত্যা, সম্পদ লুণ্ঠন, গ্রাম ও গবাদিপশু ধ্বংস এবং নারীদের ধর্ষণ করার নামান্তর। কিন্তু ইসলাম এসে যুদ্ধের ধারণাই পাল্টে দেয়। যুদ্ধ রূপান্তরিত হয় অত্যাচারিতের উদ্ধার এবং অত্যাচারীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যম হিসেবে। সবচেয়ে বড় জুলুম—মিথ্যে উপাস্যের আরাধনা। এই জুলুম থেকে মুক্ত করে মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে আনার জন্য চলতে থাকে নবিজি ﷺ-এর গযাওয়াত (যুদ্ধসমূহ)।

তা ছাড়া ইসলাম আগমনের আগে মরুবাসী আরবদের জীবনব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এসব যুদ্ধ। বকর এবং তাগলাব গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার যুদ্ধ চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এতে প্রাণ হারায় সত্তর হাজার মানুষ। তবু কেউ কারও কাছে মাথানত করেনি। একইভাবে আওস-খাযরাজের যুদ্ধও শতবর্ষী। এতেও কোনও পক্ষ আত্মসমর্পণ করেনি। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে বেঁধে যাওয়া যুদ্ধকেও টেনে নেওয়া হতো বছরের পর বছর, কেউই হার মানতে চাইত না। এটিই ছিল তৎকালীন আরবদের স্বভাব।

তাই রাসূল ﷺ ইসলাম নিয়ে আসার পরও তারা স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতেই প্রতিক্রিয়া জানায়—যুদ্ধ। কিন্তু নবিজি মানুষকে পরাজিত করার বদলে তাদের জয় করতে থাকেন। মাত্র আট বছর যুদ্ধ করেন তিনি। মুসলিম, মুশরিক, ইয়াহূদি, খ্রিষ্টান সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা হাজারের আশপাশে। এত কম রক্তপাত ও অল্প সময়ের মাঝেই তিনি পুরো আরব উপদ্বীপকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

অনেক ইতিহাসবিদই নবিজি ﷺ-এর সাফল্যকে সামরিক দক্ষতার ভেতর সীমাবদ্ধ করে ফেলে। কিন্তু যুদ্ধের প্রতি আরবদের লালসা এবং তুচ্ছ কারণে যুদ্ধ বাঁধিয়ে ফেলার স্বভাব বিবেচনা করলেই বোঝা যায় যে, নবিজি ﷺ-এর কাছে তরবারির চেয়েও মোক্ষম ভিন্ন কোনও অস্ত্র ছিল।

আপনি কি মনে করেন ইসলামের এই বিজয় তরবারির শক্তিতে অর্জন হয়েছে?—বিশেষ করে ওই সমস্ত মানুষদের ওপর, যারা অতি তুচ্ছ বিষয়ে বহুকাল পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকে এবং বিনাদ্বিধায় নিজেদের হাজার হাজার সৈন্য কুরবান করে দেয়, কিন্তু তাদের অন্তরে এই চিন্তাও আসে না যে, প্রতিপক্ষের নিকট মাথা নত করবে—কক্ষনো নয়! বরং নবি ﷺ যা কিছু পেশ করেছেন তা ছিল নুবুওয়াত ও রহমত, রিসালাত ও হিকমাত, মুজিযা ও দাওয়াত এবং আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া ও নিয়ামাত।

পঞ্চম অধ্যায়

ফরজ হাজ্জের বিধান (৯ম হিজরি) ও বিদায় হাজ্জ (১০ম হিজরি)

আরব মুশরিকরা নিজেদের ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ধর্মের অনুসারী বলেই দাবি করত। হাজ্জ পালনের প্রথা তারা পেয়েছে ইবরাহীমের কাছ থেকেই। অবশ্য এর সাথে নিজেদের মনগড়া অনেক বিদআত যুক্ত করে নিয়েছে তারা। খুব আড়ম্বর করেই হাজ্জ পালনের আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করে তারা।

নবি ﷺ মক্কাবিজয়ের পর সেখানে আত্তাব ইবনু উসাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে আসেন। আত্তাবের তত্ত্বাবধানেই মুসলিম-মুশরিক নির্বিশেষে সবাই হাজ্জ পালন করতে থাকে, তবে সেই দূষিত প্রাক-ইসলামী পদ্ধতিতেই। মক্কাবিজয়ের পরবর্তী বছর (৯ম হিজরি) নবি ﷺ আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাঠান হাজীদের নেতৃত্ব দিতে।

যুল-কা'দা মাসের শেষ দিকে তিন শ মুসলিমকে সাথে নিয়ে মক্কা রওনা হন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। কুরবানি করার উদ্দেশ্যে নবিজি ﷺ-এর বিশটি এবং নিজের পাঁচটি উট সাথে নেন তিনি। তিনি বেরিয়ে পড়ার পর সূরা তাওবার শুরুর আয়াতগুলো নাযিল হয়। মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোর ব্যাপারে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বার্তা আছে। যেসব চুক্তি লঙ্ঘিত হয়েছে, সেগুলো একবারে বাতিল। চুক্তিবিহীন গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ করার অথবা স্থানত্যাগের জন্য চার মাস সময় পাবে। আর যেসব চুক্তি লঙ্ঘিত হয়নি, সেগুলো বহাল থাকবে। অবতীর্ণ আয়াতগুলোর ব্যাপারে মক্কাবাসীদের জানাতে পাঠানো হয় আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে। কুরবানির ঈদের দিনে জামরার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আয়াতগুলো হাজীদের তিলাওয়াত করে শোনান। তারপর আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) একদল ঘোষককে দিয়ে চারদিকে ঘোষণা করিয়ে দেন যে, পরের বছর থেকে মুশরিকরা আর হাজ্জ করতে পারবে না। জাহিলি যুগের মতো উলঙ্গ হয়ে কা'বা তওয়াফ করাও এখন থেকে নিষিদ্ধ।[৫০৮]

প্রতিনিধিদের বছর

রাসূল ﷺ-এর সাথে কুরাইশদের দ্বন্দ্ব সাগ্রহে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল আরবের বেশির ভাগ গোত্র। তাদের বিশ্বাস—আল্লাহ তাআলা কা'বাকে মন্দের আগ্রাসন থেকে সুরক্ষিত রাখবেন। আবরাহার বিশাল হস্তিবাহিনীর শোচনীয় পরাজয় তো তারা

---

[৫০৮] বুখারি, ৩৬৯; ইবনু হিশাম, ২/৫৪৩-৫৪৬; যাদুল মাআদ, ৩/২৫-২৬।

স্বচক্ষেই দেখেছে। এখন যখন দেখল আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদকে বিজয়ী করেছেন, তখন ইসলামের সত্যতা নিয়ে তাদের আর কোনও প্রকারের সন্দেহ-সংশয় রইল না।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবি ও রাসূল হওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে বিভিন্ন আরব গোত্র থেকে একের পর এক প্রতিনিধিদল আসতে থাকে মদীনায়। নবিজি ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসা গোত্রের সংখ্যা সব মিলিয়ে সত্তর থেকে এক শ হবে। কারও উদ্দেশ্য বন্দিমুক্তি, কারও জিযইয়া প্রদান, কারও ইসলাম গ্রহণ। বেশির ভাগ দলই আসে মক্কাবিজয়ের পরের বছর ৯ম হিজরিতে। বছরটি তাই খ্যাতি লাভ করে عَامُ الْوُفُوْدِ বা "প্রতিনিধিদলের বছর" নামে।

তবে লক্ষণীয় যে, মক্কায় সেই দুর্বল অবস্থায় চরম নিপীড়নের মাঝেও নবি ﷺ যথেষ্ট প্রখ্যাত ছিলেন। আওস-খাযরাজ গোত্রদ্বয় সে সময়ই গোপনে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে। মদীনায় নবিজির হিজরতের পর প্রতিনিধি আসা-যাওয়া চলতে থাকে। নবম হিজরি সনে সেই সংখ্যা বেড়ে একশর কাছাকাছি চলে যায়।

একেকটি গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে, আর ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা বাড়তে থাকে। একসময় তা বিস্তৃত হয়ে পড়ে লোহিত সাগর থেকে আরব উপসাগর এবং দক্ষিণ জর্দান থেকে ইয়েমেন হয়ে ওমান পর্যন্ত। প্রতিটি অঞ্চলে ইসলামি আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য নবি ﷺ প্রশাসক এবং বিচারকও নিযুক্ত করেন। ধর্মীয় শিক্ষকদেরও দূরদূরান্তে পাঠান মানুষকে ইসলাম-চর্চার সঠিক পদ্ধতি জানাতে।

মরুবাসী বেদুইনদের মাঝে ইসলামের প্রচার-প্রসারে প্রতিনিধি আগমনেরও বড় ভূমিকা রয়েছে। একেক প্রতিনিধিদলের একেক উদ্দেশ্য থাকলেও সবার মাঝেই নবিজির গভীর প্রভাব পড়ে। তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে সারা আরবে। এমনই এক মানুষ, যিনি কিনা আরবের প্রতাপশালী সব গোত্রকে পদানত করেছেন। তারপরও সম্পদের বদলে বেছে নিয়েছেন ধর্মাদর্শ, প্রতিশোধের বদলে দয়া আর বিলাসিতার বদলে শ্রম। অনেকগুলো প্রতিনিধিদল স্রেফ নবিজি ﷺ-এর সাহচর্যে এসেই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। ফিরে গিয়ে নিজ নিজ জাতিকেও তারা আহ্বান করে মূর্তিপূজা বাদ দিয়ে মুসলিম হয়ে যেতে। ইসলাম গ্রহণ করতে। এদের মাঝে কিছু প্রতিনিধিদল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবদুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদল

বানূ আবদিল কাইসের বসবাস পূর্ব আরবে। এরাই মদীনার বাইরে ইসলাম গ্রহণকারী

প্রথম গোত্র। মাসজিদে নববির বাইরে প্রথম জুমুআ আদায় হয় আবদুল কাইস গোত্রের মাসজিদে। যার অবস্থান বাহরাইনের ‘জুআসা’ নামক গ্রামে।[৫০৯]

পঞ্চম ও নবম হিজরি সনে মোট দুবার দেখা করতে আসেন তারা। প্রথম দলটিতে ছিলেন তেরো কি চৌদ্দ জন সদস্য। বাইরে থেকেই মাসজিদের ভেতর নবিজি ﷺ-কে দেখে তারা দ্রুত বাহন থেকে নেমে দৌড়ে আসে।

তবে তাদের মধ্যকার কনিষ্ঠতম সদস্য মুনযির ইবনু আইয আশাজ্জ দৌড়ে আসেননি। তিনি আস্তেধীরে সবার উটগুলো বসান। তারপর সব মালামাল হাওদা থেকে নামিয়ে একজায়গার জমা করেন। আগের পরিধেয় কাপড় পাল্টে পরে নেন নতুন দুটি সাদা কাপড়। তারপর এগিয়ে গিয়ে নবি ﷺ-কে সালাম দেন। মুনযির (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আচরণের প্রশংসা করে রাসূল ﷺ বলেন, “তোমার মাঝে দুটি গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার অতি প্রিয়—সহিষ্ণুতা ও ধীরতা।”[৫১০]

এই দলটি মদীনায় এসে পৌঁছানোর আগেই নবি ﷺ সাহাবিদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, “এখন একটি কাফেলা আসবে। পূর্ববাসীদের মাঝে এরাই শ্রেষ্ঠ। স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা। আমার কাছে আসার জন্যই তারা উটগুলোকে ক্লান্ত করে ফেলেছে, শেষ করে ফেলেছে সব রসদ। হে আল্লাহ, আবদুল কাইসকে ক্ষমা করুন।”

প্রতিনিধিদলটি এসে পৌঁছানোর পর নবি ﷺ বলেন, “স্বাগতম! তোমরা লাঞ্ছিতও হবে না, লজ্জিতও হবে না।” তারা জীবনপথে চলার জন্য দরকারি কিছু বিষয় শিখিয়ে দিতে নবি ﷺ-কে অনুরোধ করেন। নবি ﷺ তাদের চারটে দায়িত্ব দেন—

১. আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁর নবি ও রাসূল বলে মেনে নেওয়া,

২. সালাত প্রতিষ্ঠা,

৩. যাকাত প্রদান,

৪. রমাদানের সিয়াম পালন।

হাজ্জ তখনো ফরজ হয়নি। তাই এর হুকুম তখন আবদুল কাইসের প্রতিনিধিদের বলেননি রাসূল ﷺ। তা ছাড়া যেকোনও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ দিয়ে যাওয়ার আদেশও করা হয়। মাদক সেবন নিষেধ করার পাশাপাশি ধ্বংস করে ফেলতে বলা হয়

---

[৫০৯] বুখারি, ৮৯২।

[৫১০] মুসলিম, ১৮।

মদ পরিবেশনে ব্যবহার্য সব পাত্রও।[৫১১]

চার বছর পর চল্লিশ সদস্যবিশিষ্ট আরেকটি দল আসে। সে দলে জারূদ ইবনু আলা আবদি নামে একজন খ্রিষ্টানও ছিল। নবিজি ﷺ-এর সাথে দেখা করার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খুব ভালোভাবে তা পালন করতে থাকেন।[৫১২]

দিমাম ইবনু সা'লাবার আগমন ও জিজ্ঞাসাবাদ

ইসলামের দাওয়াহ এত দূর ছড়িয়ে পড়ে যে, দুর্গম এলাকাবাসী রুক্ষস্বভাব নিরক্ষর জাতিগুলোও সে ব্যাপারে জানতে পারে। এমনই এক গোত্র সা'দ ইবনু বকর। তাদের গোত্রপতি দিমাম ইবনু সা'লাবা মদীনায় আসেন নবি ﷺ-কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে।

দিমামের লম্বা চুলে ছিল দুটি বেণী। উটকে বসিয়ে মাসজিদে নববির সাথে বেঁধে নেন। তারপর সোজা মাসজিদে ঢুকে জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের নাতি কে?" সবাই নবিজি ﷺ-এর দিকে দেখিয়ে দেয়। দিমাম ইবনু সা'লাবা এগিয়ে এসে বলেন,

"মুহাম্মাদ, আপনাকে সোজাসুজি কিছু কথা জিজ্ঞাসা করব এবং জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে কঠোরতা করব। যাতে আমার মনে কোনও খটকা না থাকে।"

"যা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করুন।"

"আমাদের নিকট আপনার দূত এসে বলেছে যে, আপনি নাকি দাবি করেন—আপনি আল্লাহর রাসূল?"

"হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে।"

"আচ্ছা। বলুন, আসমান কে সৃষ্টি করেছে?"

"আল্লাহ।"

"জমীন কে সৃষ্টি করেছে?"

"আল্লাহ।"

"এই পাহাড় কে স্থাপন করেছে আর এর ভেতরে যা কিছু আছে, তা কে বানিয়েছে?"

"আল্লাহ।"

---

[৫১১] বুখারি, ৫৩।

[৫১২] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ৮/৮৫-৮৬; নববি, শারহু মুসলিম, ১/৩৩।

“যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন, জমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এই সমস্ত পাহাড় স্থাপন করেছেন সেই সত্তার কসম—আল্লাহ্ কি আপনাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?

“জি।”

“আপনার দূত আরও বলেছে যে, আমাদের ওপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত (ফরজ) সালাত রয়েছে?”

“সে সত্য বলেছে।”

“আপনাকে যিনি রাসূল বানিয়েছেন, তাঁর কসম—আল্লাহ্ কি সত্যিই আপনাকে এই আদেশ দিয়েছেন?

“হ্যাঁ।”

“আপনার দূত এ-ও বলেছে যে, আমাদের ওপর আমাদের সম্পদের যাকাত দেওয়া ফরজ।”

“জি, সে সত্য বলেছে।”

“আপনাকে যিনি রাসূল বানিয়েছেন, তাঁর কসম—আল্লাহ্ কি সত্যিই আপনাকে এই আদেশ দিয়েছেন?”

“হ্যাঁ।”

“আপনার দূত বলেছে, আমাদের ওপর প্রতিবছর রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা ফরজ।”

“সে সত্য বলেছে।”

“আপনাকে যিনি রাসূল বানিয়েছেন, তাঁর কসম—আল্লাহ্ কি সত্যিই আপনাকে এই আদেশ দিয়েছেন?”

“হ্যাঁ।”

“আপনার দূত আরও বলেছে যে, যারা বাইতুল্লাহ পর্যন্ত আসা-যাওয়ার সামর্থ্য রাখে তাদের ওপর হাজ্জ করা ফরজ!”

“হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে।”

“আপনাকে যিনি রাসূল বানিয়েছে, তাঁর কসম—আল্লাহ কি সত্যই আপনাকে এই আদেশ দিয়েছেন?”

“হ্যাঁ।”

দিমাম ইবনু সা'লাবা বললেন, “যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম—আমি এর চেয়ে বাড়াবও না আবার কমও করব না।”

রাসূল ﷺ দিমামের ব্যাপারে সাহাবিদের বলেছিলেন, “যদি সে সত্য বলে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

দিমাম ইবনু সা'লাবা (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেদিন মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যান। রাসূল ﷺ-এর সাথে কথোপকথনের বিষয়টি জানান সবাইকে। তিনি কী আদেশ করেছেন আর কী নিষেধ করেছেন সব খুলে বললে সেদিনই তারঁ সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ সবাই মুসলিম হয়ে যায়। একজনও বাকি ছিল না। এরপরে তারা সেখানে মাসজিদ নির্মাণ করে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা আরম্ভ করেন। এই কারণে নিঃসন্দেহে বলা যায়, দিমাম ইবনু সা'লাবা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর চেয়ে উত্তম কোনও আগমনকারী ছিল না।[৫১৩]

আযরা এবং বালি গোত্রদ্বয়ের প্রতিনিধিদল

নবম হিজরি সনের সফর মাসে বানূ আযরা থেকে বারো জন লোক আসেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে। নবিজির গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা কুসাইয়ের সাথে নিজেদের মিত্রতার কথা জানান তারা। মক্কা থেকে বকর এবং খুযাআ গোত্রকে বিতাড়িত করতে তাকে কীভাবে সাহায্য করেছেন, সে কথাও বলেন। এই কারণে নবি ﷺ তাদের মারহাবা ও অভিনন্দন জানান।

এরপর তাদের সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের তিনি সিরিয়া বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং পৌত্তলিক ধর্মের আচারপ্রথা ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দেন। যেমন, জ্যোতিষীদের কাছে যাওয়া, মন্দিরে পশুবলি দেওয়া, অগ্নিপূজা করা ইত্যাদি।

একই বছরে বালি থেকেও আরেকটি প্রতিনিধিদল আসে। এর সদস্যরাও ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ি ফেরেন। মদীনায় তিন দিন অবস্থান করেছিলেন তারা।

---

[৫১৩] বুখারি, ৬৩; তিরমিযি, ৬১৯।

বানূ আসাদ ইবনি খুযাইমা গোত্রের প্রতিনিধিদল

নবম হিজরির শুরুর দিকে বানূ আসাদ ইবনি খুযাইমার একটি দল নবিজি ﷺ-এর সাক্ষাতে আসে। এসে মাসজিদের ভেতর কয়েকজন সাহাবির সাথে বসা দেখতে পায় নবিজিকে। সবাই সালাম প্রদানের পর তাদের মুখপাত্র বলেন,

"হে আল্লাহর রাসূল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক। তাঁর কোনও অংশীদার বা সমকক্ষ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তাঁর দাস ও বার্তাবাহক। হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদের কাছে কোনও দূত পাঠানো ছাড়াই আমরা ইসলাম গ্রহণ করছি। অন্যান্য গোত্রের মতো আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিনি। নিজ জাতির পক্ষ থেকে শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছি আমরা।"

এ দাবির প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন,

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

> "তারা ভেবেছে ইসলাম গ্রহণ করে তারা আপনার ওপর অনুগ্রহ করে ফেলেছে। বলে দিন, 'তোমরা মুসলিম হয়ে আমাকে করুণা করোনি; বরং আল্লাহই তোমাদের ঈমানের দিকে হিদায়াত দিয়ে বিরাট করুণা করেছেন। যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো।"[৫১৪]

এরপর প্রতিনিধিদলটি ভাগ্যগণনা, জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করা এবং পাখির ওড়ার পথ দেখে সুলক্ষণ-কুলক্ষণ নির্ধারণ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। নবি ﷺ জানিয়ে দেন যে, এগুলো সব শরীআতে নিষিদ্ধ, করা যাবে না। লক্ষণের অর্থ বের করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে নবি ﷺ বলেন, "এক নবি ছিলেন, যিনি এটা পারতেন। তোমাদের জ্ঞান ওই নবির সমান হলে করতে পারো।" মোটকথা, ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের যেকোনও চেষ্টা ইসলামে হারাম। আরও কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি শিখে নেয় দলটি।

তুজীব গোত্রের প্রতিনিধিদল

কিন্দা গোত্রের একটি শাখা তুজীব। তারা আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। যাকাত বণ্টনের পর বেঁচে যাওয়া কিছু টাকা তারা সাথে করে নিয়ে আসে, যাতে অন্যান্য

[৫১৪] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৭।

অভাবী মুসলিমদের সাহায্য করা যায়। নবি ﷺ এতে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাদের বেশ সম্মান করেন।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে প্রতিনিধিদলটির দিকে তাকিয়ে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) মন্তব্য করেন, "আমাদের নিকট আরবের এদের চেয়ে উত্তম কোনও প্রতিনিধিদল আসেনি।"

প্রত্যুত্তরে নবি ﷺ বলেন, "হিদায়াত আল্লাহর হাতে। সুতরাং তিনি যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তার বক্ষকে ঈমানের জন্য অবারিত করে দেন।"

তুজীব সদস্যরা ইসলাম শেখার ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহ প্রকাশ করেন। কুরআন-সুন্নাহ হিফয করার ব্যাপারেও তাদের তৎপরতা দেখা যায়। বিদায়বেলায় নবি ﷺ তাদের অনেক উপঢৌকন দেন। জিজ্ঞেস করেন যে, কেউ বাদ পড়ে গেছে কি না। তারা জানায় যে, শিবিরে একটি বালককে রেখে এসেছেন তারা। যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়েসি। নবি ﷺ বলেন, "ওকেও পাঠিয়ে দাও।"

দলটি ফিরে গিয়ে সেই ছেলেকে নবিজি ﷺ-এর কথা বলে। ছেলেটি এসে জানায়, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, একটু আগে যেই গোত্রটি এসেছিল, আমিও তাদের সদস্য। আপনি তাদের তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়েছেন। এবার আমাকেও আমার প্রয়োজনীয় জিনিসটি দিন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "কী চাও তুমি?"

"আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আমাকে মাফ করে দেন, আমাকে রহম করেন এবং আমার হৃদয় প্রাচুর্যে ভরে দেন।" নবি ﷺ ছেলেটির জন্য দুআ করেন। স্বগোত্রীয়দের চেয়ে সন্তুষ্টতর মন নিয়ে ফিরে যায় সে। পরে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে যখন ধর্মত্যাগের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে, তখন এই ছেলেটি নিজে তো ঈমান ও ইসলামের ওপর অটল ছিলই, অন্যদেরও আহ্বান করে গেছে মুসলিম থাকার ব্যাপারে।

বানূ ফাযারা গোত্রের প্রতিনিধিদল

বানূ ফাযারা থেকে বিশ জনেরও বেশি সদস্যবিশিষ্ট একটি দল আসে। নবি ﷺ তাবূক থেকে ফিরে আসার পর সাক্ষাৎ করে তারা। তারাও মুসলমান হয়েছে। তাদের এলাকায় চলছিল ভয়াবহ খরা। নবিজি ﷺ-এর সাহায্যের জন্য তাই তারা উদগ্রীব ছিল।

তারা নবিজি ﷺ-কে বললেন, "আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন

আমাদের গ্রামে বৃষ্টি পাঠান। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, আপনার রবও যেন আপনার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন।"

নবি ﷺ বললেন, "সুবহানাল্লাহ! তোমাদের জন্য আফসোস! এ কী বলছ তোমরা! হ্যাঁ, অবশ্যই আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করব। কিন্তু আল্লাহর কী প্রয়োজন কারও কাছে সুপারিশ করার? আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। তিনি সুউচ্চ, সুমহান। তাঁর কুরসি সমগ্র আসমান-জমীনে ব্যাপ্ত। তাঁর মহিমা ও প্রতাপের কারণে সেগুলো উটের পিঠে নতুন হাওদার মতো আওয়াজ করে কাঁপতে থাকে।"

এই নসীহত করে নবি ﷺ মিম্বরে উঠে দাঁড়ান। বানূ ফাযারার দুর্ভোগ দূর হওয়ার দুআ করেন। আল্লাহ তাআলা নবিজির এ দুআ কবুল করে তাদের ভূমিতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেন।[৫১৫]

নাজরানবাসীর প্রতিনিধিদল

দক্ষিণ আরবের এক বিশাল এলাকা নাজরান। দ্রুতগামী ঘোড়াও এটি পার হতে একদিন লাগিয়ে ফেলবে। এখানকার তিয়াত্তরটি লোকালয়ের প্রতিরক্ষায় আছে ১ লক্ষ ২০ হাজার খ্রিষ্টান সেনা।[৫১৬] নবি ﷺ নাজরানের বিশপের কাছে চিঠি লিখে ইসলামের দাওয়াত দেন। উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করেন বিশপ। তারপর নবি-দাবিদার এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে নাজরানের জনগণকে জানান।

অনেক আলোচনার পর ঠিক হয় যে, ষাট সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হবে। মদীনায় এসে পৌঁছানো এই প্রতিনিধিদের পরনে ছিল মাটি ছেঁচড়ানো অলংকৃত রেশমি আলখাল্লা। আঙুলে ঝকমক করছিল স্বর্ণের আংটি।

এত জাঁকজমক সজ্জা দেখে নবি ﷺ তাদের সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান। সাহাবিরা নাজরানিদের পরামর্শ দেন এগুলো পাল্টে অনাড়ম্বর পোশাক পরে নিতে। নবিজির উপস্থিতিতে স্বর্ণ ব্যবহার করতেও নিষেধ করা হয়। তারা সে উপদেশ মোতাবেক কাজ করার পর নবি ﷺ কথা বলতে সম্মত হন। ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি তাদের। তারা প্রত্যাখ্যান করে বলে যে, নবি ﷺ তাঁর মিশন শুরু করার অনেক আগ থেকেই তারা 'মুসলিম' হয়ে আছে।

---

[৫১৫] যাদুল মাআদ, ৩/৪৮।

[৫১৬] ফাতহুল বারি, ৮/৯৪।

নবি ﷺ নাজরানের প্রতিনিধিদের বলেন, "তোমাদের ইসলাম থেকে বিরত রাখছে তিনটি জিনিস—১. ক্রুশের পূজা, ২. শূকর ভক্ষণ, এবং ৩. আল্লাহর পুত্র আছে বলে দাবি করা।"

প্রতিনিধিদলটি নবিজি ﷺ-কে চ্যালেঞ্জ করে, "ঈসা জন্মেছেন কোনও পিতা ছাড়া। তাঁর সমকক্ষ আর কে আছে?"

আয়াত নাযিল করে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা এর জবাব দেন,

> إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٩٥﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٠٦﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿١٦﴾
>
> "আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো। আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। তারপর বলেছেন "হও" আর হয়ে গেছে। এটি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য। অতএব, সন্দেহ পোষণকারীদের দলভুক্ত হয়ো না। সত্য জানার পরও যদি কেউ তোমার সাথে ঈসার ব্যাপারে তর্ক করে, তাকে বলে দাও, 'এসো, আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানসহ জড়ো হই। তারপর চলো আমরা মিলে আল্লাহর কাছে দুআ করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি, যারা মিথ্যাবাদী।'"[৫১৭]

নবি ﷺ প্রতিনিধিদলকে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনান। আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী চ্যালেঞ্জও করেন। প্রতিনিধিরা নিজেদের মাঝে আলোচনা করার সময় চায়। সিদ্ধান্তে আসে, "উনি যদি সত্যিই নবি হন, আর আমরা অভিসম্পাতের দুআ করি, তাহলে তো সবাই ধ্বংস হয়ে যাব।" তাই নির্দ্বিধায় জিযইয়া প্রদান করতে রাজি হয়ে ফিরে যায় তারা।

তারা সফর মাসে এক হাজার এবং রজব মাসে এক হাজার সেট করে কাপড় প্রদান করবে। বিনিময়ে নবি ﷺ নাজরান ভূমিতে তাদের শান্তি, নিরাপত্তা ও ধর্মপালনের স্বাধীনতা দেন। শর্তের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একজন বিশ্বস্ত মুসলিমকে সাথে পাঠানোর অনুরোধ করে প্রতিনিধিরা। নবি ﷺ আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ

---

[৫১৭] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৫৯-৬১।

(রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাদের সাথে পাঠান। এ থেকে তাঁর নাম পড়ে যায় أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ। অর্থাৎ ‘এই উম্মাহর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি’। আবূ উবাইদার প্রভাবে দু’জন প্রতিনিধি ইসলামও গ্রহণ করেন মাঝপথে। এরপর ধীরে ধীরে ইসলাম নাজরানবাসীর অন্তর জয় করে নেয়। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়।[৫১৮]

তায়িফবাসীদের প্রতিনিধিদল

হুনাইনের যুদ্ধের পর তায়িফ নগরে অবরোধ আরোপ করেও লাভ হয়নি। নবি ﷺ মদীনায় ফিরে আসার সময় পেছন পেছন ছুটে আসেন তায়িফের এক গোত্রপতি উরওয়া ইবনু মাসঊদ সাকাফি। মুসলিম সেনাদল মদীনায় ঢোকার ঠিক আগ মুহূর্তে এসে তাদের নাগাল পান। নবিজির সাথে কথোপকথনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি। তারপর আত্মবিশ্বাসী মন নিয়ে ফিরে যান তায়িফে। তায়িফের জনগণ প্রায়ই তাকে বলে যে, নিজ পরিবারের চেয়েও তিনি তাদের বেশি প্রিয়। তাই ইসলামের ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করে দিলে তারা অবশ্যই মেনে নেবে, এমনটাই ধরে নেন উরওয়া। কিন্তু তার ঈমানের ঘোষণা শুনে তায়িফবাসীরা তিরবর্ষণে শহীদ করে ফেলে তাকে।

পৌত্তলিকতার জযবা একটু থিতিয়ে আসার পর তায়িফবাসীরা ঠিকই বাস্তবসম্মত চিন্তা করতে শুরু করে। ইসলামের জোয়ারে যে বেশিদিন বাঁধ দিয়ে রাখা যাবে না, সে বোধোদয় হয় তাদের। চারপাশের গোত্রগুলোও একে একে মুসলিম হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা নবিজি ﷺ-এর সাথে আলাপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আবদু ইয়ালীলের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের এক প্রতিনিধিদল আসে মদীনায়। মাসজিদের এক কোণে নবি ﷺ তাদের জন্য একটি তাঁবু খাটান। যাতে সেখানে অবস্থান করেই তারা কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পায় এবং দেখতে পায় মুসলিমদের সালাত আদায়ের দৃশ্য।

কয়েক দফা বৈঠকে নবি ﷺ অতিথিদের ইসলামের দাওয়াহ দেন। কিন্তু এটি তাদের জীবনব্যবস্থার একেবারেই বিপরীত। পরে দাবি করে যে, তারা কয়েকটি শর্তে মুসলিম হতে রাজি। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবে না তারা। সেই সাথে ব্যভিচার, মদ এবং সুদও হারাম না করার অনুরোধ করে। আর তাদের প্রধান দেবী লাতের মূর্তিও যেন অক্ষত রাখা হয়।

স্বভাবতই রাসূল ﷺ সোজা “না” করে দেন এসব প্রস্তাবে। অবশেষে প্রতিনিধিদলটি নিঃশর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি হয়। তবে নিজ হাতে লাত মূর্তি ধ্বংস করতে

---

[৫১৮] ফাতহুল বারি, ৮/৯৪-৯৫; যাদুল মাআদ, ৩/৩৮-৪১।

পারবে না তারা—তাদের এই একটি অনুরোধ নবি ﷺ মেনে নেন।

প্রতিনিধিদলের নবীনতম সদস্য উসমান ইবনু আবিল আস সাকাফি (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তাকে সাধারণত তাঁবুতেই রাখা হতো। নবি ﷺ ও আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে থাকতেই তিনি কুরআন শিক্ষা করতে থাকেন। স্বগোত্রীয়দের অজান্তে হিফয করে ফেলেন কুরআনের একটি বড় অংশ। বাকি সবাইকে অবাক করে দিয়ে উসমানকে ওই দলের ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তার ইলম এবং কুরআনের প্রতি ভালোবাসার কারণেই নবি ﷺ এ সম্মান দেন তাকে।

তায়িফে ফিরে গেলেও প্রতিনিধিরা স্বজাতির কাছে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন। রাসূল ﷺ-এর এক ভয়ংকর চিত্র তৈরি করে তাদের ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করেন, "কী আর বলব! এমন এক তেজি যোদ্ধার সাথে দেখা করে এলাম, যিনি তলোয়ার দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। সবাই তাঁর বড়ত্ব মেনে নিয়েছে। আমাদের সাথে খুব নির্দয় আচরণ করে বললেন যে, ব্যভিচার-মদ-সুদ না ছাড়লে যুদ্ধ করে শেষ করে দেবেন আমাদের।"

প্রথম প্রথম তায়িফবাসীরা এই হুমকিতে ভয় না পাওয়ার চেষ্টা করে। নিজেদের মিথ্যে মর্যাদাবোধ রক্ষায় মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত থাকার দাবি করে বসে। দুই-তিন দিন পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করতে থাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে মুসলিম বাহিনীর ব্যাপারে ভয় তাদের অন্তরকে গ্রাস করে ফেলে। প্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ করে আবারও মদীনায় গিয়ে নবিজি ﷺ-এর আদেশে সম্মতি জানিয়ে আসতে। এবার প্রতিনিধিরা প্রকাশ করেন যে, ইতিমধ্যে তারা সেসবে সম্মতি দিয়ে মুসলিম হয়ে এসেছেন। ফলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে বানূ সাকীফ। তারপর সবাই মুসলিম হয়ে যায়।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, মুগীরা ইবনু শু'বা সাকাফি (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সাথে তায়িফের আরও কয়েকজন মুসলিমকে নবি ﷺ প্রেরণ করেন লাত দেবীর মূর্তি ধ্বংস করতে। আক্ষরিক ও রূপক উভয় অর্থেই ধসে পড়ে তায়িফে শিরকের এই শেষ চিহ্নটি। এলাকাটি পরিণত হয় ইসলামি রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে।[৫১১]

বানূ আমির ইবনি সা'সাআ গোত্রের প্রতিনিধিদল

বানূ আমির ইবনি সা'সাআর প্রতিনিধিদলে ছিল আরবাদ ইবনু কাইস, জাব্বার ইবনু আসলাম এবং আমির ইবনু তুফাইল। ভুলে গেলে চলবে না, আল্লাহর দুশমন

[৫১১] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ২/৫৩৭-৫৪২; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ৩/২৬-২৮।

এই আমির ইবনু তুফাইলই ছিল বি'রু মাঊনার সেই গণহত্যার মূল হোতা। সে এবং আরবাদ এবার এখানে এসেছে সুযোগ বুঝে নবি ﷺ-কে হত্যা করতে।

দলটি মদীনায় আসার পর নবি ﷺ তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। দলের নেতা হিসেবে আমির উল্টো বলে, "আপনাকে তিনটির যেকোনও একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিচ্ছি।

১. আপনি উপত্যকাবাসীদের শাসক হবেন, আর আমি হব মরুবাসীদের শাসক।
২. অথবা আমাকে আপনার পরে শাসনভারের উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাবেন।
৩. যদি দুটার একটাও না মানেন, তাহলে গতফানের এক হাজার ঘোড়া আর এক হাজার ঘুড়ি নিয়ে আপনার ওপর হামলা করব আমি।"[৫২০]

নবি ﷺ প্রতিটি প্রস্তাবই নাকচ করে দিয়ে বলেন যে, "হে আল্লাহ, আমিরের বিরুদ্ধে আপনিই আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে যান এবং তার জাতিকে হিদায়াত দান করুন।"

এদিকে পরিকল্পনামাফিক আরবাদ একটু একটু করে সরে নবি ﷺ-এর পেছনে চলে যায়। আর আমির তাঁকে কথার মাধ্যমে ব্যস্ত রাখে। যেই না আরবাদ তরবারি বের করতে যাবে, অমনি সে খেয়াল করে তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো নিশ্চল হয়ে গেছে। ব্যর্থমনোরথে ফিরে যায় নিকৃষ্ট দুই ষড়যন্ত্রকারী।

ফিরতি পথে আপন বংশ বানূ সালূলের এক নারীর বাসায় যাত্রাবিরতি করে আমির ইবনু তুফাইল। সেখানে সে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাকে প্রচণ্ড অসুস্থ করে দেন। উটের কুঁজের মতো বড় একটি টিউমার তৈরি হয় তার গলায়। সে বলে উঠল, "উটের রোগ নিয়ে মারা যাব আমি! তাও কিনা এক মহিলার বাড়িতে! এ হতে পারে না। আমার ঘোড়া নিয়ে আসো!" তারপর সে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয় এবং সেখানে বসেই তার মৃত্যু হয়।[৫২১]

ওদিকে আমিরের সহযোগী আরবাদ ফিরছিল তার উটে চড়ে। হঠাৎ এক বজ্রাঘাতে সে ও তার উট একেবারে ছাইয়ে পরিণত হয়। আরবাদের এই পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন,

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ

[৫২০] বুখারি, ৪০৯১; ফাতহুল বারি, ৭/৪৪৭।

[৫২১] বুখারি, ৪০৯১।

يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿٣١﴾

"সভয়ে তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ্র এবং সব ফেরেশতা। তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা তাকে তা দ্বারা আঘাত করেন। তারপরও তারা আল্লাহর ব্যাপারে বিতণ্ডা করে অথচ তিনি মহাশক্তিশালী!"[৫২২]

আমির এবং আরবাদের মৃত্যুর খবর নবিজি ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসেন বানূ আমিরের আরেক ব্যক্তি মাওইলা ইবনু জামিল (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তিনিও বাকি দু'জনের সাথে মদীনা এসেছিলেন। পার্থক্য হলো, তিনি নবিজি ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। নিজের উটটিও উপহার হিসেবে দিয়ে দেন নবিজিকে। সে সময় মাওইলার বয়স ছিল বিশ বছর। তিনি নবিজির হাতে বাইআতও গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে শতবর্ষ আয়ুপ্রাপ্ত এই ব্যক্তিটি বাগ্মিতার কারণে "দুই জিহ্বাধারী" উপাধি পান।

বানূ হানীফা গোত্রের প্রতিনিধিদল

বানূ হানীফাও নবম হিজরিতেই সাক্ষাতে আসে। সতেরো সদস্যের দলটি মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে মুসলিম হন। নবি-দাবিদার কুখ্যাত মিথ্যুক মুসাইলিমাও সেখানে ছিল। তবে সে-ও অন্যদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, নাকি নবিজির সাথে দেখা না করে তাঁবুতেই বসে ছিল—এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কিছু সূত্রে এমনও উল্লেখ করা হয় যে, ইসলাম গ্রহণের বিনিময়ে সে নবি ﷺ-এর উত্তরাধিকারী হওয়ার বায়না ধরে।

এই প্রতিনিধিদলটি আসার আগে নবি ﷺ একটি স্বপ্ন দেখেন। দেখেন যে, তাঁর কাছে অনেক ধনসম্পদ নিয়ে আসা হয়েছে। সেখান থেকে স্বর্ণের দুটি বালা এনে নবি ﷺ-এর দু-হাতে পরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথা লাগতে থাকে তাঁর হাতে। আদেশ করা হয় বালা দুটিতে ফুঁ দিতে। তিনি ফুৎকার দিতেই বালা দুটো খুলে পড়ে যায়। নবি ﷺ সাহাবিদের বলেন যে, বালা দুটো তাঁর পরে আসন্ন দু'জন মিথ্যে নবি দাবিদারের প্রতীক।

সাহাবি সাবিদ ইবনু কাইস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে একবার হাঁটছিলেন রাসূল ﷺ। এমন সময় দেখা হয় প্রথম মিথ্যুকের সাথে। মুসাইলিমা কাযযাব। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে এসে দাম্ভিক ভঙ্গিতে মুসাইলিমা বলে, "চাইলে আপনি রাষ্ট্রপ্রধান থাকতে পারেন।

[৫২২] সূরা রাদ, ১৩ : ১৩।

তবে আমাকে আপনার খলীফা বানিয়ে যেতে হবে।"

নবি ﷺ-এর হাতে ছোট একটি খেজুরের থোকা ছিল। সেটি দেখিয়ে তিনি বলেন, "যদি এটিও চাও আমি তোমাকে তাও দেবো না। আল্লাহর ফায়সালা থেকে তো পালাতে পারবে না। যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আল্লাহ তোমায় ধ্বংস করে দেবেন। আল্লাহর শপথ! তোমাকে নিয়ে আমি স্বপ্নে যা দেখার তা দেখেছি। ইনি সাবিত ইবনু কাইস। আমার পক্ষ থেকে ইনিই তোমার জবাব দেবেন। তারপর নবি ﷺ ফিরে আসেন।"[৫২৩]

প্রতিনিধিদল ফিরে আসার পর মুসাইলিমা কিছুদিন চুপচাপ থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন ঘোষণা করে বসে যে, রাসূল ﷺ-এর সাথে নুবুওয়াতের ব্যাপারে তাকেও শরীক করা হয়েছে। ফলে নিজেকেও ওহিপ্রাপ্ত নবি দাবি করে নিজ জাতির জন্য মদ ও ব্যভিচার হালাল ঘোষণা করে সে। তার কারণে অনেক ফিতনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তার জাতিকে। এমনকি নবি ﷺ জীবিত থাকতেই তাদের অনেকে মুসাইলিমার মিথ্যে মতাদর্শ গ্রহণ করে নেয়।

রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর সময়ও মুসাইলিমার কর্মকাণ্ড চলমান ছিল। খলীফা আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) নিজ শাসনামলে তাকে চূড়ান্ত শাস্তি দেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে পাঠান মুসাইলিমা-বাহিনীকে শেষ করে দিয়ে আসতে। প্রচণ্ড যুদ্ধ বেঁধে যায় উভয় পক্ষের মাঝে। অতীত জীবনে হামযা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করে কুখ্যাতি কুড়ানো ওয়াহশি ইবনু হারব (রদিয়াল্লাহু আনহু) এখন এক মুসলিম মুজাহিদ। আল্লাহর রহমতে তিনিই এবার লাভ করেন ভণ্ড নবিকে হত্যা করার সুউচ্চ মর্যাদা।

হিমইয়ারের রাজাদের প্রতিনিধি

হিমইয়ারের তিন রাজা—হারিস ইবনু আবদি কুলাল, নুআইম ইবনু আবদি কুলাল এবং নু'মান। নবি ﷺ তাবূক থেকে ফেরার পর মালিক ইবনু মুররাহ তাঁর কাছে একটি চিঠি নিয়ে আসেন রাজাত্রয়ের পক্ষ থেকে। হামদানের শাসকদের পাঠানো আরেকটি চিঠিও ছিল তার হাতে। সব কয়জন শাসক নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা লিখেছেন চিঠিতে। রদিয়াল্লাহু আনহুম। ফিরতি চিঠিতে নবি ﷺ মুসলিম হিসেবে তাদের দায়িত্ব ও অধিকার ব্যাখ্যা করে দেন।

প্রতিনিধিদলটির সাথে মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-সহ আরও কয়েকজন

---

[৫২৩] বুখারি, ৪৩৭৩।

সাহাবিকে নবি ﷺ প্রেরণ করেন সেখানকার বিচারক ও সামরিক নেতা হিসেবে কাজ করতে। সেই এলাকার (অর্থাৎ ইয়েমেনের ওপরের দিকের) যাকাত সংগ্রহের তদারকি এবং সালাতের ইমামতি করার দায়িত্বও পান তারা।

আবু মূসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাঠানো হয় ইয়েমেনের নিচের দিকে—যুবাইদ, মারিব, যামআ এবং উপকূলীয় অঞ্চলে। নবি ﷺ দু'জনকেই উপদেশ দেন, "তোমরা দু'জনে সহজ করবে, কঠিন করবে না। সুসংবাদ দেবে, ভয় দেখাবে না। দু'জনে মিলেমিশে থাকবে, মতবিরোধ করবে না।"[৫২৪]

নবি ﷺ এর মৃত্যু পর্যন্ত মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু) ইয়েমেনেই থাকেন। আর আবু মূসা আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বিদায় হাজ্জের সময় একবার দেখা করতে এসেছিলেন।

হামদানের প্রতিনিধিদল

হামদান ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ একটি গোত্র। ৯ম হিজরিতে নবি ﷺ তাবুক থেকে ফেরার পর তাদের প্রতিনিধিদল মদীনায় আসে। হামদানের প্রতিনিধিদলে ছিলেন বিখ্যাত কবি মালিক ইবনু নামাত (রদিয়াল্লাহু আনহু)। নবি ﷺ-এর প্রশংসায় তিনি লেখেন:

ওই যে মিনায় তওয়াফরত নারীর যিনি রব,
যার ইবাদত করে কারদাদের কাফেলা সব,
সেই রবেরই কসম খেয়ে বলছি আমি সবই,
মেনে নিলাম আমরা তাঁকে সত্য যিনি নবি।
আরশপতির হিদায়াতের বার্তাবাহক তিনি,
রণক্ষেত্রে উটের পিঠেও শক্তিশালী যিনি।

নবি ﷺ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের আমীর হিসেবে নিযুক্ত করেন মালিক ইবনু নামাত (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে। আর বাকিদের দাওয়াত প্রদানের জন্য পাঠান খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে। ছয় মাস যাবৎ ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করেও তেমন সাফল্য আসেনি। এবার নবি ﷺ খালিদকে ফেরত আনিয়ে আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাঠান সেখানে। তিনি নবিজির লেখা চিঠি পড়ে শুনিয়ে হামদানবাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। অবশেষে কাজ হয়। মুসলিম হয়ে যায়

[৫২৪] বুখারি, ৩০৩৮।

হামদানবাসীরা। সুসংবাদটি পেয়ে নবি ﷺ সাজদায় লুটিয়ে পড়েন। মাথা তুলে বলেন, "হামদানের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! হামদানের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!"[৫২৫]

বানূ আবদিল মাদান গোত্রের প্রতিনিধিদল

দশম হিজরির রবীউল আউয়াল মাসে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাঠানো হয় বানূ আবদিল মাদানের কাছে। ইয়েমেনের নাজরানে বসবাস করত তারা। রাসূল ﷺ খালিদকে বলে দেন তিন দিন যাবৎ তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করতে। এতে সাড়া না দিলে শক্তিপ্রয়োগে ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত করানো হবে তাদের।

খালিদ সেখানে পৌঁছে দিকে দিকে দূত পাঠিয়ে দেন। তারা এলাকাবাসীকে ডেকে বলেন, "জনগণ, ইসলাম গ্রহণ করুন, তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবেন।"

সাথে সাথে ইসলাম কবুল করে নেয় গোত্রটি। খালিদ ও তার বাহিনী তখন তাদের ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি শেখানোর কার্যক্রম শুরু করেন। নবি ﷺ-এর কাছে খবরও পাঠানো হয় সাফল্যের কথা জানিয়ে। তিনি খালিদকে বলেন সেখান থেকে একটি প্রতিনিধিদলকে মদীনায় নিয়ে আসতে। দলটি মদীনায় এলে নবিজি ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করেন,

"তোমরা জাহিলি যুগে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের কীভাবে দমন করতে?"

তারা জবাব দেন, "আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতাম, কেউ বিচ্ছিন্ন হতাম না। আর আমরা কারও প্রতি কোনও জুলুম করতাম না।"

রাসূল ﷺ বলেন, "তোমরা সত্যই বলেছ।"

তারপর কাইস ইবনু হুসাইন (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বানূ আবদিল মাদান গোত্রের প্রশাসক নিয়োগ করেন রাসূল ﷺ। শাওয়ালের শেষ এবং যুল-কা'দের শুরুর দিকে প্রতিনিধিদলটি মদীনা ত্যাগ করে।

মদীনা থেকে দূরে বসবাসরত জাতিগুলোর পুনরায় পৌত্তলিকতায় ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা বেশি। তাই নবি ﷺ আমর ইবনু হাযম (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কেও সেখানে পাঠিয়ে দেন ইসলামের ব্যাপারে আরও শিক্ষা দিতে।

---

[৫২৫] যাদুল মাআদ, ৩/৫৪৪; যাহাবি, তারীখুল ইসলাম, ২/৬৯০।

বানূ মাযহিজ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

দশম হিজরির রমাদান মাস। ইয়েমেনে বসবাসরত বানূ মাযহিজকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে আলি ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে সেখানে পাঠান আল্লাহর রাসূল ﷺ। তারা আগে আক্রমণ না করলে আলিও আক্রমণ করবেন না।

আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আহ্বানে প্রথমে নেতিবাচক সাড়া আসে। তারা মুসলিমদের দিকে তির ছুড়ে মারে। নির্ভীক আলি-বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে। বানূ মাযহিজ গোত্র একটু পরেই বুঝতে পারে যে, সামরিক দক্ষতায় তারা মুসলিম বাহিনীর ধারেকাছেও নেই। আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) আক্রমণ থামিয়ে আবারও ইসলামের দাওয়াহ দেন। এবার বানূ মাযহিজ প্রস্তাব গ্রহণ করে নিয়ে মুসলিম হয়ে যায়।

গোত্রপতি ও প্রভাবশালীরা এসে আনুগত্যের শপথ প্রদানের পর দরিদ্র-অভাবীদের জন্য কিছু দান-সদাকাও পেশ করেন। বলেন, "এখান থেকে আল্লাহর হক গ্রহণ করুন।" আলি ও তার সাথিরা সেখান থেকে সরাসরি উত্তর দিকে রওনা হয়ে মক্কায় চলে আসেন। সেখানে তারা বিদায় হাজ্জরত নবি ﷺ-এর সাথে মিলিত হন।

আযদি শানূআ গোত্রের প্রতিনিধিদল

দক্ষিণ আরবের এক সুবিখ্যাত গোত্র আযদি শানূআ। সুরাদ ইবনু আবদিল্লাহ আযদি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে তাদের প্রতিনিধিদল এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবি ﷺ সুরাদকে সেখানকার নেতা হিসেবে নিয়োগ করে নির্দেশ দেন যে, সেখানকার মুসলিমরা যেন দক্ষিণ আরবের পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে।

জারীর ইবনু আবদিল্লাহ-এর আগমন ও যুল-খালাসা ধ্বংস

প্রতিনিধিদল ও ব্যক্তির আসা-যাওয়া চলতে থাকে। এমনই এক ব্যক্তি এবং পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাহাবি জারীর ইবনু আবদিল্লাহ বাজালি (রদিয়াল্লাহু আনহু)। তার গোত্র বাজীলা এবং খাশআমের ছিল বিরাট এক মন্দির। 'যুল-খালাসা' নামক এ মন্দিরকে পৌত্তলিকরা কা'বার সাথে তুলনা করত। একে ডাকত 'ইয়েমেনের কা'বা' এবং 'শামের কা'বা' নামে।

নবি ﷺ একদিন বললেন, "জারীর, তুমি কি যুল-খালাসার ব্যাপারে আমাকে শান্তি দেবে না?" জারীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বুঝতে পারলেন যে, নবি ﷺ এই পৌত্তলিক মন্দিরটি ধ্বংস করার কথা বলছেন। কিন্তু অনুযোগ করেন যে, তিনি ঘোড়ার ওপর স্থির

থাকতে পারেন না। ঘোড়সওয়ার হিসেবে তিনি ততটা ভালো নন। তা শুনে জারীরের বুকে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করে নবি ﷺ দুআ করলেন, "হে আল্লাহ, তাঁকে স্থির অবিচল রাখুন। তাঁকেও পথ দেখান এবং তাঁর মাধ্যমে অন্যদেরও পথ দেখান।"

নবি ﷺ-এর দুআর বরকতে এরপর থেকে জারীর (রদিয়াল্লাহু আনহু) আর কখনও ঘোড়া থেকে পড়ে যাননি।

পরবর্তী সময়ে তিনি নিজ গোত্র আহমাসের—যা বাজীলার একটি শাখাগোত্র—দেড় শ ঘোড়সওয়ার নিয়ে ওই মন্দিরটি ধ্বংস করে পুড়িয়ে দিয়ে আসেন। খবরটি শুনে রাসূল ﷺ আহমাসের ওইসকল লোক ও ঘোড়ার জন্য পাঁচবার বারাকাহ ও রহমতের দুআ করেন।[৫২৬]

আসওয়াদ আন্‌সির উত্থান ও পতন

দক্ষিণ আরব তথা ইয়েমেনে এভাবেই ইসলামের প্রসার চলতে থাকে। অল্প কিছুকালের মাঝেই পুরো এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশাসকগণ। এমন সময় নবিজির স্বপ্নে দেখা সেই দ্বিতীয় মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটে 'কাহফ হান্নান' শহর থেকে। অনুগত সাত শ যোদ্ধা নিয়ে আসওয়াদ আন্‌সি নিজেকে দাবি করে নবি ও শাসক হিসেবে।

সান'আ নগরী দখল করে দ্রুতই প্রভাব বিস্তার করতে থাকে আসওয়াদ। মুসলিম প্রশাসকরা কঠিন পরিস্থিতিতে শুধু আশআরিয়্যীন এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন।

প্রায় তিন-চার মাস ধরে চলে এই দুঃসহ অবস্থা। তারপর পারস্যের এক মুসলিম ফাইরূয দাইলামি (রদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের মুসলিম সেনাদের সাথে নিয়ে ছুটে আসেন আসওয়াদ-বাহিনীর বিরুদ্ধে। মিথ্যে নবির শিরশ্ছেদ করে দূর্গের বাইরে ছুড়ে মারেন ফাইরূয (রদিয়াল্লাহু আনহু)। নেতার খণ্ডিত মস্তক দেখে অনুসারীরাও রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। শান্তি পুনরুদ্ধারের সংবাদ জানিয়ে নবিজি ﷺ-কে চিঠি লেখেন প্রশাসকগণ। পুনরায় হাতে নেন নিজ নিজ দায়িত্ব।

নবিজি ﷺ-এর মৃত্যুর ঠিক একদিন আগে আসওয়াদ আন্‌সি কতল হয়। তার ওপর আল্লাহর লা'নত। আগেই অবশ্য ওহির মাধ্যমে তা নবিজিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উম্মাতকে এই ভবিষ্যদ্বাণী জানিয়েও যান তিনি। প্রশাসকদের পাঠানো সেই চিঠি এসে

[৫২৬] বুখারি, ৩০৭৬।

পৌঁছে আবূ বকর সিদ্দীক (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে।[৫২৭]

হাজ্জাতুল ওয়াদা'—বিদায় হাজ্জ (১০ম হিজরি)

দশম হিজরি সনের মাঝেই গোটা আরব উপদ্বীপে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। সেই একই বার্তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম আরও অনেক মানুষের আবির্ভাব হয় পরের বছরগুলোতে। এবার নবিজি ﷺ-এর মিশনের ফলাফল তাঁকে স্বচক্ষে দেখানোর পালা। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আদেশ দেন মক্কায় গিয়ে হাজ্জ সম্পাদনের।

নবি ﷺ হাজ্জ সম্পাদনের ঘোষণা দেন। তা শুনে বিপুলসংখ্যক মানুষ মদীনায় চলে আসে তাঁর সফরসঙ্গী হতে।[৫২৮]

শনিবার, ২৬শে যুল-কা'দা। যুহরের সালাত শেষ করে মদীনা ত্যাগ করেন নবিজি ﷺ।[৫২৯] কয়েক ঘণ্টা সফর শেষে এসে পৌঁছান যুল হুলাইফায়। মুসাফির হিসেবে দু-রাকাআত আসর পড়ে রাতটা এখানেই কাটান।[৫৩০] পরদিন সকালে তিনি বলেন, "গতরাতে আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক দূত এসেছিলেন। বললেন, 'এই বরকতময় উপত্যকায় সালাত আদায় করুন। আর সবাইকে জানিয়ে দিন যে, হাজ্জের মধ্যে উমরাও শামিল।'"[৫৩১]

এ নির্দেশ আসার আগে মানুষের ধারণা ছিল যে, উমরা ও হাজ্জ একসাথে করা যায় না। জাহিলি যুগে এটিকে অনেক মন্দ কাজ বলে গণ্য করা হতো।[৫৩২]

যুহর সালাতের আগে রাসূল ﷺ গোসল করে নেন। মাথায় ও শরীরে সুগন্ধি মাখেন। যাতে মেশক ছিল। চুলে তেল লাগান, চিরুনি করেন এবং একটি লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করেন।[৫৩৩] সালাতের পর হাজ্জে কিরানের ইহরাম বেঁধে দুআ করেন,

---

[৫২৭] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারি, ৮/৯৩; ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ২/৫০১; ইবনুল কাইয়িম, ৩/২৬-৬০।

[৫২৮] মুসলিম, ১২১৮।

[৫২৯] ফাতহুল বারি, ৮/১০৪।

[৫৩০] বুখারি, ১৫৪৬।

[৫৩১] বুখারি, ১৫৩৪।

[৫৩২] বুখারি, ১৫৬৪।

[৫৩৩] বুখারি, ৫৯৩০।

"হে আল্লাহ, উমরা ও হাজ্জের জন্য উপস্থিত হয়েছি।"

এরপর তালবিয়া পাঠ করেন,

لَبَّيْكَ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيْكَ لَكَ

"আমি হাজির! হে আল্লাহ, আমি হাজির! আমি হাজির! আপনার কোনও অংশীদার নেই, আমি হাজির। নিশ্চয়ই সব প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সার্বভৌমত্ব আপনারই। আপনার কোনও অংশীদার নেই।"[৫৩৪]

এরপর সালাতের স্থান থেকে উঠে উটনীর ওপর আরোহণ করেন এবং পুনরায় তালবিয়া পাঠ করেন। উটনী তাঁকে নিয়ে ময়দানে চলতে আরম্ভ করলে তখনো তালবিয়া পাঠ করেন।[৫৩৫] সালাত আদায়ের পরপরই কুরবানির পশুগুলোকে কালাদা বা মালা পরান এবং সেগুলোর কুঁজ চিরে দেন।[৫৩৬]

এক সপ্তাহ পর মক্কায় পৌঁছান নবি ﷺ। তবে মক্কার খুব নিকট যী-তুওয়া'য় রাত যাপন করেন এবং সেখানে ফজরের সালাত আদায় করে গোসল করেন। এরপর মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। দিনটি ছিল রবিবার সকাল, ৪ যুল-হিজ্জাহ।[৫৩৭]

নবি ﷺ কা'বা তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করেন। তারপর মক্কার উঁচু প্রান্ত জাহূনে অবস্থান করেন। আবার যখন ফিরে আসেন তখন তওয়াফ করেননি। কিন্তু ইহরামও খোলেননি। কারণ, তিনি 'কারিন' ছিলেন। অর্থাৎ তিনি হাজ্জ ও উমরার ইহরাম একসাথে বেঁধেছিলেন। এর হেতু ছিল, তিনি হাদি—কুরবানির পশু—সঙ্গে এনেছিলেন। ফলে অন্যান্য যারা হাদি সঙ্গে এনেছে সবাইকে আদেশ দেন, তারা যেন তাদের ইহরাম অক্ষুণ্ন রাখে। আর যারা হাদি সাথে নিয়ে আসেনি তাদের মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম ত্যাগ করতে বলেন এবং এই আমলকে উমরা হিসেবে সাব্যস্ত করেন। চাই হাজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম পরিধান করুক বা উমরার; কিংবা দুটির উদ্দেশ্যেই।[৫৩৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যা পরে জেনেছি তা যদি আমি প্রথমে জানতে পারতাম তাহলে

---

[৫৩৪] বুখারি, ১৫৪৯।

[৫৩৫] বুখারি, ১৫৪৫, ১৫৪৬।

[৫৩৬] বুখারি, ১৬৯৪।

[৫৩৭] বুখারি, ১৫৪৫।

[৫৩৮] বুখারি, ১৫৪৫।

সঙ্গে করে কুরবানির পশু নিয়ে আসতাম না। আমি উমরা করতাম এবং ইহরাম খুলে ফেলতাম।"[৫৩৯]

যুল-হিজ্জাহর আট তারিখ তারবিয়ার দিন নবি ﷺ মিনায় তাশরীফ নিয়ে যান। মাথামুণ্ডন করে ফেলা হাজীরাও আবার ইহরাম পরে নেন।[৫৪০] মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর সালাত আদায় করেন নবিজি ﷺ। চার রাকাআত সালাতকে কসর হিসেবে দুই রাকাআত করে আদায় করেন।[৫৪১] সূর্যোদয়ের পর আরাফাতের উদ্দেশ্যে মিনা ত্যাগ করেন। নামিরাহ উপত্যকায় তাঁর জন্য একটি তাঁবু খাটানো হয়। সেখানেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। সূর্যাস্তের সময় তাঁর 'কাসওয়া' উটনীতে আরোহণ করে উরানাহ উপত্যকায় প্রবেশ করেন তিনি। হাজীরা জড়ো হতে থাকে তাঁকে ঘিরে। একটু পরেই তাঁরা এক ঐতিহাসিক ভাষণ শুনবেন। আল্লাহর হামদ-সানা ও শাহাদাহ পাঠের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"হে লোকসকল, আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে শুনুন। আমার জানা নেই—এ বছরের পর এখানে আর আপনাদের সাথে কখনও দেখা হবে কি না? এই দিন, এই মাস এবং এই শহর যেমন পবিত্র, তেমনি আপনাদের রক্ত, সম্পদ এবং সম্মানও পবিত্র। সকল মুশরিকি ও জাহিলি প্রথা আমার পদতলে পিষ্ট। প্রতিশোধ-নেশায় রক্ত ঝরানোর প্রথাও বিলুপ্ত করা হলো। সবার আগে বাতিল করছি বানূ সা'দের হাতে লালিত এবং বানূ হুযাইলের হাতে নিহত হওয়া রবী'আ ইবনু হারিসের ছেলের প্রতিশোধ। জাহিলি যুগের সুদি প্রথাও আজ থেকে বিলুপ্ত। সবার আগে বাতিল করা হলো আমাদের এবং আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিবের সুদি কারবার। স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর কাছ থেকে আমানত হিসেবে আপনারা তাদের গ্রহণ করেছেন। তাদের সাথে মিলিতও হন আল্লাহর বাণীতে প্রাপ্ত বৈধতার মাধ্যমে। তাদের ওপর আপনাদের অধিকার রয়েছে। তার মাঝে একটি হলো আপনাদের অপছন্দনীয় কাউকে ঘরে না ঢোকানো। তারা এমনটা করে বসলে এর প্রতিবিধান করার অধিকারও আপনাদের রয়েছে, তবে বেশি কঠোরভাবে নয়। আর আপনাদের ওপর তাদের অধিকার হলো যথাযথভাবে তাদের খাদ্য-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা। আমি এমন বিষয় রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরে থাকলে কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবেন না। তা হলো আল্লাহর কিতাব। এখন বলুন, বিচার-দিবসে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে আপনারা কী জবাব দেবেন?"

---

[৫৩৯] বুখারি, ১৫৬৮, ৭২২৯।

[৫৪০] বুখারি, ১৫৫১।

[৫৪১] বুখারি, ১৬৫৩।

সাহাবিরা সমস্বরে বললেন, "আমরা সাক্ষ্য দেবো যে, আপনি বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কল্যাণকামনার ক্ষেত্রে আপনি কোনও ত্রুটি করেননি।"

একবার আকাশের দিকে, আরেকবার জনতার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে নবি ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।"[৫৪২]

এই বক্তব্যে নবিজি ﷺ আরও কিছু বিষয়ে আলোচনা করেন। বক্তব্য শেষে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

> "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং আমি ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[৫৪৩]

আসলে এই দিনটি ছিল নিয়ামাত ও সৌভাগ্যের।

খুতবার পরে বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) আযান দেন অতঃপর ইকামাত দেন। দুই রাকাআত যুহরের সালাত পড়ান নবি ﷺ। এরপর বিলাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) আবার ইকামাত দেওয়ার পর নবি ﷺ আসরেরও দুই রাকাআত সালাত পড়ান। যোহরের ওয়াক্তেই এই দুই সালাত আদায় করেন। সফররত অবস্থায় পথিকরা কীভাবে সালাত আদায় করবে ও কীভাবে মিলিয়ে পড়বে, সে বিধানও স্পষ্ট হয়ে গেল এখান থেকে।

সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার উদ্দেশে রওনা হন রাসূল ﷺ। একত্রে পড়েন ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশার সালাত। মাগরিব তিন রাকাআত আর ইশা দুই রাকাআত আদায় করেন। এভাবে সংক্ষেপে আদায় করা কোনও সালাতেই সুন্নাত পড়েননি তিনি। রাতের বিশ্রাম শেষে ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর মাশআরে হারামে গিয়ে কিবলার দিকে মুখ করে দিগন্তে আলোর রেখা দৃশ্যমান হওয়া পর্যন্ত তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়তে থাকেন।

---

[৫৪২] মুসলিম, ১২১৮; ইবনু হিশাম, ২/৬০৩।

[৫৪৩] সূরা মাইদা, ৫ : ৩।

সূর্যোদয়ের আগে আবারও মিনা অভিমুখে রওনা হন। অতঃপর বড় জামরায় এসে আল্লাহু আকবার বলতে বলতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত নবি ﷺ তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন। কঙ্কর নিক্ষেপের শুরুতেই তালবিয়া পাঠ থামিয়ে দেন। সাহাবিদের বলেন, "হাজ্জের নিয়মগুলো আমার থেকে শিখে নাও। এই বছরের পর হয়তো আর হাজ্জ করতে পারব না।"[৫৪৪]

কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে মিনায় গিয়ে এক শ উটের মধ্যে তেষট্টিটি উট নিজ হাতে জবাই করেন রাসূল ﷺ। বাকি সাঁইত্রিশটি জবাই করেন আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু)। নবিজির নির্দেশমতো প্রতিটি উটের একাংশ রান্না করা হয়। যা থেকে রাসূল ﷺ ও সাহাবিগণ আহার করেন ও এর ঝোল পান করেন।

কুরবানির পর নবি ﷺ মাথার চুল কামান। ডান দিক আগে মুণ্ডন করেন। এরপর একটা দুইটা করে চুল সাহাবিদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া হয়। বাম দিকের চুলের অংশ পান আবূ তালহা (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

এবার ইহরাম খুলে সাধারণ কাপড় পরে নেন নবিজি ﷺ। সেই সাথে সুগন্ধীও মাখেন। তারপর উটে চড়ে সাতবার কা'বা তওয়াফ করেন। এই তওয়াফ করা ফরজ। তবে তিনি সাফা-মারওয়ায় এবার তওয়াফ করেননি। যুহরের সালাত আদায় করার পর যান বানূ আবদিল মুত্তালিবের কাছে। যামযামের পানি বিতরণ করছিলেন তারা। নবি ﷺ বলেন, "বানূ আবদিল মুত্তালিব! পানি তুলতে থাকো। যদি এই ভয় না থাকত যে, লোকজন তোমাদের পানি পান করানোর এই দায়িত্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, তাহলে আমিও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম।" এরপর তারা নবি ﷺ-কে যামযামের পানি পান করতে দেয় এবং নবি ﷺ তা পান করেন।[৫৪৫]

নবি ﷺ মিনায় ফিরে তাশরীকের দিনগুলো (১১, ১২ ও ১৩ যুল-হিজ্জাহ) সেখানে অবস্থান করেন। প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর তিনটি জামরাতেই কঙ্কর ছোড়েন তিনি। প্রথমে ছোটটিতে, তারপর মাঝারিতে, তারপর বড়টিতে।

দশ ও বারো তারিখে তিনি আরও দুটি খুতবা বা বক্তব্য দেন। আরাফাতের ময়দানে বর্ণিত বিষয়গুলোতেই আবারও জোর দেন এবং আরও অনেক বিষয়ে নসীহত প্রদান করেন। শেষ ভাষণের আগে তাশরীকের মাঝের দিনে সূরা নাসর নাযিল হয়।

মঙ্গলবার ১৩ যুল-হিজ্জাহ জামরাত্রয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে মিনা ত্যাগ করেন নবি ﷺ।

[৫৪৪] নাসাঈ, আস-সুনান, ৩০৬৪।

[৫৪৫] মুসলিম, ৮৯-৯৭।

আবতাহে আদায় করেন যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। আয়িশা ও তার ভাই আবদুর রহমান ইবনু আবী বকর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে পাঠিয়ে দেন উমরা আদায় করতে। আয়িশা ফিরে আসার পর নবি ﷺ কা'বায় বিদায় তওয়াফ করেন। তারপর ফজরের সালাত আদায় শেষে শুরু করেন মদীনায় ফিরতি যাত্রা।

মদীনার চিহ্নগুলো দৃষ্টিসীমায় আসামাত্র নবি ﷺ তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলে ওঠেন। তারপর বলেন,

"আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। তিনি অদ্বিতীয়, অংশীবিহীন। রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি অনুতপ্ত, উপাসনারত, প্রশংসারত ও সাজদাবনত হয়ে ফিরছি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য বলে প্রমাণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।"

উসামা ইবনু যাইদ ﷺ-এর নেতৃত্বে ফিলিস্তিন অভিযান

মদীনায় ফিরে আসেন নবি ﷺ। বুঝতে পারেন যে, তিনি তাঁর জীবনাভিযানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছেন। তেইশ বছরের নুবুওয়াতি জীবনে আল্লাহ তাঁকে সাফল্যের পর সাফল্য দিয়েছেন। মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে, আসতে থাকে প্রতিনিধির ঢলও। তাই বেশির ভাগ সময় নবিজি ﷺ কাটাতে থাকেন আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা পাঠ করে।

রবীউল আউয়াল মাস, একাদশ হিজরি সন। নবি ﷺ সাত শ সেনাসহ উসামা ইবনু যাইদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাঠান ফিলিস্তিনের 'বালকা' ও 'দারূম' অঞ্চলে। রোমানদের উৎপাত আবারও বাড়ছে। তাদের শক্তির মহড়া দেখানো এই বাহিনীর উদ্দেশ্য। মদীনা থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে 'জারফ'-এ থাকতেই তারা নবিজি ﷺ-এর অসুস্থতার খবর পান। সেখানেই শিবির স্থাপন করে নবিজির স্বাস্থ্যের খবরাখবরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন তারা। আল্লাহ তাআলার ফায়সালা ছিল রাসূল ﷺ ইন্তিকাল করেন। নবিজির মৃত্যুর পর পুনরারম্ভ করেন সামরিক যাত্রা। আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাতকালে সামরিক অভিযান চালানো প্রথম বাহিনী হওয়ার গৌরব অর্জন করে উসামা-বাহিনী।[৫৪৬]

---

[৫৪৬] বুখারি, ৪৪৬৮, ৪৪৬৯; ইবনু হিশাম, ২৫০, ৬০৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুউচ্চ বন্ধুর পানে নবি ﷺ-এর যাত্রা

অত্যাসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ

সেই যে এক ইয়াহুদি নারী বিষ প্রয়োগ করেছিল নবি ﷺ-এর খাবারে, সে ঘটনার স্মৃতি মানুষ প্রায় ভুলতেই বসেছে। এমনই সময় বিষক্রিয়া আবারও দৃশ্যমান হতে থাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীরে। অবনতি হতে থাকে স্বাস্থ্যের। দশম হিজরি সন থেকেই তিনি কথা ও কাজের মাধ্যমে নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা জানান দিতেন।

প্রতিবছর রমাদানের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফ করতেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। এ মাসে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে একবার পুরো কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন এবং তিনিও নবি ﷺ-এর তিলাওয়াত শুনতেন। দশম হিজরি সনে ই'তিকাফ করেন বিশ দিন। বলেন যে, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) সে বছর তাঁকে দু-বার কুরআনের দাওর করিয়েছেন।

ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে ডেকে নবি ﷺ জানান, 'আমি বুঝতে পারছি—আমার সময় অতি নিকটবর্তী।"[৫৪৭]

মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় ওসিয়ত করা শেষে বলেন, "মুআয, তুমি এই বছরের পর আর হয়তো আমার দেখা পাবে না। হয়তো তুমি আমার এই মাসজিদ আর আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে।" এ কথা শুনে মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু) বিচ্ছেদ-বেদনায় হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন।[৫৪৮]

নবি ﷺ বিদায় হাজ্জের সময়ও একাধিকবার বলেছিলেন,

"এই বছরের পর হয়তো তোমাদের সাথে আমার আর কখনও দেখা হবে না। হয়তো এই বছরের পর আর কখনও আমি হাজ্জ করতে আসব না।" সে সময় নাযিল হওয়া সূরা নাসর ও সূরা মাইদার সে আয়াতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর ইঙ্গিত রয়েছে।

সেই হাজ্জকে বিদায় হাজ্জ (হাজ্জাতুল ওয়াদা') নামকরণের কারণও এটাই। উম্মাতকে তিনি সে বছরই বিদায় জানিয়েছেন।

একাদশ হিজরির সফর মাসে উহুদ পাহাড়ে গিয়ে সেখানে সমাধিস্থ শহীদদের জন্যও এমনভাবে দুআ করেন, যেন তাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। ফিরে এসে মিম্বরে

---

[৫৪৭] বুখারি, ৪৯৯৮।

[৫৪৮] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫/২৩৫।

উঠে বলেন,

"আমি তোমাদের আগে যাব এবং তোমাদের জন্য সাক্ষ্যও দেবো। আল্লাহর শপথ! এখন আমি হাউযে কাউসারকে চোখের সামনে দেখছি পাচ্ছি। আর আমার হাতে জমীনের সমস্ত সম্পদ-ভান্ডারের চাবি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি এই ভয় করি না যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে; বরং আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমরা দুনিয়া অর্জনে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে যাবে।"[৫৪৯]

সফর মাসের শেষ দিকে এক গভীর রাতে মদীনার 'বাকীউল গারকাদ' কবরস্থানে চলে যান রাসূল ﷺ। দুআ করেন সেখানে শায়িত মৃতদের জন্য। বলেন, "ইনশা আল্লাহ। শীঘ্রই আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।"[৫৫০]

অসুস্থতার শুরু

সফর মাসের শেষ সোমবার। নবি ﷺ বাকী' গোরস্থানে একজনের জানাযার সালাত পড়েন। ফিরে আসার পর আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বলেন যে, মাথাব্যথা করছে। নবি ﷺ বলেন, "বরং মাথাব্যথা আমার। উফ, আয়িশা! হায় আমার মাথা!"[৫৫১]

এটা ছিল রাসূল ﷺ-এর অসুস্থতার সূচনা। স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতির কালেও প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে পালাক্রমে থাকতেন নবি ﷺ। একদিন মাইমূনা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে থাকা অবস্থায় জিজ্ঞাসা করতে থাকেন, "আগামীকাল কার ঘরে থাকব? আগামীকাল কার ঘরে থাকব?" সকল স্ত্রীই বুঝতে পারেন যে, শেষ দিনগুলো তিনি আয়িশার সাথে কাটাতে চাচ্ছেন। রদিয়াল্লাহু আনহুন্না। অনুমতিও দিয়ে দেন সবাই। ফাদল ইবনু আব্বাস ও আলি ইবনু আবী তালিব (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাঁধে ভর দিয়ে নবি ﷺ আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে যান।[৫৫২]

---

[৫৪৯] বুখারি, ১৩৪৪।

[৫৫০] বুখারি, ৯৭৪।

[৫৫১] বুখারি, ৫৬৬৬।

[৫৫২] বুখারি, ৪৪৪২।

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, নবিজি ﷺ-এর জ্বর বাড়তেই থাকে। একদিন তিনি বলেন, "আমার শরীরে সাত মশক পানি ঢেলে দাও, যেগুলোর বাঁধন খোলা হয়নি। যাতে লোকদের ওসিয়ত করতে পারি।" আমরা হাফসা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর একটি চৌবাচ্চায় বসিয়ে রাসুল ﷺ-এর শরীরে সেই মশকগুলো থেকে পানি ঢালছিলাম। একসময় তিনি ইশারায় আমাদের থামতে বললেন। তারপর বেরিয়ে গিয়ে সালাতের ইমামতি করেন। সালাত শেষে সবাইকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলেন।[৫৫৩]

সেই বক্তব্যে বলেছিলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবি ও নেককারদের কবরসমূহকে ইবাদাতখানা বানিয়ে নিয়েছিল। খুব ভালো করে শুনে রাখো! তোমরা কবরসমূহকে ইবাদাতখানা বানাবে না। আমি তোমাদের এ থেকে নিষেধ করছি।"[৫৫৪]

আরও বলেছেন, "ইয়াহূদি ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লা'নত! তারা তাদের নবিদের কবরসমূহকে ইবাদতখানায় পরিণত করেছে।"[৫৫৫]

আরও বলেছেন, "আমার কবরকে তোমরা মূর্তি বানিয়ো না, যার ইবাদাত করা হয়।"[৫৫৬]

নবিজি ﷺ-এর কাছে পাওনা আছে, এমন সবাইকে এসে অধিকার দাবি করতে বলেন তিনি। প্রতিপালকের সাথে দেখা করার আগেই তিনি ঋণমুক্ত হতে চান। তারপর সাহাবিদের বলেন,

"আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুটি জিনিসের যেকোনও একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন—একটি হলো, ইচ্ছামতো এই দুনিয়ার সম্পদ, আরেকটি হলো, আল্লাহর কাছে থাকা সম্পদ। বান্দাটি আল্লাহর কাছে থাকা সম্পদকেই বেছে নিয়েছে।"

আবূ সাঈদ খুদরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন,

"এ কথা শুনে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং বলেন, 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক!" আমরা তাঁর এমন আচরণে অবাক

---

[৫৫৩] বুখারি, ১৯৮।

[৫৫৪] মুসলিম, ৫৩২।

[৫৫৫] বুখারি, ৪৩৫, ৪৩৬।

[৫৫৬] মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ৮৫।

হয়ে গেলাম। একে অপরকে বলাবলি করলাম, 'কী ব্যাপার? সে ব্যক্তি তো ভালো বস্তু-ই বেছে নিয়েছে। আবূ বকর কাঁদে কেন?' কয়দিন পর গিয়ে বুঝলাম যে, নবি ﷺ বান্দা বলতে নিজেকেই বোঝাচ্ছিলেন। (অর্থাৎ তাঁর আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছিলেন।) ফলে আমাদের চেয়ে আবূ বকরের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বও উপলব্ধি হলো সবার।"

এ ঘটনার পর আবূ বকরের সাথে নবিজি ﷺ-এর সখ্য আরও বেড়ে যায়। তিনি তাঁর প্রশংসা করেন এবং মাসজিদের বাকি সব দরজা এখন থেকে বন্ধ করে দিতে বলেন। খোলা রাখতে বলেন শুধু আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘরের সাথে সংযুক্ত দরজাটি। এটি ছিল বুধবারের ঘটনা।

পরদিন বৃহস্পতিবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা আরও বেড়ে যায়। অনেক কষ্টে বলেন,[৫৫৭] "এসো। আমি তোমাদের একটা জিনিস লিখে দিয়ে যাই, যাতে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট না হও।"

উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিপরীতে উপস্থিত সকলকে বলেন, "নবি ﷺ এখন খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। কুরআন তো আমাদের কাছে আছেই। এটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।" নবি ﷺ-এর পাশে থাকতেই সাহাবিদের মাঝে এ নিয়ে গোলযোগ শুরু হয়ে যায়। নবি ﷺ আদেশ দিলেন, "আমার নিকট থেকে সবাই উঠে যাও।"

সেদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ দেন, যাতে সকল ইয়াহূদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেওয়া হয়। আরও বলেন যেন মদীনায় আগত সব প্রতিনিধিদলের সাথে ঠিক সেভাবেই উত্তম আচরণ করা হয়, যেভাবে নবি ﷺ তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। সালাত এবং দাসদের প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব নিয়েও কথা বলেন তিনি।[৫৫৮]

তিনি আরও বলেন, "তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এগুলো আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না—আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবির সুন্নাহ।"[৫৫৯]

---

[৫৫৭] বুখারি, ৪৬৬।

[৫৫৮] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ১/৯৩।

[৫৫৯] বুখারি, ৩০৫৩।

সালাতে আবূ বকরের ইমামতি

অসুস্থতা সত্ত্বেও এতদিন নবি ﷺ সালাতে ইমামতি করে এসেছেন। কিন্তু ওই বৃহস্পতিবারে ইশার ওয়াক্তে ব্যতিক্রম ঘটে। ব্যথা কমাতে নবি ﷺ চৌবাচ্চায় গোসল করে নেন। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। জ্ঞান ফিরে আসার পর গোসল করেন আবারও। এ-রকম তিনবার ঘটে। শেষে তিনি আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে খবর পাঠান ইমামতি করার জন্য। এই ওয়াক্তের পর থেকে অবশিষ্ট দিনগুলোতে তিনিই ইমামতি করেন।[৫৬০]

নবিজি ﷺ-এর জীবদ্দশায় এভাবে মোট সতেরো ওয়াক্ত সালাতের ইমামতি করেন আবূ বকর।

শনিবারে কিংবা রবিবারে একটু ভালো বোধ করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। যুহরের সালাতের জন্য দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে আসেন মাসজিদে। সে সময় আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ইমামতি করছিলেন। নবি ﷺ গিয়ে তার বামদিকে বসে পড়েন। আবূ বকর নবিজির অনুসরণ করছিলেন আর অন্যান্যরা আবূ বকরের অনুসরণ করছিলেন। তিনিই জোরে জোরে তাকবীর বলে সবাইকে অবগত করছিলেন।[৫৬১]

নবিজির যা ছিল সব সদাকা

রবিবারে নবি ﷺ তাঁর দাসদের মুক্ত করে দেন। সম্পদ বলতে বাকি ছিল মাত্র সাতটি দীনার। সদাকা করে দেন সেগুলোও। অস্ত্রশস্ত্রগুলো মুসলিম সেনাবাহিনীকে দিয়ে দেন। রাত হলে আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এক প্রতিবেশিনীর ঘরে তাঁর প্রদীপটি পাঠান। একটুখানি ঘি ঢেলে দিতে বলেন তাতে। যাতে প্রদীপটি জ্বালাতে পারেন।[৫৬২]

আর নবিজি ﷺ-এর বর্মটি এক ইয়াহূদির কাছে বন্ধক ছিল ত্রিশ সা' (প্রায় ৬৬ কেজি) যবের বিনিময়ে।[৫৬৩]

---

[৫৬০] বুখারি, ৬৮৭।

[৫৬১] বুখারি, ৬৮৭।

[৫৬২] ইবনু সা'দ, তবাকাত, ২/২৩৭-২৩৯।

[৫৬৩] বুখারি, ২০৯৬।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষ দিন

সোমবার। আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) ফজরের সালাতের ইমামতি করছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরের পর্দা তুলে সেদিকে তাকান। দেখতে পান সালাতরত সাহাবিদের। মুচকি হাসি ফুটে ওঠে মুখে। নবিজি এসে ইমামতি করবেন ভেবে আবূ বকর একটু পিছিয়ে আসেন।

সেদিন নবিজি ﷺ-এর চেহারায় যে খুশির ছটা দেখা যায়, তা দেখে সাহাবিরাও এত খুশি হয়েছিলেন যে, প্রায় সালাত ছেড়ে দিয়েই তাঁর নিকট চলে আসবেন। কিন্তু নবি ﷺ হাতের ইশারায় তাদের আগে সালাত সম্পন্ন করে নিতে বলেন। এরপর তিনি ঘরের ভেতর চলে যান এবং পর্দা নামিয়ে দেন।[৫৬৪]

সেদিনই কিংবা সে সপ্তাহতেই নবি ﷺ ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে ডাকিয়ে আনেন। কানে কানে কিছু একটা বলেন তাকে। ফলে কান্নায় ভেঙে পড়েন ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা)। একটু পর মেয়ের কানে নবি ﷺ আরও কিছু একটা বলেন। এতে ফাতিমা এবার হেসে ওঠেন।

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) সেদিন ফাতিমাকে ডেকে জানতে চেয়েছিলেন নবিজি কী বললেন। কিন্তু ফাতিমা বলেন যে, রাসূল ﷺ সেটা গোপন রাখতে বলেছেন। নবিজি মারা যাওয়ার পর ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) প্রকাশ করেন কথাটি। প্রথমবার বলেছিলেন যে, এই রোগেই তাঁর মৃত্যু হবে। তা শুনে ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) কান্না করেন। পরেরবার বলেন যে, পরিবার-পরিজনদের মাঝে ফাতিমাই প্রথমে নবিজি ﷺ-এর সাথে মিলিত হবে। ফলে তিনি হেসেছিলেন এই কথাটি শুনে। জান্নাতের নারীদের নেত্রী (সাইয়িদা) হবেন ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এটিও বলে গেছেন রাসূল ﷺ।[৫৬৫]

মৃত্যুশয্যায় নবিজির ব্যথা দেখে ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা) কেঁদে বললেন, "আহ! বাবার কী কষ্ট!" নবি ﷺ উত্তর দেন, "এই দিনের পর তোমার বাবার আর কোনও কষ্ট হবে না!"[৫৬৬]

তারপর নবি ﷺ ফাতিমার দুই ছেলে হাসান ও হুসাইন (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)কে ডাকিয়ে আনেন। কাছে নিয়ে চুমু দেন তাদের এবং পাশে থাকা স্ত্রীদেরও কিছু নসীহত ও উপদেশ দেন।

---

[৫৬৪] বুখারি, ৬৮০।

[৫৬৫] বুখারি, ৩৬২৩-৩৬২৬।

[৫৬৬] বুখারি, ৪৪৬২।

ব্যথা আস্তে আস্তে বাড়ছে। খাইবারে তাঁকে যে বিষ খাওয়ানো হয়েছে তার বিষক্রিয়া প্রকটভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।[৫৬৭] নবি ﷺ যন্ত্রণায় একটি চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখেন। শুধু শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজনে তা সরান। এই অবস্থাতেও তিনি বলেন, "ইয়াহূদি-খ্রিষ্টানদের ওপর আল্লাহর লা'নত! তারা তাদের নবিদের কবরসমূহকে ইবাদাতখানা বানিয়েছে।" আরও বলেন, "আরবভূমিতে দুইটি দ্বীন বাকি রাখা হবে না।"[৫৬৮] সবশেষে বারকয়েক বলেন, "সালাত! সালাত! এবং তোমাদের দাস ও অধীনস্থরা।"[৫৬৯]

মহানবির মহাপ্রয়াণ

নবিজি ﷺ-এর শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে। বুক ও গলার মাঝে তাঁকে ধরে রেখেছিলেন আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)। ঠিক এমন সময় একটি মিসওয়াক হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকেন আয়িশার ভাই আবদুর রহমান ইবনু আবী বকর (রদিয়াল্লাহু আনহুম)। নবিজিকে মিসওয়াকটির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আয়িশা জিজ্ঞেস করলেন এটি তাঁর লাগবে কি না। নবি ﷺ মাথা নাড়েন। আয়িশা সেটি তার ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে একটু চিবিয়ে নরম করে নবিজির কাছে দেন। রাসূল ﷺ তা নিয়ে খুব ভালো করে মিসওয়াক করেন।

নবি ﷺ-এর কাছে রাখা এক পাত্রে পানি রাখা ছিল। সেখানে তিনি হাত ডুবিয়ে বারবার মুখ মুছতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! নিশ্চয় মৃত্যুর সময় অনেক যন্ত্রণা আছে।"[৫৭০]

তারপর দু-হাত অথবা তর্জনী উঁচিয়ে ছাদের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি নিচু স্বরে কিছু একটা বলেন। আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) খুব কাছে থাকায় কান লাগিয়ে শুনতে পান সেটি। রাসূল ﷺ বলছেন,

"আল্লাহ যাদের নিয়ামাত দিয়েছেন, সে সকল নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালিহগণের সঙ্গ। হে আল্লাহ, ক্ষমা করে দিন, রহম করুন আমাকে। হে আল্লাহ, সুউচ্চ বন্ধুর কাছে।" শেষের এই কথাগুলো তিনবার বলেছেন তিনি। আর তা বলার পরপরই

[৫৬৭] বুখারি, ৪৪৬৮।

[৫৬৮] বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা, ৬/১৩৬।

[৫৬৯] ইবনু মাজাহ, ১৬২৫, আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬/২৯০।

[৫৭০] বুখারি, ৪৪৪৯।

নবি ﷺ তাঁর সুউচ্চ বন্ধুর সাথে গিয়ে মিলিত হন।[৫৭১] ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন।

সেদিনটি ছিল সোমবার, ১২ই রবীউল আউয়াল, ১১ হিজরি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

সাহাবিদের হতবিহ্বলতা

নবিজি ﷺ-এর মৃত্যুর খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কলিজা ফাটা এই সংবাদ শোনামাত্র সাহাবিদের পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে। পাগল হওয়ার দশা সকলের। সেদিন তাদের অবস্থা এমন দাঁড়িয়ে ছিল যে, মনে হয় তারা নিজেদের অনুভূতি-শক্তি হারিয়ে ফেলবেন। মদীনায় নবিজি ﷺ-এর আগমনের দিনটি ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল। আর সবচেয়ে অন্ধকারতম দিনটি ছিল একাদশ হিজরির ১২ রবীউল আউয়াল—নবিজি ﷺ-এর মৃত্যুর দিন।[৫৭২]

ওদিকে মাসজিদে নববিতে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) সবাইকে বলছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের পুরোপুরি ধ্বংস করার আগে নবি ﷺ এ দুনিয়া ত্যাগ করতে পারেন না। নবিজি মারা গেছেন—এ কথা যে-ই বলবে, তাকেই হত্যা করার হুমকি দেন তিনি। আর সে সময় অন্যান্য সাহাবিরা উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর চারপাশে অনুভূতিহীন, দুঃখের নীরব ছবি হয়ে বসে থাকে।[৫৭৩]

আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রত্যয়ী অবস্থান

সেই সোমবার সকালে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবিজি ﷺ-এর স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি দেখে যান। তিনি সেরে উঠবেন, এই আশা মনে নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন আবূ বকর। কিন্তু ঘরে গিয়েই শুনতে পান দুঃসংবাদটি। সাথে সাথে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসেন মাসজিদে নববিতে। কাউকে কিছু না বলে সোজা চলে যান রাসূল ﷺ-এর ঘরে। শুয়ে আছেন নবিজি, গায়ে জড়ানো একটি ইয়েমেনি কাপড়। মুখ থেকে কাপড়টি সরিয়ে

[৫৭১] বুখারি, ৪৪৩৫।

[৫৭২] তিরমিযি, ৩৬১৮।

[৫৭৩] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ২/৬৫৫।

নবিজি ﷺ-কে চুমু দেন আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এবং বলেন, "আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আল্লাহ আপনার ভাগ্যে যে মৃত্যু রেখেছিলেন, তারই স্বাদ পেয়েছেন আপনি। এর পর আর কোনও মৃত্যু নেই।"

বিহ্বল মানুষগুলোর সংবিৎ ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বের হয়ে আসেন মাসজিদে। উমর তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে মৃত্যুসংবাদ অস্বীকার করে চলেছেন। আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "উমর বসো।" আবূ বকরের অনুরোধ সত্ত্বেও বসলেন না তিনি। আবূ বকর মিম্বরের নিকট গিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করলেন। সামনে থাকা দুঃখে কাতর বিমর্ষ মুখগুলোকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

"শোনো সবাই! তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদের ইবাদাত করে, তাদের জেনে রাখা উচিত—মুহাম্মাদ মারা গিয়েছেন। আর যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করে, তাদের জেনে রাখা উচিত—আল্লাহ চিরঞ্জীব, অমরণশীল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ
>
> 'মুহাম্মাদ তো কেবল একজন রাসূল। তাঁর আগেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন। তিনিও যদি মারা যান বা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা কুফরে ফিরে যাবে? বস্তুত যারা ঈমান ত্যাগ করে, তারা আল্লাহর কোনও ক্ষতি করতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করেন।'"[৫৭৪]

আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেদিন বলার আগে এ আয়াতটি নিয়ে এভাবে কেউ ভাবেনি। নবি ﷺ সত্যি একদিন মারা যাবেন, এই চিন্তাও আসেনি কারও মাথায়। আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আল্লাহর কসম! এই রকম মনে হচ্ছিল যে, লোকজন পূর্বে কখনও এই আয়াত সম্পর্কে জানতই না, যে আল্লাহ তা নাযিল করেছেন। যখন আবূ বকর এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন তখন সমস্ত মানুষ তাঁর থেকে আয়াতটি গ্রহণ করল এবং শান্ত হলো। এরপর আমি যাকেই শুনি দেখি যে, সে এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করছে।"

সেদিন সবচেয়ে অস্থির ছিলেন উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। পরে তিনি নিজের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দেন এভাবে,

---

[৫৭৪] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৪৪।

"আল্লাহর কসম! যখনই আমি আবূ বকরকে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে শুনি বুঝতে পারি, সংবাদটি সত্য। তারপর আমি এমনভাবে ভেঙে পড়লাম যে, আমার পা আর আমাকে বহন করতে পারছে না। ফলে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম আর উপলব্ধি করলাম যে, আসলেই আল্লাহর রাসূল ﷺ মারা গিয়েছেন।"[৫৭৫]

খলীফাতুল মুসলিমীন নির্বাচন

নবি ﷺ-এর মৃত্যুর পরপরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল একজন খলীফা নির্বাচন করা। যিনি জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রীয় কাজে নবি ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন। আলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) মনে করেন যে, তিনিই এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। নবিজি ﷺ-এর মিশনের শুরু থেকেই তিনি তাঁর খুব কাছের মানুষ এবং নিকটাত্মীয়। তাই আলি ও যুবাইর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-সহ বানূ হাশিমের আরও অনেকে গিয়ে ফাতিমার বাড়িতে জড়ো হয়। আনসাররা সমবেত হন আরেক জায়গায়। তারা চাইছিলেন, পরবর্তী নেতা তাদের মাঝ থেকেই আসুক। বাকি মুহাজিররা আবূ বকর ও উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সাথে সাথেই রয়েছে। আবূ বকর ও উমর দু'জনে আনসারদের নিকট উপস্থিত হলেন। আবূ উবাইদাসহ অন্যান্য মুহাজিরও উপস্থিত হন সেখানে। আনসাররা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও উপযুক্ততা তুলে ধরেন। এভাবে অনেক আলাপ-আলোচনা ও কথা কাটাকাটির পর আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, "আপনারা যে সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন, সত্যিকারার্থেই আপনারা তার উপযুক্ত। কিন্তু আরবরা প্রশাসনিক ব্যাপারে কুরাইশদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে জানে। কুরাইশের বাইরের কোনও শাসককে তারা মেনে নেবে না। বংশ-পরিবারের দিক দিয়েও কুরাইশরা অন্যদের চেয়ে সেরা।"

তারপর উমর এবং আবু উবাইদার হাত ধরে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমি আপনাদের জন্য এই দু'জনের মধ্যে যেকোনও একজনকে খলীফা হিসেবে পছন্দ করছি।"

একজন আনসার বলেন, "আমাদের মধ্য থেকে একজন, আর আপনাদের মধ্য থেকে একজন আমির হলে কেমন হয়?" আবারও শুরু হতে থাকে শোরগোল। উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) হঠাৎ করে আবূ বকরকে হাত বাড়িয়ে দিতে বলেন। আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু) হাত বাড়িয়ে দেন। অতঃপর উমর, মুহাজির এবং আনসার

[৫৭৫] বুখারি, ৪৪৫৪।

সবাই একে একে তাঁর হাতে হাত রেখে বাইআত গ্রহণ করেন। অবশেষে আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-ই নবিজির খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন।

দাফন-কাফন

মঙ্গলবার রাসূল ﷺ-এর পবিত্র দেহ কাপড় পরিহিত অবস্থাতেই ধুয়ে দেন আব্বাস, আলি, আব্বাসের দুই ছেলে ফাদল ও কুসাম, নবিজি ﷺ-এর মুক্ত করা দাস শুকরান, উসামা ইবনু যাইদ এবং আওস ইবনু খাওলা (রদিয়াল্লাহু আনহুম)। আব্বাস ও তার ছেলেরা নবিজির দেহ এপাশ-ওপাশ করান। উসামা ও শুকরান পানি ঢালেন। আলি হাত দিয়ে শরীর ধৌত করেন। আর আওস তুলে ধরে রাখতে সাহায্য করেন নবিজির দেহ।[৫৭৬]

পানি ও বরইপাতা দিয়ে তিনবার ধোয়া হয় নবিজির শরীর। কুবায় সা'দ ইবনু খাইসামার একটি কুয়া ছিল 'গারস' নামে। সেখান থেকেই আনা হয় পানি। জীবদ্দশায় নবি ﷺ এখান থেকে পানি পান করতেন।[৫৭৭]

গোসলের পর তিনটি ইয়েমেনি সুতি কাপড় দিয়ে তাঁর পবিত্র দেহে কাফন পরানো হয়। তাতে জামা এবং পাগড়ি ছিল না। চাদরে তাঁর শরীর মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।[৫৭৮]

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে ঠিক যে জায়গায় নবি ﷺ ইন্তিকাল করেন, সেখানেই কবর খোঁড়েন আবূ তালহা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। কবরটি ছিল লাহদ, যার পাশে কুলুঙ্গির মতো থাকে। নবিজি ﷺ-কে খাটিয়ায় শোয়ানো হয়। সাহাবিরা দশজন দশজন করে এসে ইমাম ছাড়া একাকী সালাতে জানাযা আদায় করেন। প্রথমে নবিজির পরিবারের সদস্যরা, তারপর মুহাজিরগণ, তারপর আনসারগণ, তারপর নারী ও শিশুরা।[৫৭৯]

মঙ্গলবার সারাদিন এবং বুধবারের রাতের বেশির ভাগ সময় জুড়ে চলতে থাকে জানাযার সালাত আদায়। বুধবার গভীর রাতে সমাধিস্থ হন আল্লাহর রাসূল ﷺ।[৫৮০]

---

[৫৭৬] ইবনু মাজাহ, ১৬২৮।

[৫৭৭] ইবনু সা'দ, তবাকাতুল কুবরা, ২/২৭৭-২৮৮।

[৫৭৮] বুখারি, ১২৬৪; মুসলিম, ৯৪১।

[৫৭৯] মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ১/২৩১; ইবনু সা'দ, ২/২৮৮-২৯২।

[৫৮০] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬/৬২, ২৭৪।

সপ্তম অধ্যায়

নবিজির পরিবার, গুণ ও আখলাকের বিবরণ
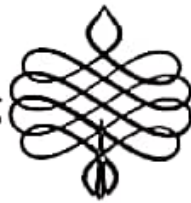
নবি ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ

নবি ﷺ-এর স্ত্রীদের বলা হয় উম্মাহাতুল মুমিনীন বা বিশ্বাসীদের মা। নবি ﷺ-এর এগারো কি বারো জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন নয় জন। আর বাকি দুই জন বা তিন জন নবিজির জীবদ্দশাতেই ইন্তিকাল করেন। প্রত্যেকের ব্যাপারে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

১) খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ

নবি ﷺ পঁচিশ বছর বয়সে খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ইবরাহীম ছাড়া নবিজির বাকি সব সন্তান তার গর্ভেই আসে। তিনি জীবিত থাকাবস্থায় রাসূল ﷺ আর কোনও বিবাহ করেননি। নুবুওয়াতের ১০ম বছরের রমাদান মাসে ৬৫ বছর বয়সে মারা যান খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)। হাজূনে তাকে কবরস্থ করা হয়।

২) সাওদা বিনতু যামআ

এর আগে তিনি নিজের জ্ঞাতিভাই সাকরান ইবনু আমরের স্ত্রী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করে এই দম্পতিটি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। মক্কায় ফেরার পর মারা যান সাকরান (রদিয়াল্লাহু আনহু)। খাদীজার মৃত্যুর এক মাস পর ১০ম হিজরির শাওয়াল মাসে সাওদা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিয়ে হয়। তিনি ৫৪ হিজরির শাওয়াল মাসে মদীনায় ইন্তিকাল করেন।

৩) আয়িশা সিদ্দীকা বিনতু আবী বকর সিদ্দিক

সাওদার সাথে বিয়ের এক বছর পর ১১ হিজরির শাওয়াল মাসেই আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিয়ে করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। নবিপত্নীদের মাঝে একমাত্র তিনিই ছিলেন কুমারী। নবিজির সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী হিসেবেও তাকে গণ্য করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে তিনি ছিলেন নারীকুল শ্রেষ্ঠ আলেমা। ৫৭ হিজরি সনের ১৭ রমাদান মৃত্যুবরণের পর তিনি শায়িত হন 'বাকীউল গারকদ' কবরস্থানে।

৪) হাফসা বিনতু উমর ইবনিল খাত্তাব

হাফসা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর আগের স্বামী খুনাইস ইবনু হুযাফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বদরের যুদ্ধে প্রাপ্ত একটি আঘাতের ফলে শাহাদাতবরণ করেন। ৩য় হিজরির শা'বান মাসে তার ইদ্দত শেষ হলে নবি ﷺ তাকে বিয়ে করেন। ৪৫ হিজরি সনের শা'বান মাসে তিনি ষাট বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনিও সমাধিস্থ হয়েছেন মদীনার বাকীউল গারকদে।

৫) যাইনাব বিনতু খুযাইমা হিলালিয়্যা

বদরের আরেক শহীদ উবাইদা ইবনুল হারিস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিধবা স্ত্রী যাইনাব (রদিয়াল্লাহু আনহা)। অন্যান্য সূত্রে অবশ্য উহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়া আবদুল্লাহ ইবনু জাহশ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী বলা হয়েছে তাকে। ৪র্থ হিজরিতে তার বিয়ে হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে। জাহিলি যুগ থেকেই দানশীলতার কারণে তিনি 'উম্মুল মাসাকীন' (অভাবীদের মা) নামে খ্যাত। আট মাসের দাম্পত্য-জীবনের পর রবিউস সানি মাসে তার মৃত্যু হয়। বাকী'তে দাফনের আগে নবি ﷺ তাঁর জানাযার সালাত পড়ান।

৬) উম্মু সালামা বিনতু আবী উমাইয়া

আবূ সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী থাকাকালীন তিনি কয়েক সন্তানের জননী হন। চতুর্থ হিজরি সনের জুমাদাল আখিরাহ মাসে তিনি বিধবা হন। একই বছর শাওয়াল মাসের শেষ দিকে আসেন নবিজি ﷺ-এর বধূ হয়ে। প্রজ্ঞাবতী মহীয়সী এই নারী ইন্তিকাল করেন ৫৯ হিজরি সনে ৮৪ বছর বয়সে। (অন্যান্য সূত্রমতে ৬২ হিজরিতে)। তাকেও বাকী' কবরস্থানে দাফন করা হয়।

৭) যাইনাব বিনতু জাহশ

নবিজি ﷺ-এর ফুপু উমাইমা বিনতু আবদিল মুত্তালিবের মেয়ে যাইনাব (রদিয়াল্লাহু আনহা)। এর আগে যাইদ ইবনু হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল তার। যাইদ নবি ﷺ-এর পালিত সন্তান। জাহিলি আরবে পালিত সন্তানের তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করা খারাপ মনে করা হতো। এই কুসংস্কারের বিলোপ ঘটাতে আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺকে আদেশ দেন যাইনাবকে বিয়ে করতে। ৫ম হিজরির যুল-কা'দা মাসে এই বিয়ে হয় (কেউ কেউ বলেন, চতুর্থ হিজরিতে)।

৫৩ বছর বয়সে ২০ হিজরিতে তিনি মারা যান। সতিনদের মাঝে তার মৃত্যুই সবার আগে ঘটে। উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) তার জানাযা পড়ান। বাকী' কবরস্থানে দাফন করা হয় তাকে।

৮) জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস

৬ষ্ঠ হিজরির শা'বান মাসে বানুল মুসতালিক যুদ্ধের একজন বন্দিনী জুওয়াইরিয়া (রদিয়াল্লাহু আনহা)। প্রথমে তাকে দেওয়া হয়েছিল সাবিত ইবনু কাইস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অধিকারে। নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্তিপণের বিনিময়ে সাবিত তাকে মুক্ত করে দিতে চান। সেই মুক্তিপণ প্রদান করেন স্বয়ং নবি ﷺ। মুক্ত জুওয়াইরিয়াকে তারপর তিনি বিয়ে করে নেন। বানুল মুসতালিক গোত্র হয়ে যায় নবিজির শ্বশুরপক্ষীয় আত্মীয়। এর সম্মানার্থে অন্যান্য সাহাবিরা তাদের কাছে থাকা প্রায় এক শ পরিবারকে মুক্ত করে দেন। স্বজাতির জন্য পার্থিব-পারত্রিক উভয় প্রকার কল্যাণ বয়ে আনা এই মহীয়সী ৫৬ হিজরির[৫৮১] রবীউল আউয়াল মাসে ৬৫ বছর বয়সে মারা যান।

৯) উম্মু হাবীবা রামলা বিনতু আবী সুফ্ইয়ান

মেয়ে হাবীবার নামে তিনি উম্মু হাবীবা নামে পরিচিত হন। নবিজি ﷺ-এর এককালের জানি দুশমন আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হারবের কন্যা হিসেবে ইসলামের জন্য অনেক কুরবানি করেন তিনি। পিত্রালয় ছেড়ে হিজরত করেন আবিসিনিয়ায়। সাথে ছিল স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবনু জাহশ। কিন্তু সে পরে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। মারাও যায় ওই অবস্থাতেই। বিপরীতে উম্মু হাবীবা অটল থাকেন ঈমানের ওপর। আমর ইবনু উমাইয়া দামরি (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে আবিসিনিয়ার বাদশার কাছে দূত হিসেবে পাঠানোর সময় বিধবা উম্মু হাবীবার কাছে বিয়ের প্রস্তাবও পাঠান রাসূল ﷺ। কন্যাদানের দায়িত্ব পালন করেন আবিসিনিয়া বাদশা নিজেই। চার শ দীনার মোহর তিনি পরিশোধ করে দেন। শুরাহবীল ইবনু হাসানা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর তত্ত্বাবধানে তাকে পাঠান নবিজির কাছে। খাইবার থেকে ফিরে আসার পর সপ্তম হিজরির সফর বা রবীউল আউয়াল মাসে নবিজির সাথে উম্মু হাবীবার বাসর হয়। ৪২ বা ৪৪ হিজরি সনে মারা যান উম্মে হাবীবা।

১০) সফিয়্যা বিনতু হুয়াই ইবনি আখতাব

ইয়াহূদি গোত্র বানূ নাদিরের গোত্রপতির কন্যা হওয়ার পাশাপাশি নবি হারূন

---

[৫৮১] কারও কারও মতে, ৫৫ হিজরিতে।

(আলাইহিস সালাম)-এর বংশধর সফিয়্যা (রদিয়াল্লাহু আনহু)। খাইবার যুদ্ধে বন্দি হওয়ার পর মর্যাদা বিবেচনায় নবিজি ﷺ-এর অধিকারে দেওয়া হয় তাকে। নবিজি তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াহ দিলে তিনি তা কবুল করেন। খাইবার বিজয়ের রাতে ৭ম হিজরিতে নবি ﷺ তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন। বাকী'তে তিনিও সমাধিস্থ আছেন। তাঁর মৃত্যুর বছরের ব্যাপারে—৩৬ হিজরি, ৫০ হিজরি এবং ৫২ হিজরি—এই তিনটি মত পাওয়া যায়।

১১) মাইমূনা বিনতুল হারিস হিলালিয়্যা

আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী উম্মুল ফাদল লুবাবা বিনতুল হারিসের বোন মাইমূনা বিনতুল হারিস। সপ্তম হিজরির যুল-কা'দা মাসে কাযা উমরা পালনের সময় তিনি নবি-পরিণীতা হন। মক্কা থেকে ৯ মাইল দূরে 'সারিফ' নামক স্থানে বধূবেশে তিনি নবি ﷺ-এর কাছে আসেন। আবার সেই সারিফেই ৩৮, ৬১ কিংবা ৬২ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। সেখানে তার কবর আজও সকলের কাছে পরিচিত।

এই এগারো জনের সাথে নবি ﷺ-এর বিয়ে নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রাইহানা বিনতু যাইদ এবং মারিয়া কিবতিয়া (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, তারা স্ত্রী ছিলেন, না দাসী।

ইতিহাসবিদদের অনেকের মতে, ৬ষ্ঠ হিজরির মুহাররম মাসে রাইহানা নবীপত্নী হন। আবার অনেকের মতে, তিনি দাসী হিসেবেই ছিলেন। তার পিতৃগোত্র বানূ নাদীর আর শ্বশুর গোত্র বানূ কুরাইযা। বানূ কুরাইযা গোত্রের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধে তিনি বন্দি হন। নবি ﷺ তাকে বেছে নেন নিজের জন্য। রাসূল ﷺ বিদায় হাজ্জ থেকে ফেরার পর রাইহানা মারা যান। নবি ﷺ তাকে বাকী' কবরস্থানে দাফন করেন।

মারিয়া কিবতিয়াকে নবিজি ﷺ-এর কাছে উপহার হিসেবে পাঠান মিসরের বাদশা মুকাওকিস। ইবরাহীম নামে নবি ﷺ-এর এক ছেলের মা হন তিনি। ১৫ বা ১৬ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন এবং বাকী'তে কবরস্থ হন।

নবিজির সন্তানসন্ততি

আগেই বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম ছাড়া নবিজি ﷺ-এর বাকি সব সন্তান খাদীজা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর গর্ভজাত। তাদের ব্যাপারেও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

১) কাসিম

নবিজি ﷺ-এর জ্যেষ্ঠতম তনয় কাসিম (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামানুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আবুল কাসিম (কাসিমের বাবা) নামে ডাকা হতো। প্রায় দুই বছর বয়সে তিনি মারা যান।

২) যাইনাব

নবিকন্যাদের মাঝে তিনি সবার বড়। কাসিমের পরেই যাইনাব (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর জন্ম। খালাতো ভাই আবুল আস ইবনু রবীআর সাথে বিয়ে হয় তার। আলি নামে এক ছেলে এবং উমামা নামে এক মেয়ের মা হন তিনি। উমামাকে নবি ﷺ সালাতের সময় কোলে নিয়ে রাখতেন। মদীনায় ৮ম হিজরির শুরুর দিকে যাইনাব (রদিয়াল্লাহু আনহা) মারা যান। তিনি ইসলামের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। তাঁর ব্যাপারে নবি ﷺ বলেছেন, "সে আমার সবচেয়ে উত্তম মেয়ে।"[৫৮২]

৩) রুকাইয়া

উসমান ইবনু আফফানের স্ত্রী রুকাইয়া এক সন্তানের মা (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)। আবদুল্লাহ নামের এই সন্তানটির বয়স যখন ছয় বছর, তখন তার চোখে একটি মোরগের ঠোকরের কারণে আহত হয়ে তিনি মারা যান। আর নবি ﷺ বদরের যুদ্ধে থাকাকালে মারা যান রুকাইয়া (রদিয়াল্লাহু আনহা)। যাইদ ইবনু হারিসা (রদিয়াল্লাহু আনহু) যুদ্ধ জয়ের খবর নিয়ে মদীনায় পৌঁছে তার মৃত্যুসংবাদ পান।

৪) উম্মু কুলসূম

রুকাইয়ার মৃত্যুর পর আরেক মেয়ে উম্মু কুলসূম (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে উসমানের সাথে বিয়ে দেন নবি ﷺ। ৯ম হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে সমাধিস্থ হন বাকী'তে। তার কোনও সন্তান ছিল না।

---

[৫৮২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৪/৪৪; বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ৩/১৫৬।

৫) ফাতিমা

বদর যুদ্ধের পর নবিজি ﷺ-এর কনিষ্ঠা তনয়া ফাতিমার বিয়ে হয় আলি ইবনু আবী তালিবের সাথে। রদিয়াল্লাহু আনহুমা। দুই ছেলে হাসান-হুসাইন এবং দুই মেয়ে যাইনাব ও উম্মু কুলসূমের মা তিনি। বাবার মৃত্যুর ছয় মাস পর ফাতিমা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-ও মারা যান।

উপরোল্লিখিত পাঁচ জনেরই জন্ম মুহাম্মাদ ﷺ নুবুওয়াত লাভের আগে।

৬) আবদুল্লাহ

আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্ম কি নবুওয়াতের আগে হয়েছিল না পরে, তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। খাদীজার গর্ভের সর্বশেষ সন্তান তিনি। মারা যান শৈশবেই।

৭) ইবরাহীম

ইবরাহীম (রদিয়াল্লাহু আনহু) জন্ম নেন মদীনায় ৯ম হিজরির জুমাদাল উলা বা জুমাদাল আখিরাহ মাসে। তাঁর মা ছিলেন নবিজি ﷺ-এর দাসী মারিয়া কিবতিয়া (রদিয়াল্লাহু আনহা)। ১০ম হিজরির ২৯ শাওয়াল ইবরাহীমের মৃত্যুর দিনে সূর্যগ্রহণ দেখা দেয়। মানুষ বলাবলি করতে থাকে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পুত্রবিয়োগের ফলে এমনটি হচ্ছে। রাসূল ﷺ পুত্রশোকের মাঝেও এ কুসংস্কারের সরব বিরোধিতা করেন। জানিয়ে দেন যে, মহাজাগতিক এসব ঘটনার সাথে মানুষের জন্ম-মৃত্যুর কোনও প্রভাব নেই। ষোলো কি আঠারো মাস বয়সে ইবরাহীমের মৃত্যু হয়। তখনো তিনি দুধপান করছিলেন। তিনিও বাকী'তে শায়িত আছেন। নবি ﷺ তার ব্যাপারে বলেন, "জান্নাতি এক ধাত্রী এখন তার দুগ্ধপান পূর্ণ করছে।"[৫৮৩]

নবিজি ﷺ-এর শারীরিক গঠন, বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর শারীরিক গঠন, আখলাক ও আচরণ সবকিছুই ছিল সর্বোত্তম। তাঁর মতো আর কেউ ছিল না। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। সাহাবিগণও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবয়বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। সংক্ষিপ্তভাবে কিছু উল্লেখ করা হলো:

---

[৫৮৩] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪/২৯৭; বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ৭/২৮৯।

নবিজির চেহারা

নবি ﷺ-এর চেহারা ছিল উজ্জ্বল ফর্সা, আকর্ষণীয় ও গোলাকার। খুশি হলে চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে যেত তাঁর মুখমণ্ডল, আর রাগের সময় দেখাত ডালিমের মতো লাল।

মুখমণ্ডল ঘেমে গেলে মনে হতো মুক্তাদানা। মিশকের চেয়েও বেশি সুঘ্রাণ ছিল তাঁর ঘামের।

নবিজির গাল নরম, কপাল প্রশস্ত, ভ্রু চিকন ও বাঁকানো। টানা টানা চোখের মণি কালো, আর সাদা অংশে ছিল লাল আভা। চোখের পাপড়ি লম্বা ও ঘন। দেখলে মনে হয় তিনি সুরমা লাগিয়েছেন কিন্তু বাস্তবে তিনি তা ব্যবহার করেননি।

নাকের অগ্রভাগ উঁচু ও চকচকে। চওড়া মুখের সামনের দুটি দাঁতের মাঝে একটু ফাঁক ছিল এবং বাকি দাঁতগুলোও একটি অপরটি থেকে আলাদা ছিল। আর দাঁতগুলো এতই ঝকঝকে যে, হাসলে মনে হতো তুষারদানা। কথা বলার সময়ও ঝকমক করত সেগুলো। মনে হতো যেন মুখ থেকে নূর বের হচ্ছে।

মাথা, গলা ও চুল-দাড়ি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা স্বাভাবিক বড় এবং গলা ছিল একটু লম্বা। ঈষৎ কোঁকড়ানো চুলে সিঁথি করতেন মাঝ বরাবর। মাঝেমাঝে ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল রাখতেন, কখনও-বা রাখতেন কানের লতির একটু ওপর বা নিচ পর্যন্ত। ঘন ও কালো দাড়িতে ঢেকে থাকত তাঁর বুকের বেশির ভাগ অংশ। মৃত্যুকালে কানের ওপর আর থুতনিতে সব মিলিয়ে প্রায় বিশটি পাকা চুল-দাড়ি ছিল।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

নবি ﷺ-এর ছিল বড় বড় হাড়। কনুই, কাঁধ, হাঁটু ও কবজি ছিল দীর্ঘকায়। হাত ও পায়ের তালু প্রশস্ত। হাত দুটো রেশমের চেয়েও নরম, বরফের চেয়েও শীতল এবং মিশকের চেয়েও সুগন্ধময়। তবে পায়ের গোছা ও গোড়ালি ছিল পাতলা। চওড়া কাঁধ রোমশ হলেও প্রশস্ত বক্ষ প্রায় চুলবিহীন। শুধু বুক থেকে নাভি পর্যন্ত সরু এক সারি চুল ছিল।

গড়ন ও আকৃতি

নবি ﷺ বেশি লম্বাও ছিলেন না, বেশি খাটোও না। লম্বার নিকটবর্তী ছিলেন। তবুও

কোনও উঁচু ব্যক্তি যখন নবী ﷺ-এর সাথে হাঁটত তখন নবিজি ﷺ-কেই বেশি উঁচু দেখা যেত। শারীরিক গড়ন ছিল স্বাভাবিক। খুব বেশি মোটাও না আবার খুব বেশি হালকা-পাতলাও না; বরং দুটির মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলেন। যা দেখতে অত্যন্ত চমৎকার ও আকর্ষণীয় ছিল।

নবিজির সুবাস

নবিজি ﷺ-এর শরীর থেকে আতরের চেয়েও মন-মাতানো এক সুবাস বেরোনোর কথা বলেছেন সাহাবিগণ। আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমি নবিজির গায়ের সুগন্ধের চেয়ে উত্তম ও মিষ্টতর কোনও সুগন্ধি মিশক, আম্বার কিংবা অন্য কোনোকিছুতেই পাইনি।"

জাবির (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "নবিজি ﷺ কোনও পথ অতিক্রম করলে তাঁর পরে কেউ সে পথ দিয়ে চললে সুগন্ধ শুঁকেই জেনে যেত যে, এই পথ দিয়ে নবি ﷺ অতিক্রম করেছেন।" কারও সাথে নবিজি ﷺ হাত মেলালে সারাদিন তার হাতে রয়ে যেত মিষ্টি সুবাস। নবিজি শিশুদের মাথায় হাত বুলাতেন। ফলে তার সুবাসিত মাথা শুঁকলেই অন্য সব শিশুদের থেকে আলাদা করা যেত। উম্মু সুলাইম (রদিয়াল্লাহু আনহা) নবিজি ﷺ-এর ঘাম সংগ্রহ করে একটি শিশিতে করে রাখতেন। পরে আতরের সাথে মেশাতেন। কারণ, নবিজির ঘাম ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ আতর।

চালচলন

নবি ﷺ হাঁটতেন দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপে। বসা থেকে উঠতেন একটু ঝাঁকুনি দিয়ে, হাঁটতেন দ্রুত কিন্তু মসৃণ গতিতে। মনে হতো যেন ঢাল বেয়ে নামছেন। মানুষের দিকে দ্রুত এবং আন্তরিকভাবে ফিরে তাকাতেন।

হাঁটতে গিয়ে কখনও ক্লান্ত মনে হতো না তাঁকে। সাথের লোকজন তাঁর সাথে হেঁটে পেরে উঠত না। আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমি নবিজি ﷺ-এর চেয়ে দ্রুত কাউকে হাঁটতে দেখিনি। জমীন যেন গুটিয়ে আসে তাঁর জন্য। আমরা যতক্ষণে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে যাই, তিনি তখনো সচ্ছন্দে হেঁটে চলেছেন।"

কথা ও কণ্ঠ

নবিজি ﷺ-এর কণ্ঠ কিছুটা চড়া, বাগ্মিতা অসাধারণ। মৌনতা গাম্ভীর্যপূর্ণ আর কথা আকর্ষণীয়। একদম যথাযথ বিষয়ে স্পষ্ট ও সংক্ষেপে কথা বলতে পারতেন তিনি।

নবি ﷺ-এর আচরণ ও আখলাকের একটুখানি

নবি ﷺ সাধারণত হাসিখুশি থাকতেন। মুচকি হাসি হাসতেন সব সময়। রূঢ় আচরণের জবাবেও রূঢ়তা দেখাতেন না। চ্যাঁচামেচি করে কথা বলতেন না, এমনকি বাজারে গিয়েও না।

দুটি বৈধ কাজের একটি গ্রহণ করার সুযোগ থাকলে রাসূল ﷺ সব সময় বেছে নিতেন সহজটি। তবে গুনাহ বা আল্লাহর অবাধ্যতার আশঙ্কা আছে, এমন যেকোনও কিছু এড়িয়ে যেতেন। ব্যক্তিগত কারণে কখনও প্রতিশোধ নেননি। কিন্তু আল্লাহর আদেশের শাস্তিযোগ্য বিরোধিতা ঘটলে অবশ্যই শাস্তি দিতেন অপরাধীকে। সে ব্যাপারে তাঁর অবস্থান ছিল শক্ত ও সুদৃঢ়।

তাঁর জীবনী আলোচনায় আমরা দেখে এসেছি তিনি কতটা দয়ালু, সাহসী, শক্তিশালী ও অসাধারণ ধৈর্যশীল ছিলেন। কখনও কারও সাথে কোনও অশ্লীল আচরণ করতেন না। কোনোকিছু তাঁর অপছন্দ হলে চেহারা দেখেই বোঝা যেত। সোজাসুজি কারও দিকে অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে তাকাতেন না। অন্য কাউকে তো বটেই, দাসদেরও কখনও ধমক দেননি।

আল্লাহর রাসূল হিসেবে মনোনীত হওয়ার আগেও সমাজে তিনি আল-আমীন (বিশ্বাসভাজন) নামে পরিচিত ছিলেন। কথা দিয়ে কথা রাখা আর জয়লাভের পরও বিনীত থাকা তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস। আত্মীয়তার বন্ধনকে সম্মান করা, তা যথাযথভাবে বজায় রাখা, মৃত মুসলিমদের জানাযায় অংশগ্রহণ, দাসদের কাছ থেকে দাওয়াত পেলেও গ্রহণ করা, দরিদ্রদের পাশে একসাথে বসা ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য সামাজিক বৈশিষ্ট্য। প্রতাপশালী ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক হয়েও তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেন আমৃত্যু। বিলাসী খাবারে কিংবা দামি পোশাকে কখনও আসক্ত ছিলেন না তিনি এবং এ নিয়ে কখনও তাঁর মাঝে কোনও প্রতিযোগী মনোভাবও দেখা যায়নি।[৫৮৪]

---

[৫৮৪] বুখারি, ৫৪০৯, ৬৪৫৪; মুসলিম, ২০৬৪, ২৯৭২; তিরমিযি, ২০১৬; মিশকাত, ৫৮২০।

শেষকথা

মানবতার জন্য নবি-জীবনীর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে শেষ করা মানবসামর্থ্যের বাইরে। এ বইটি ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিটির ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনামাত্র।

আল্লাহ্‌ যেন এই ক্ষুদ্র কাজকে কবুল করেন, মহান এই উদ্দেশ্যের যথাযথ বাস্তবায়ন করার অক্ষমতা ক্ষমা করেন। এবং আমাদের সবাইকে তাঁর প্রিয় রাসূল—সমস্ত নবি-রাসূলদের সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন। নবিজি, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। বিচার-দিবসে আল্লাহ্‌ যেন আমাদের সমবেত করেন তাঁর রাসূলের সাথে। আমীন।

নবিজি ﷺ-এর জীবনী অত্যন্ত মহান ও মর্যাদাপূর্ণ একটি বিষয়। নবি ও রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন এবং ইসলামের উত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় তাঁর সীরাত থেকে। অসহনীয় কষ্টের পর আল্লাহ কীভাবে সাফল্য দেন, তা উপলব্ধি করা যায় নবি ও সাহাবিদের জীবনী থেকে।

অন্য যে কারও জীবনীর চেয়ে নবিজীবন অধ্যয়নে শিক্ষা লাভ করা যায় অনেক অনেক বেশি। আল্লাহ তাআলা কীভাবে তাঁর নবিকে প্রস্তুত করলেন, মানুষের অন্তরে কীভাবে প্রোথিত করলেন তাঁর কিতাবের শিক্ষা, অনেক শক্তিশালী ও বিশাল বিশাল শত্রুদলের বিরুদ্ধে ছোট্ট একটি দলকে কেমন করে বিজয় দান করলেন, চারদিকে মিথ্যে আর পাপ-পঙ্কিলতার সয়লাবের মাঝে ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্যকে কীভাবে সমুন্নত করলেন—এসবের মাঝে নিহিত রয়েছে বহু প্রজ্ঞা।

নবি ﷺ-এর জীবনী পড়ে মুসলিমরা তাদের দ্বীনকে গভীরভাবে বুঝতে শেখে। তাই নবিজির জীবদ্দশা থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আলিমগণ নবিজীবন-সংক্রান্ত তথ্যের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে খুবই সাবধানী। কিন্তু অনেকেই নবিজীবন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এতে মনগড়া, অবান্তর আলোচনা প্রবেশ করিয়েছে। ফলে দিনশেষে দেখা যায়, ইসলামের নবির জীবনীতে অনেক তথ্য স্বয়ং ইসলামের শিক্ষারই বিপরীত।

'রাসূলে আরাবী' বইটি বিশুদ্ধ উৎসের ভিত্তিতে লেখা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী। এই বইটি লিখতে লেখক সাহায্য নিয়েছেন কুরআন, বিশুদ্ধ তাফসীর, বিশুদ্ধ হাদীস এবং অন্যান্য বিশুদ্ধ সীরাহ-গ্রন্থের মতো বিশুদ্ধ উৎসের।

আল্লাহ যেন এই বইটির মাধ্যমে মুসলিমদের উপকৃত করেন এবং উভয় জাহানে নাজাতের মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন। আমীন!